বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা

[১১০০-১৯০০ খ্রী.]

শ্রীসতীন্দ্রমোহন
চট্টোপাধ্যায়

সা হি ত্য স ং স দ্
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল ১৩৬৬

প্রকাশক

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

মুদ্রক

শ্রীতুলসীচরণ বক্সী

ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৩৩ডি মদন মিত্র লেন। কলিকাতা ৬

শিল্পী

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু দত্ত

পরিবেশক

ইণ্ডিয়ান বুক ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং

৬৫।২ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

সদ্যোজাত বাঙলাদেশের
বাঙালী-প্রধান

শ্রীমুজিবর রহমান
অভিন্নপ্রবরেষু

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

প্রকাশকের নিবেদন

বিংশ শতকের তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হইতেছে।

বাঙালী জাতি আজ কোথায় যাইতেছে—এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় এবং বর্তমানের অবক্ষয়ের কথা প্রায়ই উচ্চারিত হয়। কেবল আর্থিক সম্পদে আমরা দীন নয়, চারিত্রিক ঐশ্বর্যেও আমরা হীন হইয়াছি—এইরূপ অভিযোগও উত্থাপিত হয়। ইহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভার জনসাধারণের। কিন্তু কাজটি বড় সহজ নহে। বাঙালীর জীবনে সঙ্কট আজ তীব্র রূপ ধারণ করিয়াছে, ইহাও কঠিন বাস্তব।

আমাদের বক্তব্য, এই সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের যথাযথ বিচারের সূত্রসন্ধানে আমরা এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। স্বল্প পরিসরে লেখক এই গ্রন্থে প্রায় হাজার বৎসরের সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা ও গতিবিধি আলোচনা করিয়াছেন। বাঙলার রাজনৈতিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য নহে কিন্তু বাঙালীর সমাজজীবনের ইতিহাস এযাবৎকাল ইতিহাসবিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলীর অধিগত বিষয় রহিয়া গিয়াছে, সাধারণের নিকট পরিবেশিত হয় নাই। বাঙালী জাতির সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই কল্পনাপ্রসূত ও অস্বচ্ছ। অথচ অতীত সম্বন্ধে নির্মোহ ও তথ্যনির্ভর ইতিহাস-গত সামাজিক জ্ঞান না থাকিলে বর্তমানের ঘটনাপ্রবাহে দিশেহারা হইতে হয়। পাঠক-সাধারণের জন্ম আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়া আমরা এই সকল অভাব মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহার বিন্যাস সাবলীল, ভাষা সরল ও সুখপাঠ্য এবং ইহাতে কয়েকটি বিরল মানচিত্র সংযোজিত হইয়াছে। বহু পরিশ্রমে রচিত এই গ্রন্থের জন্ম লেখকের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

এই বইটি জনসমাজে সমাদৃত হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

নিবেদন

এই গ্রন্থ রচনায় দুটি চিন্তাধারার প্রভাব রয়েছে।

প্রথম, বাঙলার ইতিহাস যা রচিত হয়েছে তা মূলত দু রকমের, হয় রাজনৈতিক, অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠীর ভাগ্যচক্রের, নয় সাহিত্যের। রাজনৈতিক ইতিহাসে রাজারাজড়ার কাহিনী প্রত্যক্ষ, শাসিত বাঙলা ও বাঙালীর কথা পরোক্ষ। আবার, সাহিত্যের ইতিহাসে আপামর জনগণের স্থান শুধু সংকীর্ণই নয়, ইতস্তত বিক্ষিপ্তও বটে। তাই, যদিও জনজীবনের অল্পাধিক ছায়াপাত এতে বর্তমান, তবু সে জীবনের ছবি এত অস্পষ্ট যে তা সাধারণের চোখে ধরা পড়ে না। এ সব পরিচয়ে বাঙালীকে ঠিক বোঝা যায় না; বস্তুত তাকে তার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বোঝাও চলে না। তারপর শতকে শতকে পরিবর্তনশীল সমাজের সন্ধান সহজলভ্য নয়; একাদশ শতকের বাঙালী ও বিংশ শতকের বাঙালীর মধ্যে গরমিল অপরিসীম। সে গরমিলের হিসাব নিকাশ রয়েছে প্রতিটি শতকের ধাপে ধাপে। বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে বুঝতে হলে সে ধাপগুলির পরিচয় অপরিহার্য।

দ্বিতীয়, নানা প্রদেশের ভারতীয়দের মধ্যে আকৃতি, আচার, আচরণ, ভাষা, বেশভূষা, খাদ্য ইত্যাদির বিভিন্নতা সত্ত্বেও যে একটা আত্মীয়তা বর্তমান, যা লক্ষ করে রাজনীতির ফাঁকা আওয়াজ ওঠে 'বিভেদের মধ্যেও একত্ব বা একাত্মতা'—Unity among diversity—তার ফাঁকটি ভরাতে পারে শুধু বিভিন্ন প্রদেশের সমাজবন্ধনের ইতিহাসই। এর পাতায় পাতায় ফুটে উঠবে প্রত্যেক প্রদেশবাসীর বৈশিষ্ট্য আর, স্পষ্ট হবে বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে একাত্মতার মূলগত সূত্রগুলি। যেমন, দ্রাবিড়দের সঙ্গেও বাঙালীর সম্পর্ক রক্তের, যদিও একটু দূরের বটে। বেহারী, আসামী ও ওড়িয়া তো বাঙালীর প্রায় একই গৃহবাসী! সদ্যোজাত 'বাংলাদেশে'র মানুষগুলির সঙ্গে পশ্চিম বাঙলার মানুষের পরম আত্মীয়তার মূলসূত্র যে মরসুমী সৌহার্দ্য নয়, এ যে রক্তের বন্ধন, সে হদিশ মিলবে এ ইতিহাসেরই পাতায়। এর ফলেই এ ফাঁকা আওয়াজের ভিত্তি পাকা হবার পথ সুগম হবে।

এ দুটি চিন্তাধারাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে আমাদের সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা। এর কেন্দ্রগত প্রতিকৃতি মানুষেরই, তাতে যুগে যুগে নব নব প্রাণসঞ্চার করেছে সে মানুষেরই রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, সমাজবন্ধন ও বহিরাগত চিন্তাজগতের ঘাতপ্রতিঘাত প্রভৃতি।

এই পরিবর্তনশীল আলেখ্য রচনা যে কতটা দুঃসাধ্য ব্যাপার তা এ কাজে হাত দিয়েই বুঝতে পেরেছি। একে তো এ চিত্রপটের সর্বতোমুখী প্রামাণিক পরিচয় পত্র সংগ্রহ, বিশেষ করে ভগ্ন স্বাস্থ্য মানুষের পক্ষে, একক করা পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের মতই স্বপ্নাতীত সমস্যা। তারপর, এ নির্জন ও নিদর্শনহীন পথে না পাওয়া যায় কোনো সুবিন্যস্ত নিশানা, না রয়েছে কোনো সুলভ সাময়িক চিত্র। এমন কি, কোনো কোনো শতক তো, যেমন ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, তার মুখ ঢেকে রয়েছে নিরেট নীরন্ধ্র অন্ধকারে; তার মধ্যে শুধু শঙ্কাজড়িত পদক্ষেপ করেই পথরেখার সন্ধান করতে হয়। তবু এ সবই যে আমার অক্ষমতার নিদর্শন তাতে সন্দেহ নেই। তবে অর্বাচীনের এ প্রয়াস কেন? আমার একমাত্র অজুহাত, অক্ষমেরও মাতৃপূজার অধিকার রয়েছে। তারপর, গীতার ভাষায় 'করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ'—অন্তর্যামীর নির্দেশ থাকলে যে এ কাজ না করে উপায় নেই; অবশের মতই তা করতে হবে!

নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে লেখা শেষ করতে হয়েছে। সে সবই ব্যক্তিগত। তারপরেই আমরা চলে এসেছি দেশ থেকে বহুদূরে—বিদেশে। পুঁথিখানি ছাপা হয়েছে আমার অনুপস্থিতিতে; তাতে ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা বেড়েছে। তবু যে সে কাজ এমন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে তা শুধু সাহিত্য সংসদের কর্ণধার প্রীতিভাজন শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত ও ওই প্রতিষ্ঠানেরই অধ্যক্ষ ধীমান শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষের ঐকান্তিক চেষ্টায়। এঁদের ঋণশোধ করা যায় না। কুশলী সাংবাদিক শিল্পী শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত নির্ধারিত রেখাচিত্রগুলি এঁকে দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। এজন্য তিনিও ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে সমগ্র বাঙালী সমাজের কাছে করজোড়ে একটি নিবেদন করছি। এই যুগে যুগে পরিবর্তনশীল সমাজচিত্রের মধ্যে নানা ত্রুটি বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। এতে বহু প্রচলিত মতের এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোষ্ঠীবিরুদ্ধ কথারও অবতারণা হয়েছে। এ সব অসঙ্গতি, মতভেদ ইত্যাদি যেন তাঁরা বাঙালী-সুলভ উদারতার সঙ্গে ক্ষমা করে নেন। বলা বাহুল্য, সর্বত্রই আমরা যথাসাধ্য ইতিহাসের নির্দেশ মেনে চলেছি আর, সমাজের আলেখ্যটি রেখেছি সর্বদা

সবার সম্মুখে। যদি বাঙলা ও বাঙালীর যথাযথ পরিচয় দানে বিন্দুমাত্রও সাহায্য করতে পেরে থাকি, একজন বাঙালীও যদি এ পুঁথির মধ্যে কণামাত্রও আনন্দ বা তথ্যের সন্ধান পেয়ে থাকেন তবে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

মানচিত্র-সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা

পটভূমিকা

[এক]

বাঙলার মাটি আশ্রয় করে যাদের জীবন গড়ে উঠেছে, এ মাটির স্বভাবজ ভাবপ্রবণতা ও আঞ্চলিক আশা-আকাঙ্ক্ষা যাদের মধ্যে স্পষ্ট, আর সর্বোপরি বাঙলা ভাষা যাদের মাতৃভাষা তারা বাঙালী।

বলা বাহুল্য, এর কোনোটিরই বর্তমান রূপ ও পরিণতি একদিনে গড়ে ওঠেনি ; না মাটির, না বাঙালীর স্বভাবদানকারী সমাজের, না ভাষার। বাঙালী জাতির জন্ম থেকে শতকে শতকে এর প্রত্যেকটিরই পরিবর্তন ঘটেছে। এ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে নানা শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে। এর মধ্যে রয়েছে তার জন্মবীজের গতি ও প্রকৃতি, তার রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম প্রভৃতি। শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস পড়ে বাঙালী জাতিকে বোঝা যাবে না ; বস্তুত কোনো জাতিকেই বোঝা যায় না। জাতির সমাজই, অর্থাৎ সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রাই তার পরিচয়, তার প্রকৃত আলেখ্য। সে আলেখ্যটি ঘিরেই আমাদের এ কাহিনী।

সব ইতিহাসের মধ্যেই একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে ; সে ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে ইতিহাসের অঙ্গচ্ছেদ করা হয়—সে ইতিহাসের মর্মকথা স্পষ্ট হয়ে ফোটে না। এই ধারাবাহিকতা রক্ষাই পটভূমিকা রচনার সার্থকতা।

আমাদের এ পটভূমিকা মূলত রাজনৈতিক। সারাংশে এটি উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষের কাহিনী, কারণ এরই পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভব হয়েছে বাঙালী জাতির ; এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে তার জন্মবীজের ধারা। বাঙালী জাতির জন্মের বহুকাল আগে থেকে সে কাহিনী শুরু করে লাভ নেই, তবে ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন ইতিহাসের দু'চারটি কথা যেমন, দ্রাবিড় ও আর্য সভ্যতার কথা, না বললে আমাদের কাহিনী স্পষ্ট হয়ে উঠবে না।

বুদ্ধদেবের কালে, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে, যে তথাকথিত আর্য সভ্যতা বাঙলা দেশে এসে পৌঁছায়নি সে কথা ঐতিহাসিক সত্য। সে আমলে ভারতবর্ষে যে ষোলটি মহাজনপদ বা রাজ্যের নাম রয়েছে তার মধ্যে এ সব জনপদের কোনো উল্লেখ নেই, যাদের আধুনিক সংজ্ঞা—আসাম, বাঙলা, উড়িষ্যা, সুদূর দক্ষিণাপথ, গুজরাট ও সিন্ধুদেশ। বিদ্বজ্জনের অনুমান, এর প্রভাব এসেছে খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে কিন্তু এর কোনো বিশিষ্ট প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। যাই হোক, সে প্রভাব ছিল হীনবল; বাঙলায় তা অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। তাই বেদ ও উপনিষদ্ এদেশে তাদের স্থান করে নিতে পারেনি। তারপর এল বিদ্রোহী বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদের প্লাবন; বৌদ্ধ এল দ্বিরূপে, হীনযান ও মহাযান দু'টি পথের বার্তা নিয়ে। এদের প্রভেদটার কথা যথাস্থানে বলা হবে। কিন্তু এ প্লাবনেও বাঙলা দেশ একেবারে তলিয়ে গেল না। এ প্লাবনের ধারা বাঙালা দেশ ধৌত করে মোটামুটি স্থির হল সমতটে অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ও পুণ্ড্রবর্ধনে অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দেশে। কথিত আছে, সুহ্মে, অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ে, ধর্মপ্রচার-কালে বর্ধমান মহাবীরের দারুণ দুর্দশা ঘটেছিল; সে দেশের অধিবাসীরা তাঁর পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল!

কিন্তু গুপ্তযুগের মধ্যাহ্নে অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে বাঙলাকে নতিস্বীকার করতে হল আর্যধর্মবাহক গুপ্তদের কাছে। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত এসে জয় করলেন দেশটা; বাঁকুড়ার, অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ের শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে লিখে দিলেন পুষ্করণ বা পোখরণ-রাজ চন্দ্রব্রহ্মাণের পরাজয়ের কথা। এমনকি, সুদূর সমতটও বাদ গেল না; নতি-কর দিয়ে সে দেশের রাজা পরোক্ষ পরাজয়ের পথ বেছে নিলেন।

গুপ্তযুগের এ আঘাতের ফল বাঙলার পক্ষে হল শুভ। সোনার কাঠির ছোঁয়ায় বাঙলা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। দেশবাসীর

আচার-আচরণ, সামাজিক রীতিনীতি বদলে গেল ; কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ভাস্কর্য প্রভৃতি অভিনবরূপে এসে মানুষকে একটা নূতন জীবনের আস্বাদে ভরপুর করে তুলল।

বাঙালী জাতির সঠিক জন্মমুহূর্ত যে তার কোষ্ঠীতে লেখা নেই এ নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই। তবে বিদ্বজ্জনের সিদ্ধান্ত এই যে মৌর্য আমলের পরোক্ষ প্রভাবের পূর্বে না হোক, গুপ্ত আমলের প্রত্যক্ষ প্রভাবের পূর্বে যে বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। ধর্ম, কর্ম, আচার-আচরণ, ভাষা প্রভৃতিতে সে জাতির সঙ্গে আর্য-প্রভাবে গঠিত উত্তরাপথের অন্যান্য জাতির ছিল চরম বৈষম্য, কিন্তু তাই বলে তাদের অসভ্য বলা যাবে না। অবশ্য আর্য-মতাবলম্বী ঐতরেয় আরণ্যকে, বৌধায়ন ধর্মসূত্রে এই প্রত্যন্ত দেশবাসী সম্পর্কে শ্লেষাত্মক মন্তব্য রয়েছে কিন্তু সে সব হয় এদেশ সম্বন্ধে পুরোপুরি জ্ঞানের অভাবে, নয় একদেশদর্শিতার ফলে। সে যাই হোক, বাঙালী জাতি সেকালেও একটি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, সভ্য ও বিশিষ্ট জাতি হয়ে গড়ে উঠেছিল তা অস্বীকার করা চলে না।

কেউ কেউ বলেন, পঞ্চম শতকের পূর্বেই মিত্র, দত্ত, কর, ধাড়া, পাল, দাম (দাঁ), ভদ্র (ভড়), চন্দ (চন্দ্র) প্রভৃতি বাঙালী পদবী এই বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছিল বৌদ্ধযুগের চিহ্ন নিয়ে ; উপাধ্যায়দের বিশিষ্ট রূপ এসেছিল অনেক পরে—সবই গ্রামের নামানুসারে।

বহুপূর্বকাল থেকেই বহির্বাণিজ্যের সূত্রে আমরা এখন যাকে 'ইষ্ট ইণ্ডিজ' বলি, সে দেশগুলির সঙ্গে ছিল বাঙালীর গভীর সংযোগ। সমুদ্রগামী নৌকা তৈরিতে ছিল তাদের অপূর্ব দক্ষতা। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রত্যক্ষদর্শী প্লিনির মতে ভারতীয় সমুদ্রগামী নৌকা সাধারণত সত্তর টনের মত মাল বহন করত। তাই মনে হয়, বাঙালীর নৌকার মালবহনের ক্ষমতাও এরূপই ছিল। বস্ত্রবয়নে তখনো ছিল তারা পারদর্শী। ভাগীরথী ও গঙ্গার মধ্যবর্তী রাজ্য

'গঙ্গারিড' থেকে আলেক্‌জাণ্ডারের কালে, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বাঙলার মসলিন বিদেশে রপ্তানি হত।

বাঙালীর এ সভ্যতার বনিয়াদ হয়ত আরও পুরানো, কারণ অজয়, কোপাই প্রভৃতি নদীর তীরে সম্প্রতি খুব প্রাচীন এক সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। অজয় উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের সীমারেখা। মাত্র বছর-দেড়েক আগে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের শিলাশয্যায় যে জীবাশ্মটি পাওয়া গেছে তা এখনো অবশ্য 'জাভা ম্যানের' সমকালীন বলে অনুমিত। হতে পারে, সেটি কয়েক লক্ষ বছর পূর্বের। মনে হয়, বাঙলার অতীত এখনো তার কথা বলেনি।

গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য বাঙলায় মোটামুটি পাকা হয়ে বসল বটে, কিন্তু সমাজে তার বিশেষ প্রসার ঘটল না ; নৈবেদ্যের চূড়ার মত মাত্র ভূষণ হয়েই রইল। কিন্তু গুপ্তযুগের সংস্পর্শে বাঙালীর কাছে পশ্চিমের দরজা খুলে গেল। পূর্বে নেপাল ও তিব্বতের সঙ্গে সংযোগ ছিল। এখন তার দৃষ্টি আরো সুদূরপ্রসারী হয়ে মিথিলা ছেড়ে চলে গেল মগধে, মগধ থেকে কান্যকুব্জে, কান্যকুব্জ থেকে সারস্বতে। তাই দৃপ্ত গুপ্ত-সূর্য যখন অস্তোন্মুখ হল ষষ্ঠ শতকে, তখন বাঙলায় অভ্যুদয় হল কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কের—সপ্তম শতকের প্রথম পাদেই। সার্বভৌম রাজা শশাঙ্কই প্রথম বাঙালী সম্রাট্‌ যিনি বাঙলার সীমারেখা বিস্তৃত করতে চাইলেন পশ্চিমে। এঁর কথা আবার পরে বলা যাবে।

এখন দ্রাবিড় ও আর্য সভ্যতার কথায় আসা যাক।

দ্রাবিড় বা আর্য সভ্যতার অবিমিশ্র রূপ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ; কাজেই এ দু'টি কথার বিশেষ কোনো অর্থ নেই। ভারতবর্ষে আমরা যাদের দ্রাবিড় বলে থাকি, তাদের দ্রাবিড় জাতি না বলে দ্রাবিড় ভাষাভাষী বলাই বোধহয় অধিকতর সংগত। পনেরটি ভাষা নিয়ে দ্রাবিড় ভাষাগুচ্ছ ; এর মধ্যে চারটি, যথা, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী ও মালয়ালাম প্রথম সারিতে। শেষের

তিনটিতে বেশ কিছু সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, কিন্তু তামিল মোটামুটি অবিকৃত। সব কটিরই সাহিত্য-সম্পদ রয়েছে, তবে তামিলের বেশি। সব কটি ভাষাই দুরূহ ; তামিল দুরূহতম।

ভারতবর্ষে দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের উদ্ভব সম্পর্কে দুটি মত বর্তমান। কেউ কেউ মনে করেন যে দ্রাবিড়েরা এদেশেরই আদিম অধিবাসীদের এক গোষ্ঠী ; কারো কারো মতে তারা আর্যদের মতই বহিরাগত। দ্বিতীয় দলের প্রবল যুক্তি এই, যে তারা বেলুচিস্থান দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং তাদের একাংশ বেলুচিস্থানেই থেকে যায়। এর প্রমাণ, সে দেশের ব্রাহুই জাতি এখনো যে ভাষায় কথা বলে তার সাথে দ্রাবিড় ভাষাগুচ্ছের অপরূপ সাদৃশ্য।

বহিরাগত হলেও তারা যে মোটামুটি আর্যদের হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। মহেঞ্জোদরোর মানুষ এসেছে তাদেরও অনেক আগে ; তাদের সাথে না আছে দ্রাবিড়দের মিল, না আছে আর্যদের। তবে তারা মহেঞ্জোদরোর লিঙ্গপূজা সহজেই গ্রহণ করেছে আর ষাঁড়টিকে এনে দাঁড় করিয়েছে তার পাশে। সঙ্গে সঙ্গে এসেছে সাপ, ভারতবর্ষের আদিমতম অধিবাসী কোলদের গোষ্ঠীচিহ্ন বা 'টোটেম' হিসাবে। ভারতবর্ষের সর্বত্রই ছিল সাপের দৌরাত্ম্য ; এখনও তা রয়েছে বহু স্থানে। কাজেই সাপের পূজা ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

আর্যেরা যখন এল তখন ভারতবর্ষ জুড়ে সর্বত্রই ছিল দ্রাবিড় ও কোলেরা। এই কৃষ্ণকায়দের দেশে শ্বেতকায় সুঠাম আর্যেরা নবোদিত সূর্যের মত ঘোড়ায় চড়ে এল। দ্রাবিড়দের ঘোড়া ছিল না, কোলদেরও না, তাদের পূর্ববর্তী মহেঞ্জোদরোর মানুষেরও না। এই দ্রুতগামী হয়-সম্প্রদই আর্যদের পক্ষে শ্লথগতি দ্রাবিড় কোলদের দেশ জয়ের পথ প্রশস্ত করে দিল। আর্যেরা সঙ্গে নিয়ে এল সংস্কৃত ভাষা। সে ভাষা দ্রাবিড় ও কোল গোষ্ঠীর ভাষার চেয়ে সহজবোধ্য। সংস্কৃত দিয়ে দ্রাবিড় কোল জয় হল সুসাধ্য, কিন্তু আর্যেরা একে

সংখ্যায় কম, তারপর না ছিল তাদের মধ্যে আহারে বিহারে অস্পৃশ্যতা, না ছিল বিবাহে কুলবন্ধন। ফলে পরে, দ্রাবিড়ে, কোলে, আর্যে হয়ে গেল মেশামেশি। আর্যদের পেশা ছিল পশুপালন, সমাজ ছিল পুরোপুরি পিতৃকেন্দ্রিক; দ্রাবিড়েরা ছিল অংশত কৃষিজীবী, তাদের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল প্রধানত মাতৃকেন্দ্রিক। এ মেশামেশির ফলে এসব অবিমিশ্র রূপ অন্তর্হিত হল।

কালক্রমে আর্যেরা অংশত কৃষিজীবী হয়ে পঞ্চসিন্ধু ও গঙ্গার কূলে কূলে প্রধানত ধান্যরোপণে মন দিল। সে শিক্ষা পেল তারা দ্রাবিড়দের কাছে। দ্রাবিড়দের প্রধান প্রধান বস্তি ছিল সারা দক্ষিণাপথ জুড়ে—নানা স্রোতস্বিনীর তীরে তীরে। সেখানে ধানের চাষ ও বস্ত্রবয়ন ছিল তাদের প্রধান অবলম্বন; সঙ্গে সঙ্গে ছিল বহির্বাণিজ্য। ধান সম্ভবত ভারতবর্ষেরই বন্যসম্পদ; সেটা অনেকেরই ধারণা। হয়ত 'ইষ্ট ইণ্ডিজ' দ্বীপগুলি থেকেও আসতে পারে। বয়নশিল্পে দক্ষতা কিন্তু বাঙলার নিজস্ব কীর্তি; অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন, ভারতীয়েরা বয়নশিল্পের সাধারণ কৌশল জেনেছে মিশর থেকে। এ দেশগুলির সঙ্গে ছিল তাদের নিত্য বাণিজ্য সম্পর্ক।

এবার বাঙালীর জন্মবীজের কথায় আসা যাক।

ভারতবর্ষের সর্বত্রই যেমন, বাঙলা দেশেও তেমনি দ্রাবিড় ও কোলদের ছিল সহাবস্থান। এ ছাড়া এখানে ছিল একটি তৃতীয় পক্ষ—ভোট-ব্রহ্ম বা মোঙ্গোল। কোলরা ছিল সারা দেশ জুড়ে, দ্রাবিড়রা বিশেষ করে পশ্চিম বাঙলায়, আর মোঙ্গোলরা প্রধানত উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে। এদের আচার-আচরণও ছিল ভিন্ন, ভাষারও অমিল। এই তিন বিভিন্ন গোষ্ঠী বাঙলার মাটির কটাহে কালের ইন্ধনের তাপে মিশ্রিত হয়ে যে কি করে একটা জাতির, অর্থাৎ বাঙালীর সৃষ্টি হল তা বলা অসাধ্য; এটি অনুমান-সাপেক্ষ সত্য। এ মিশ্রণে catalyst বা অনুঘটক কি ছিল তা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। এর পরে তার মধ্যে যে ছিটেফোঁটা আর্যরক্ত এসে

মেশেনি তা নয়, তবে বাঙালীর মূল জন্মবীজে রয়েছে দ্রাবিড়, কোল ও মোঙ্গোলের প্রাণশক্তি। বাঙালীর আর্যগীতি গাইবার গর্ব এতে খর্ব হতে পারে, কিন্তু তার প্রাণশক্তি ও বৈশিষ্ট্যের খোঁজ পাওয়া যাবে প্রধানতঃ এ ত্রিধারার মধ্যে।

এবার দেখা যাক আধুনিক নৃতত্ত্ব এ বিষয়ে কি বলে।

নৃতত্ত্বের বিচারপদ্ধতি নিয়ে আমাদের প্রয়োজন নেই ; প্রয়োজন তার সিদ্ধান্তে। রিজ্‌লি-প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মতে বাঙালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, পূর্ব-বাঙলার মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ও দ্রাবিড় ও মোঙ্গোলের মিশ্রণ-প্রসূত ; এর মধ্যে অবশ্য ছিটেফোঁটা আর্যরক্তেরও সন্ধান পাওয়া যাবে। এদের সবারই রং কৃষ্ণ, মাথা চওড়া, অর্থাৎ দিঘে-পাশে সমান, মাথায় চুল ও মুখে গোঁফ-দাড়ির প্রাচুর্য ; উচ্চতা মাঝামাঝি, আর নাকের গড়নও মাঝারি, হয়ত ঈষৎ চেপটাই বলা চলে।

এ সিদ্ধান্ত এখন অবশ্য সকলে মানেন না। মতান্তরে, বাঙালীর গড়নে দ্রাবিড়, কোল, মোঙ্গোল ও ছিটেফোঁটা আর্যরক্ত যে বর্তমান তা সাধারণভাবে সবাই মানেন, তবে এ সিদ্ধান্তটাই যে ধ্রুবসত্য একথা মানেন না। এ তিনটি জাতি ছাড়াও আর একটি জাতির অস্তিত্বে তাঁরা বিশ্বাস করেন। এ জাতিটি আর্যদের ভারতবর্ষে আসার পূর্বেও এদেশে বর্তমান ছিল। শুধু বাঙলায় নয়, কেউ কেউ মনে করেন, সিন্ধুপ্রদেশে, গুজরাটে, মধ্যভারতে ও অন্ধ্রেও এরা ঘর বেঁধেছিল, কারণ এখনও এ সব দেশে এদের উত্তরপুরুষদের প্রাচুর্য রয়েছে। এ ছাড়া ভারতবর্ষের বাইরেও এদের দর্শন মেলে। এরা কোথা থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল তা অবশ্য কেউ সঠিক বলতে পারেন না ; দ্রাবিড় বা আর্যদের মত এদেরও আদিনিবাস এখনো অজ্ঞাতই বলা চলে। বাঙলা দেশে সাধারণভাবে এদেরই রাজত্ব ; রিজ্‌লির আঁকা বাঙালীর ছবির সঙ্গে এ সব মানুষের আশ্চর্য মিল। তাই, অনেকে মনে করেন, হয়ত বাঙালী দ্রাবিড়, কোল, মোঙ্গোল

ও আর্য-মিশ্রণের ফল নয়, বাঙালী অন্য একটি বিশিষ্ট মানব-গোষ্ঠীর বংশধর। এ মতের মধ্যে সমস্যা থেকে যায় প্রচুর। প্রধান সমস্যা ভাষাগত। এদের ভাষা কি ছিল? আর্য ভাষা সংস্কৃত যে এদের ভাষা ছিল না তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই; কিন্তু যে অনার্য ভাষা তারা বলত, তারও তো কোনো সন্ধান এদেশে পাওয়া যায় না। নৃতত্ত্ব বা ভাষাতত্ত্ব এ সব সমস্যার নিরসন এখনও করতে পারেনি, তাই বাঙালীর জন্মবীজের কাহিনী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে বলা চলে না।

তবে একথাটা স্পষ্ট যে বাঙালী মিশ্রণ-ফল-জাতই হোক বা একটা বিশিষ্ট জাতির বংশধরই হোক, বাঙালী হিন্দু, মুসলমান ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সবই একই মানব-গোষ্ঠীর অংশ মাত্র; নৃতত্ত্বের দিক থেকে এদের মধ্যে যে সামান্য ইতরবিশেষ রয়েছে তা নগণ্য।

এ কথাটা স্পষ্ট করে বোঝা প্রতিটি বাঙালীর কর্তব্য। আমাদের কারোরই জন্মবীজে কোনো প্রভেদ নেই। আমাদের মধ্যে কেউ আর্যদের বংশধর নই, কেউ আরবীয়দের বংশধরও নই। ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব বিস্মৃত না হলে কেউ বাঙালীর সাম্প্রদায়িকতার কথা তুলতেই পারেন না। আমরা সবাই একই মাটিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছি, আমাদের সবারই জন্মবীজ এক, আর সর্বোপরি আমরা একই ভাষাভাষী। আমরা কালক্রমে নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে বসবাস করতে পারি, কিন্তু আমাদের সৌহার্দ্য জন্মগত।

এ কথাটা আমাদের স্পষ্ট করে বলার কারণ রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, ইতিহাসকে ধামাচাপা দিয়ে, অর্থাৎ অসত্যের আশ্রয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা প্রকৃত সৌহার্দ্যের পরিপন্থী মাত্র, পরিপোষক নয়। সত্যকে কখনো ঢাকা যায় না। ইতিহাসকে অনুসরণ করতে গিয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা বাঙালীর যে রেখাচিত্র অঙ্কিত করব, তার কদর্থ হওয়া বিন্দুমাত্র আশ্চর্য নয়।

আরও একটা বিষয় স্পষ্ট করে বলা ভাল। বেদ ও উপনিষদ্ হিন্দু-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, জগতের সর্ব-মানবগোষ্ঠীরই এ সব সাধারণ সম্পত্তি, কারণ এগুলি মানুষ প্রজাতির সর্বাপেক্ষা পুরানো লিখিত চিন্তাধারা। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতেও এদেশীয় হিন্দুর যতটা অধিকার, মুসলমানেরও ততটাই। এ কথা কখনো বিস্মৃত হলে চলবে না।

এর পরে আমাদের আলোচ্য বাঙালীর ভাষার কথা।

বাঙালীকে যদি বহিরাগত একটি বিশিষ্ট জাতি-গোষ্ঠীর বংশধর বলে ধরা যায় তবে যে ভাষা-সমস্যা দেখা দেয় তার সমাধান করেছেন কেউ কেউ এই বলে যে, তারা আর্য ভাষাই বলত; কেউ বলেছেন, তারা বলত দ্রাবিড় ভাষা। কিন্তু এ সব মতের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় না, পাবার সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু যে ভাষাগুলি এখনো ভারতবর্ষে জীয়ন্ত রয়েছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা আদিম হল কোল বা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা যার অন্তর্গত হল সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো, কুরকু, শবর প্রভৃতি। এর পরে এল দ্রাবিড় ভাষাগুচ্ছ, তারপর মোঙ্গোলদের ভোট-চীনা ভাষা এবং সর্বশেষ সংস্কৃত ভাষা। কিন্তু সকলের শেষে এসেও সে ভাষাই তার গুণ-মাহাত্ম্যে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে বসল।

তারপর কালক্রমে বৈদিক ভাষা প্রাঞ্জল হতে শুরুও হল, আর ভেঙে চুরে কথিত ভাষায় প্রথম পূর্বাঞ্চলেই প্রাকৃত রূপ ধারণ করল। প্রাকৃতের ধারা হল দু'টি। এক, পশ্চিমা-প্রাচ্য যার নিদর্শন মেলে সম্রাট অশোকের অনুশাসনে; দুই, পূর্ব-প্রাচ্য যাকে বলা হয় মাগধী-প্রাকৃত। এই মাগধী-প্রাকৃতই প্রাচীন বাঙলা ভাষার দিদিমা; আবার প্রাচীন বাঙলা ভাষা আধুনিক বাঙলার দিদিমা। এই দু'জোড়া দিদি-নাতনীর মাঝে যাদের অবস্থিতি তারা যথাক্রমে প্রাচীন বাঙলার মা, নাম মাগধী-অপভ্রংশ ও আধুনিক বাঙলার মা, নাম মধ্যযুগের বাঙলা। এই হল বাঙলা ভাষার বংশানুচরিত।

কিন্তু এই বংশানুচরিতের সর্বজনগ্রাহ্য চাক্ষুষ প্রমাণ দেওয়া সম্ভবপর নয়, কারণ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের মাগধী-প্রাকৃতের নিদর্শন এখনো বর্তমান রয়েছে বটে, কিন্তু তার পরে একাদশ শতক পর্যন্ত বিপুল অন্তরাল রচনা করেছে এক ঘোরকৃষ্ণ যবনিকা ; সেকালের বাঙলা ভাষার কোনো নিদর্শন আজ পর্যন্ত কোনো পু্থিতে মেলেনি। তাই ওই কালের ভাষামূর্তি শুধু ভাষাতত্ত্বের সূত্রে রচিত হয়েছে ; এগুলি 'সম্ভাব্য' রূপ মাত্র। কথাটা আরো একটু পরিষ্কার করে দেওয়া যাক।

অঙ্কশাস্ত্র যেমন কতগুলি সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সে সূত্রগুলি প্রয়োগ করে যেমন ধাপের পর ধাপে অঙ্কের ফল নিষ্পন্ন হয়, ভাষাতত্ত্বেরও তেমনি। অঙ্কটির পঞ্চম ধাপ থেকে যেমন তার চতুর্থ ধাপের রূপটির নিদর্শন পাওয়া যায়, ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে, অর্থাৎ সেটিরও পঞ্চম ধাপ দেখে তার চতুর্থ ধাপের 'সম্ভাব্য' রূপের কল্পনা করা চলে বাস্তবে তার কোনো নিদর্শন না মিললেও।

ভাষাতত্ত্বের সূত্র প্রয়োগ করে বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র দু'টি লাইনের মাগধী-অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাঙলার যে সম্ভাব্য রূপের খোঁজ দিয়েছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা হল। সোনার তরীর সে লাইন দু'টি হল :

"গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।"

মাগধী-অপভ্রংশে, যার কাল হল আনুমানিক সপ্তম শতক থেকে একাদশ শতক, এ লাইন দু'টির সম্ভাব্য রূপ হবে :

গাণ গাহিঅ নাব্ব বাহিঅ কই (কি) আৱিশই
পারহি (পালহি),
দেক্‌খিঅ জইহণ (জইশণ) মণহি হোই
চিণ্‌হিঅই ওহঅরহি (ওহঅলহি)।

প্রাচীন বাঙলায় এরই প্রতিরূপ হবে :

গাণ গাহিআ নাৱ বাহিআ কে আইশই পারহি,
দেখিআ জৈহণ মণে (মণহি) হোই, চিণ্‌হিঅই ওহারহি।

ভাষাতত্ত্বের সূত্রগুলি মেনে নিলে পদগুলির এসব সম্ভাব্য প্রতিরূপের অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নেই, যদিও এর প্রতিটি পদরূপ কোনো পুঁথিতে মিলবে না। পরবর্তী পরিচ্ছেদে, বিশেষ করে প্রাচীন সাহিত্যের অপরিহার্য কথায়, এ তথ্যটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন হবে।

এবার আমরা বাঙলার ভাষাতত্ত্ব ছেড়ে আবার সার্বভৌম রাজা শশাঙ্কের কথায় ফিরে যাব।

শশাঙ্কের রাজ্যকাল আনুমানিক ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর মৃত্যুর কাল নিয়ে কোনো মতদ্বৈধ নেই। তবে তাঁর রাজ্যের স্বাভাবিক সীমানা ও রাজ্যবিস্তারের কথায় নানারূপ তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হবে ; সে সব কথায় আমাদের প্রয়োজন নেই। যে বাঙলাকে তিনি একরাষ্ট্রভুক্ত করেছিলেন তার ছিল চারিটি ভাগ : পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণ। কর্ণসুবর্ণ হল মোটামুটি বর্তমান বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাত্রয়। রাজ্যের রাজধানী ছিল অধুনাতন বহরমপুরের সন্নিকটে কর্ণসুবর্ণে*। বাঙলার পশ্চিমের সিংহদ্বার ছিল কাজঙ্গলে অর্থাৎ বর্তমান রাজমহলে।

ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী বলে বর্ণনা করে কবি বাণভট্ট শৈবপন্থী শশাঙ্কের অপকলঙ্ক গেয়েছেন, আর চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং এঁকেছেন এক অনুরূপ চিত্র। উভয়ই নিতান্ত পক্ষপাতদোষদুষ্ট, কারণ এঁরা উভয়েই ছিলেন শশাঙ্কের চিরশত্রু রাজা হর্ষবর্ধনের বন্ধু। কথিত হয়, শশাঙ্ক গয়ার প্রখ্যাত 'বোধি'-বৃক্ষটি ধ্বংস করেন ;

---

*ভাগীরথীর পশ্চিমে চিরুটি নামক স্টেশন।

তাঁর নিজের দেশে বৌদ্ধদের প্রতি অতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন। কিন্তু হিউয়েন-সাং শশাঙ্কের মৃত্যুর প্রায় অব্যবহিত পরেই বাঙলায় এসে দেশের যে চিত্র এঁকেছেন তাতে তাঁর এ মন্তব্যের বিন্দুমাত্র সমর্থন মেলে না। তিনি বাঙলা দেশে ছিলেন ৬৩৮ থেকে ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ দু'বছর।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে উত্তর-ভারতের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট হর্ষবর্ধন তাঁর রাজ্য দখল করেন। হর্ষবর্ধনের রাজধানী ছিল কান্যকুব্জে বা কনৌজে, কিন্তু তাঁর রাজ্য ছিল বহু-প্রসারিত, পূর্বে ও পশ্চিমে, সারস্বত থেকে বাঙলায়, হয়ত কলিঙ্গেও। এঁরই কালে হিউয়েন-সাং ভারতবর্ষে এসেছিলেন আর বাঙলা দেশের প্রায় সর্বত্র ঘুরে তাম্রলিপ্তিতে বা তমলুকে বাস করেছিলেন দু'টি বছর। তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে বাঙলার সেকালের যে ছবিটি ফুটে উঠেছে তা বাঙালীর ইতিহাসের পটভূমিকা রচনার পক্ষে পরম মূল্যবান।

আমরা সে চিত্রটির অনুলিপি অনুসরণ করছি। হিউয়েন-সাং কনৌজ থেকে বাঙলা দেশে এসেছিলেন স্থলপথে। কনৌজ থেকে মুঙ্গেরে বা মুদ্গিরিতে, সেখান থেকে ভাগলপুরে বা চম্পায়, তারপর রাজমহলে বা কাজঙ্গলায়, ক্রমে পুণ্ড্রবর্ধনে, কর্ণসুবর্ণে, সমতটে ও সর্বশেষ তাম্রলিপ্তিতে।

মোটামুটি বাঙলার মানুষ ছিল কৃষিজীবী। বহির্বাণিজ্য চলত কৃষিজাত দ্রব্য ও সূক্ষ্ম বস্ত্র দিয়ে। ফসল ফলত অজস্র; ধান, গম, আদা, সরষে ও আখ। পেঁয়াজ ও রসুনের চাষ ছিল বটে কিন্তু ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা তা খেতো না। ফলের মধ্যে ছিল আম, তেঁতুল, মোচা বা কলা, নারিকেল, তাল, কাঁঠাল, আমলকী, উডুম্বর প্রভৃতি।

তালপাতায় লেখা হত, কাগজেও। কাগজও ছিল প্রচুর, তা দিয়ে ছাতাও তৈরি হত। সপ্তম শতকের চতুর্থ ধাপে চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং এসেও এ কথার পুনরুক্তি করেছেন।

সিল্ককে বলা হত কৌষেয় ; ক্ষৌমবস্ত্র ছিল একপ্রকার শণে (flax or hemp) তৈরি।

কর্ণসুবর্ণের লোক ছিল সাধুস্বভাব, অমায়িক ও বিদ্যানুরক্ত।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল গরু ও ষাঁড়, গাধা, হাতি, ঘোড়া, শূকর, কুকুর আর ভেড়া। ভাগলপুরের জঙ্গলে ছিল বুনো হাতি।

কাজেকর্মে জাতিত্বের দোহাই ছিল না ; কারণ হিউয়েন-সাং অনেক কৃষিজীবী ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। জৈনধর্মের বেশী সমাদর ছিল না ; শুধু উত্তর-বিহার, উত্তর-বাঙলা ও সমতটে তার কিছু প্রভাব ছিল। প্রথমে মৌর্যযুগে ও পরে গুপ্তযুগে পশ্চিম থেকে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ এসে প্রধানত উত্তর-বাঙলায় বসতি স্থাপন করেছিলেন বটে, কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন মুষ্টিমেয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠাও যে তাঁদের বৌদ্ধ বা জৈনদের চেয়ে বেশি ছিল তা নয়। নাথধর্মী (শৈব) ও বৌদ্ধরা ছিল সংখ্যায় বেশি।

তখন যে অচ্ছুতের সৃষ্টি হয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই ; কারণ হিউয়েন-সাং বলেছেন যে কসাই, মৎস্যজীবী, জল্লাদ, মেথর ও মুর্দাফরাশ শ্রেণীর লোকেরা অর্থাৎ মল ও অশুচি সম্মার্জকের দল নগর ও গ্রামের প্রাচীরের বাইরে বাস করত।

প্রত্যেক বসতবাটির চতুঃসীমায় ছিল বাঁশ বা কাঠের বেড়া। ঘর তৈরি হত কাঠের, ছাদ থাকত টালির অর্থাৎ পোড়ামাটির ; দেওয়ালে থাকত মাটির প্রলেপ, তার উপর চুন। মেঝে অনেক সময় মাটির সঙ্গে গোবর দিয়ে শক্ত করা হত। ইটের দেওয়ালও যে ছিল না তা নয়।

সাধারণত বসবার জন্য ব্যবহার হত ছোট ছোট মাদুরের, কখনো কাঠের তৈরি চৌকির। দড়ি দিয়ে ছাওয়া খাটুলির প্রচলন ছিল সর্বত্র। বালিশ তৈরি হত তুলায় আর তার ওয়াড় তৈরি হত সিল্কে অথবা অন্য কোনো মোলায়েম কাপড়ে।

গরীবের ঘরে যে বাসনের ব্যবহার ছিল তা তৈরি হত মাটি দিয়ে

অথবা কাঠে ; কখনো কখনো ধাতুর তৈরি দু'একটি থাকত। আর জল রাখার জন্য থাকত একটি কলস, হয় মাটির নয় তামার। ধনীর ঘরে সোনার ও রূপার তৈজসের অভাব ছিল না।

ধনীদের তো কথাই নেই, এমনকি গরীবরাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকত। দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করত সবাই। কেউ কেউ নাক দিয়ে জল টেনে নিয়ে নাক পরিষ্কার করত।

খাবার খেত গোবর দিয়ে নিকানো মেঝের উপর কাঠের থালায়, হয় মাদুরের আসনে, নয় পিঁড়িতে বসে, হাতখানেক দূরে দূরে সারি দিয়ে। সব রকম খাবারই সে থালায়ই দেওয়া হত ; কারো উচ্ছিষ্ট কাউকে দেওয়া হত না ; কাঁচা মাছ বা সবজিও খাওয়া হত না। মাটির থালায় খাওয়া হলে তা ফেলে দেওয়া হত ; সোনা, রূপা, তামা বা লোহার থালায় খেলে থালাটি মেজে নেওয়া হত। পোর্সেলিনের প্রচলন এদেশে ছিল না।

খাওয়ার পরে হাত মুখ খুব ভাল করে ধুতে হত। অপরিষ্কার লোক ছিল সমাজে নিন্দার্হ। ঘি, তেল, দুধ ও ক্ষীর মিলত সর্বত্র, আর অঢেল ছিল নানাপ্রকার পিঠা ও ফল।

খেতে দেওয়া হত প্রথমে একটু আদা ও নুন ; পরে গরম ভাত, সবজির ঝোল ও মাখন। সর্বশেষ আসত পিঠা, ফল, ঘি ও চিনি। কি শীতে কি গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা জলই পান করতে দেওয়া হত।

হিউয়েন-সাং বলেছেন, তাম্রলিপ্তিতে সাধারণ গৃহস্থও যে-কোনো অতিথিকে তিনজনের খাদ্যসম্ভার দিতেন ; ধনীরা দিতেন অন্তত দশজনের। অতিথি, ইচ্ছা করলে, তার আহার্যের প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশটি নিয়ে যেতে পারত।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যে মদ্যপানের বহুল প্রচলন ছিল ; ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সাধারণতঃ পান করত আঙ্গুরপানা ও আখের রস। শরবতও তৈরি হত সাত-আট রকমের ; যথা, কোচ্ছা বা ডাব, কলা ও তেলকুচার শরবত, উডুম্বর বা ডুমুরের শরবত, মৃদ্বীকা বা

আঙ্গুরের রস, খর্জুর, অম্ব ও জম্বুপানা (জম্বু—জাম, না পূর্ববাঙলায় জাম্বুরা বা বাতাবি লেবু ?)।

হিউয়েন-সাং চায়ের কথাও বলেছেন ; তবে তার প্রচলন বেশি ছিল না। কথাটা স্পষ্ট নয় ; চীনারা হয়তো কিছু চা পাতা দেশ থেকে সঙ্গে করে আনতেন। কিন্তু এ ধারণা সত্য নাও হতে পারে —সেটুকুতে আর কদিন চলে ? বিশেষতঃ তিনি বাঙলা দেশে এসেছেন তাঁর ভারতবর্ষ ভ্রমণের শেষের দিকে ; তিনি ৬২৯ থেকে ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় পনের বছর এ দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। তা যদি না হয়ে থাকে তবে এ সেই ভারতীয় চা যার সন্ধান পাওয়া গেছে ভুটান ও আসাম সীমান্তে, বহু পরে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে, মেজর রবার্ট ব্রুস ও মণিরাম দেওয়ানের বিজ্ঞপ্তিতে। পানীয় হিসাবে চা অবশ্য জনপ্রিয় হয়েছে মাত্র সেদিন, বিংশ শতকে।

দোষী ও নির্দোষের বিচারে সেকালে অগ্নিপরীক্ষা, বিষপরীক্ষা, জলে ডোবা ও ভাসা ইত্যাদি পরীক্ষার প্রয়োগ হত। অগ্নিপরীক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আগুনের উপর দিয়ে হাঁটতে হত ; যদি তাতেও সে অক্ষত থাকত তবে প্রমাণ হত তার নির্দোষিতা। বিষপরীক্ষারও সেই মূলকথা। যথাযোগ্য বিষপ্রয়োগেও যদি সে বেঁচে যায়, তবে নিশ্চয়ই সে নির্দোষ। পাথর দিয়ে ছালায় পুরে, অথই জলে ফেলে দিলেও যদি সে ভেসে উঠতে পারে তবে তাকে আর দোষী মনে করা কার সাধ্য ? ক'জনের ভাগ্যে এ সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হত কে তার হিসাব রেখেছে ?

রাজা-রাজড়ার যুদ্ধ হত চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে ; পদাতিক, অশ্বারোহী, রথারোহী ও গজবাহিনী। যুদ্ধাস্ত্র ছিল কি কি ? ঢাল, তলোয়ার, খড়্গ, বর্শা, তীর-ধনুক, প্রাস বা শূল, কুড়াল, বর্শা ও কুড়ালের একত্র সমাবেশে তৈরী নানারূপ অস্ত্র, ভিন্দিপাল বা দূরে পাথর ইত্যাদি ছুঁড়ে দেবার সরঞ্জাম।

সৈনিকত্ব ছিল বংশগত, আর কেবল যুদ্ধই ছিল তাদের পেশা। যুদ্ধযাত্রায় সৈনিকেরা বাজনার তালে তালে পা ফেলে চলত।

এ ছাড়া বাঙলার রাজাদের রাখতে হত নৌবাহিনী, আক্রমণের জন্য ও আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য।

গভর্নমেণ্টের দপ্তর বাঁধার জন্য ব্যবহার হত নীল রংএর ফিতা, যার বদলে আজ দেখা দিয়েছে লাল ফিতা, সঙ্গে এসেছে কুখ্যাত শব্দ 'red-tapism' অর্থাৎ রাজদপ্তরের অযথা বিলম্ব। সাধারণত রাজকীয় দপ্তরের কথা লিপিবদ্ধ হত তালপত্রে।

শবদেহ হয় দাহ করা হত, নয় নদীর স্রোতে ফেলে দেওয়া হত। কদাচিৎ জঙ্গলেও পরিত্যক্ত হত। বৃদ্ধবয়সে কেউ কেউ গঙ্গায় ডুবে প্রাণত্যাগ করত। শবের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়াকে অশুচি বলেই মনে করা হত।

সেকালের বাঙলা দেশের এই ছিল মোটামুটি চিত্র।

এবার হিউয়েন-সাংএর লেখা থেকেই মুদ্‌গিরি থেকে বাঙলার নানাস্থানের বৌদ্ধবিহারের খবর নেওয়া যাক। দেখা যায়, মুদ্‌গিরিতে ছিল দশটি বিহার, হাজার চারেক ভিক্ষুর আবাসস্থল। এদের মধ্যে বেশির ভাগই হীনযানপন্থী। ভাগলপুরের মোট দশটি বিহারের অবস্থাই শোচনীয়, ভগ্নপ্রায়। তাতে বাস করত মাত্র শ' দুই হীনযানপন্থী।

রাজমহলে ছিল ছয়-সাতটি বিহার; আবাসিক ছিল শ'তিনেক। পুণ্ড্রবর্ধনে বিশটি, ভিক্ষুর সংখ্যা হাজার-তিনেক। জৈন মন্দিরের সংখ্যা ছিল শ'খানেক।

সমতটে ছিল ত্রিশটি বিহারে হাজার-তিনেক ভিক্ষু, কিন্তু জৈন মন্দিরের সংখ্যা শ'খানেক। তাম্রলিপ্তিতে হাজারখানেক ভিক্ষু নিয়ে দশটি বিহার কিন্তু অন্যান্য মন্দিরের সংখ্যা এর পাঁচগুণ বেশি। কর্ণসুবর্ণে (স্বর্ণমৃত্তিকা বিহার) দশটি বিহারে হাজার দুই ভিক্ষু। অন্যান্য মন্দিরের সংখ্যা এর পাঁচগুণ।

মোটের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বাঙলা দেশে তখন নিস্তেজ হয়ে আসছে।

হর্ষবর্ধন নিজেও গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন না ; হিন্দুধর্মের প্রভাবকে তিনি এড়াতে পারেননি। বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমন্বয় করে তখন রাজকীয় যে পূজা হত তাতে প্রথম পূজা পেতেন বুদ্ধ, দ্বিতীয় আদিত্যদেব, তৃতীয় ঈশ্বর-দেব বা শিব। বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈনের মধ্যেও কোনো দ্বেষবিদ্বেষ ছিল না ; ধর্মের ভিত্তিতে সামাজিক প্রাধান্য যে কারো বিশেষ ছিল তা মনে করার কারণ নেই।

হর্ষবর্ধন লোকান্তরিত হলেন ৬৪৭ বা ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। যোগ্য উত্তরপুরুষের অভাবে তাঁর অখণ্ড বিস্তৃত সাম্রাজ্যও ভেঙ্গে চুরে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলারও এল চরম দুর্দশা। সৃষ্টি হল অসংখ্য সামন্তরাজের। দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, অশান্তি, বিশৃঙ্খলা চলল নিত্য—শুরু হল মাৎস্যন্যায়ের তাণ্ডব। বহিঃশত্রুরও অন্ত ছিল না ; কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্মণ, কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণ, এমনকি কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য ; বাজের মত সবাই ছোঁ মারল। গৃহে গৃহে অশান্তি ; দুর্বলকে আর সবলের হাত থেকে কে বাঁচাবে ? সারা বাঙলায় শুরু হল এক ঘোর অন্ধকারময় যুগ ৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে একশ' বছরব্যাপী অর্থাৎ ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

তারপর ঘটল এক অভাবিত আশ্চর্য ঘটনা। একে শুধু আশ্চর্য বলা চলে না ; এটি এমন একটি ঘটনা যার তুলনা তো সেকালের বিশ্ব-ইতিহাসে নেই-ই, এ কালেও নেই। সেই অঘটনই ঘটল এ বাঙলা দেশে।

সাগরমন্থনের কালে যেমন উঠেছিল অমৃতভাণ্ড, বহিঃশত্রুর পুনঃপুনঃ আক্রমণে ও বাঙলার খুদে খুদে সামন্তরাজদের এই বহুবর্ষ-ব্যাপী গৃহবিবাদের ফলেও উঠল তেমনি এক অমৃতভাণ্ড—সে ভাণ্ড মৈত্রীতে ভরপুর। সহসা এত মৈত্রীর স্রোত কি করে বইল, ইতিহাসে তার নির্দেশ নেই—শুধু নিদর্শন রয়েছে। তারা সবাই

একমত হয়ে, তাদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিয়ে গৌড়বঙ্গের সার্বভৌম রাজা বলে বরণ করল। সে সার্বভৌম রাজাই বাঙলার পালবংশের আদিপুরুষ, গোপাল (৭৫০-৭০ খ্রীঃ)।

বাঙালীর ইতিহাসে এই অভাবনীয় ঘটনাটির কারণ এখনো নির্ণীত হয়নি। এটি কি সর্বধর্মসমন্বয়ের ফল, যার শুরু দেখা দিয়েছিল হর্ষবর্ধনের আমলে ? না, এর মূল কারণ রয়েছে বাঙালীর জন্মবীজে ? না, বুদ্ধদেবের পূর্ণ গণতন্ত্রে ? যাই হোক, বাঙালী তার ইতিহাসের এ অধ্যায়টি নিয়ে সত্যি গর্ববোধ করতে পারে।

এর ফলে বাঙলায় এল মোটামুটি শান্তি ও কল্যাণের যুগ। এর পরে একাদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত পৃষ্ঠাগুলি পর পর উলটিয়ে যাব। গোপাল রাজত্ব করলেন ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিশ বছর ; পুত্র ধর্মপাল পরবর্তী চল্লিশ বছর ; তাঁর পুত্র দেবপালও রাজতক্তে রইলেন চল্লিশ বছর। এই একশ' বছর পরে আবার রাজ্যের পতন শুরু হল। কয়েক পুরুষ পরে এলেন দ্বিতীয় গোপাল, পরে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। তাঁর রাজত্ব আটাশ বছর স্থায়ী হয়ে শেষ হল ৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে।

বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি আমাদের মূল লক্ষ্য নয় ; তাই এ পাতাগুলি উলটিয়ে যাওয়া হল ছায়াছবির মত। এখন দেখা যাক গোপালের কাল থেকে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের কাল পর্যন্ত বাঙালীর অন্যান্য পরিচয়-পত্র যার অস্তিত্ব ইতিহাসের পাতায় এখনো রয়েছে এবং যা দিয়ে তাকে আরও স্পষ্ট করে বোঝা যাবে।

রামপাল (১০৭৭-১১২০ খ্রীঃ) ছিলেন রাজচক্রবর্তী, হর্ষবর্ধনের চেয়েও প্রতাপশালী। কান্যকুব্জে তাঁর অভিষেক হয়েছিল। তিনিই ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বড় বৌদ্ধবিহার স্থাপন করেন সোমপুরে* অর্থাৎ উত্তর বাঙলার পাহাড়পুরে ; আরো একটি তৈরি করেন

* রাজসাহীর সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠার কীর্তি ধর্মপালের (৭৭০-৮১০)।

বিহারের ওদন্তপুরে*। কিন্তু পালরাজাদের কেউই গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন না। মনে হয়, তাঁর কালে বাঙালীর সংস্কৃতচর্চারও প্রসার ঘটেছিল; তবে সে চর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিল মিথিলা, বারাণসী ও দক্ষিণাপথ। জন্মবীজ-সূত্রে দ্রাবিড়দের প্রতি বাঙালীর কি মনের টান ছিল? যদি শঙ্করাচার্যের জীবিত-কাল ৭৮৮ থেকে ৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরা যায়, তবে তাঁর গুরুর গুরু গৌড়পাদ হয়ত গোপালের সমসাময়িক, নয়ত ধর্মপালের। গৌড়পাদ যে বাঙালী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই; আর একথা অস্বীকার করারও উপায় নেই যে তাঁর মাণ্ডূক্য-কারিকা শঙ্করের বেদান্তবাদের মূল দৃঢ়তর করেছে। শঙ্কর নিজেও বারবার শ্রদ্ধাভরে এই পিতামহের কথা উল্লেখ করেছেন। গৌড়পাদের চিন্তাধারা বৌদ্ধ-মহাযানপন্থী-ঘেঁষা। তাই কেউ কেউ মনে করেন, তিনি নিজেও প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ছিলেন; অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

তাঁরই কাল থেকে হয়ত বাঙালীর মেধা সংস্কৃত-চর্চায় আত্মপ্রকাশ করেছিল।

দক্ষিণাপথের দ্রাবিড়ীদের বহির্বাণিজ্যে দক্ষতা ছিল অপরিসীম। তাদের সওদার ক্রয়-বিক্রয় চলত পশ্চিমে মিশর পর্যন্ত, পুবে সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জে। দ্রাবিড়ী জন্মবীজ-সূত্রেই হয়ত বাঙালী এ ব্যাপারে ছিল তৎপর। বৌদ্ধধর্মের নৈতিক চরিত্রবল ও কর্মবাদের সজীবতা তখনও ম্লান হয়ে আসেনি; কাজেই সামাজিক উচ্চস্তরের মানুষের চরিত্র ছিল দৃঢ়। তার পরিচয় এর কিছু পরবর্তী যুগের সাহিত্যেও মেলে। বণিকের স্থান ছিল উচ্চস্তরে; সেকালের গল্পে রাজার ছেলের সখা ছিল মন্ত্রীর ছেলে আর সওদাগরের ছেলে। অষ্টম শতক পর্যন্ত বাঙলার প্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্তি বা তমলুক। সেখান থেকে বহির্বাণিজ্য চলত সাধারণত সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিয়ো ইত্যাদি দ্বীপে। সঙ্গে সঙ্গে সে সব দেশে গড়ে উঠল হিন্দু

*বিহারের এই বিহার ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত—অধুনা বিহার সরীফ।

উপনিবেশ ; চতুর্থ শতকে জাভার সবটাই হয়ে গেল হিন্দুস্থান—সুমাত্রা ও ক্যাম্বোডিয়াও (ইন্দো-চায়না) বাদ গেল না। ডক্টর ভাণ্ডারকার লিখেছেন, সুমাত্রা, জাভা ও ক্যাম্বোডিয়ার এ উপনিবেশগুলি প্রধানত ভারতবর্ষের পূর্ব উপকূলেরই সৃষ্টি আর এতে বাঙলা, উড়িষ্যা ও মুসলিপট্টমের দান অপরিমেয়।

বাঙলার বেসাত বা পণ্যের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তার মধ্যে কেউ কেউ জুড়ে দিয়েছেন কাঁচের কথা। যদিও কাঁচের জন্ম প্রথম কোথায় হয়েছে তা নির্ণীত হয়নি, তবে বাঙলা দেশে হয়ত তার প্রচলন হয়েছিল দ্রাবিড়ী বাণিজ্যসূত্রে মিশর প্রভৃতি দেশ থেকে অথবা রোমানদের কাছ থেকে গুপ্তরাজাদের আমলে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে।

কিন্তু অষ্টম শতকের পরে বাঙলার বহির্বাণিজ্যে হল অধোগতি : তাম্রলিপ্তির নাম যেন ক্রমশঃ ডুবে গেল। এর কারণ হয়ত একাধিক : কিছুটা হয়ত মনুস্মৃতিতে সমুদ্রযাত্রা নিষেধের ফল, কিছুটা বাঙালী চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব, কিছুটা আরবীয় মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা, কিছুটা হয়ত বা প্রাকৃতিক কারণে বন্দরেরই হীনাবস্থা।

আরবীয় বণিক সুলেমান ভারতবর্ষে এসেছিলেন ৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে। মনে হয় তিনি বাঙলায়ও এসেছিলেন ; কারণ লিখেছেন, এদেশে অতি সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র পাওয়া যায় (মসলিন)—বাজারে লেনদেনের জন্য কড়ির প্রচলন রয়েছে, আর সন্নিহিত জঙ্গলে (অর্থাৎ সুন্দরবনে) প্রচুর গণ্ডারের বাস। এরই পাশের রাজ্য কামন—যাকে ঐতিহাসিকেরা কামরূপ বা আসাম বলে নির্ণয় করেছেন। তখনও হয়ত বাঙলার বহির্বাণিজ্য কিছুটা অব্যাহত ছিল।

বাঙলায় ইটের প্রচলন হয়েছিল বহুকাল পূর্বে ; ছোট ছোট ইট, যার উত্তরপুরুষদের নিদর্শন এখনও কোথাও কোথাও মেলে। গাঁথুনি ছিল কাদার, চুন-সুরকীর—অনুমান করতে আপত্তি নেই যে

বরাহমিহির-বর্ণিত 'বজ্রলেপ'ও রাজারাজড়ারা সংগ্রহ করতেন। সেকালের ইষ্টকনির্মিত সৌধ বা মন্দিরের চিহ্নমাত্রও নেই, যদিও তার স্বপ্ন রয়েছে আঁকা কাব্যে ও সাহিত্যে। যা এখনও জীবন্ত হয়ে রয়েছে তা সেকালের পোড়ামাটির শিল্প—যাকে ইংরাজীতে বলা হয় terra-cotta।

পাথরের অভাবে বাঙলার ভাস্কর্য-দীপ্তির ক্ষণপ্রভার মতই চকিত স্ফুরণ হয়েছিল। তা সম্ভব হয়েছে গুপ্তযুগের অনুপ্রেরণায় ও পালযুগের প্রযোজনায়। নবম শতকের বাঙালী স্থপতি ধীমান ও বিটপাল—পিতা ও পুত্র, জাভার বিখ্যাত বরবুদুর হিন্দুমন্দিরে কলিঙ্গ ও গুজরাটের স্থপতিদের সাথে পাল্লা দিয়ে তাদের কীর্তির চিহ্ন রেখে গেছে। পালযুগের তক্ষণ-শিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে রয়েছে বার্মায়, তিব্বতে, নেপালে, ক্যাম্বোডিয়ায় ও ইন্দোনেশিয়ায়। এ সব শিল্প গোড়া থেকেই ছিল বংশগত; এখনও বাঙালী সমাজে মোটামুটি সে ধারাটিই বজায় আছে। স্থাপত্য ক্ষীণজীবী হলেও, সূত্রধর বা বাঁশ, বেত, শণ ও কাঠের গৃহনির্মাতা, এখনো তার বংশধারা রক্ষা করে চলেছে: কোনো কোনো শতকে, উপযুক্ত প্রতিবেশে, তাদের কারুশিল্প একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করেছে। ফার্গুসন্ বলেছেন, গৃহনির্মাণে বাঙলার কৃতিত্বের পরম বৈশিষ্ট্য তাদের অর্ধবৃত্তাকৃতি ঢেউ-দোলানো (curvilinear) ছাদের কল্পনা ও সৃষ্টি ; শুধু কাঠ, বাঁশ ও শণের ছাদে নয়, ইটের তৈরি ঘরেও। এখনো তার চিহ্ন রয়েছে। নদীমাতৃক পূর্ব বাঙলায় নানাপ্রকার নৌকা নির্মাণে তাদের বহুযুগের খ্যাতি রয়েছে অব্যাহত।

গুপ্তযুগে বাঙালীর তুলিতে যে চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল, কারো কারো মতে, তার নিদর্শন রয়েছে অজন্তা গুহায়। তাঁদের মতে এতে বাঙালীর তুলির ছাপ সুস্পষ্ট। এ মতের সমর্থনে প্রখ্যাত শিল্পী অসিত হালদার যে নয়টি কারণ উল্লেখ করেছেন তার সবগুলিই প্রণিধানযোগ্য। আমরা সেগুলির কয়েকটি উদ্ধৃত

করছি: (১) অজন্তার ছবিতে অবিকল বাঙলা খড়ে-ছাওয়া আটচালা, যার সন্ধান আর কোথাও মেলে না, (২) যশোহর ও মেদিনীপুরের কাঠের পাটার উপর অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে অজন্তার চিত্রের সাদৃশ্য অপরিসীম, (৩) অজন্তার চিত্রে পুরুষ ও নারীর ধুতি ও শাড়ি ঠিক বাঙালীর মত, (৪) কালীঘাটের পটের ও অজন্তার ছবির রেখা-কৌশলের মধ্যে রয়েছে অপরূপ সামঞ্জস্য।

পালযুগেও যে বাঙালীর সে চিত্র-কৌশল অব্যাহত ছিল তাতে সন্দেহ নেই, তাই তার মনোরম নিদর্শন আজও রয়েছে বাঙালীর চিরন্তন আলপনায়, পিঁড়িচিত্রে, নক্সী কাঁথার সূচীশিল্পে ও কালীঘাটের পটাঙ্কনে। তারপরে অবশ্য বাঙালীর তুলিকা নানা পথ অতিক্রম করেছে, কোনো পথ জনপ্রিয় হয়েছে কোনোটি হয়নি, কিন্তু এ সব চিরন্তন শিল্পকর্মের প্রতি তার অনুরক্তি আজও এতটুকু ম্লান হয়নি।

এখন বাঙালী জাতির সমাজ-ব্যবস্থার গোড়ার কথাটা চিন্তা করে দেখা যাক।

সমাজ-ব্যবস্থা একটা মৈত্রীবন্ধন; সে মৈত্রী প্রধানত সংস্কারগত। সংস্কার প্রতিবেশের প্রভাবে বা শিক্ষায় বদলে যায় বটে, তবে আদিম জগতে তা গড়ে উঠেছিল কতকগুলি মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে। এমনি একটি বিশ্বাস যে পুনর্জন্ম, তাতে সন্দেহ নেই। জীববিদ্যার সাধারণ সূত্রগুলি নির্ধারিত হওয়ার আগে জীবের জন্ম-মৃত্যু-রহস্য ছিল মানব প্রজাতির চোখে অত্যাশ্চর্য ঘটনা। অতি স্বাভাবিকভাবেই এ দু'টিকে একত্র করে অনেক আদিম মানব-গোষ্ঠীরই ধারণা হল, জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে একটি অদৃশ্য কিন্তু স্পষ্ট সূত্র রয়েছে। সে সূত্রটি এই যে মৃত প্রাণীর প্রাণ যৌন-সম্বন্ধের কালে নারীর দেহে প্রবেশ করে। এ সূত্রটিকে পরবর্তী কালে শুদ্ধ করে বলা হয়েছে পুনর্জন্মবাদ, এবং কর্মফলের সঙ্গে যুক্ত করে গড়ে উঠেছে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুদর্শন।

আদিম অষ্ট্রিক ভাষাভাষীর সকলেরই যে এ সূত্রটিতে পরম বিশ্বাস ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আদি-অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে দূরপ্রাচ্যের দ্বীপপুঞ্জ, ভারতবর্ষের কোল গোষ্ঠী, সবই ছিল এই ভাযাভাষী ও একই সংস্কারাবদ্ধ। এখনো অস্ট্রেলিয়ায় এমন সব আদিম মানবগোষ্ঠী বর্তমান যাদের এ বিশ্বাস একান্ত বদ্ধমূল বলে কারো কারো অভিমত।

এর ফলে যৌন-সংসর্গ দেখা দিল একটি পরমাশ্চর্য ঘটনারূপে এবং ভারতবর্ষের কোলেরা মহেঞ্জোদরোর শিবলিঙ্গের মধ্যে সে আশ্চর্য ঘটনার প্রতীক দেখতে পেয়ে এঁকে প্রথমে সৃষ্টির দেবতারূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা করল না। বলা বাহুল্য, এ সব পরম্পরাগত যুক্তি মাত্র; এর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বলার মত বিশেষ যুক্তি নেই। মাতৃকেন্দ্রিক দ্রাবিড়দের আদি-দেবতার রূপ আধুনিক বাঙালীর কালী-কল্পনার কাছাকাছি। তার চিহ্ন এখনো বর্তমান রয়েছে অন্ধ্রের প্রতিটি গ্রামে 'গঙ্গাম্মা' রূপে আর তামিলনাডুর প্রতিটি গ্রামে 'মাতৃআম্মা' বা 'মাড়ীআম্মা' রূপে। এঁদের জন্য যে সর্বত্র মন্দির রয়েছে তা নয়, হয়তো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বৃক্ষতলে এঁদের আবাস। এঁরা শুধু কালীর মতই সর্বজনীন দেবতা নন, এঁদের পূজার জন্য, কালীর মতই ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। এঁরা কালীর মতই সার্বলৌকিক; আপামর সবাই এঁদেরও পূজা করতে পারে। বেশীদিনের কথা নয়, ডাকাতেরাও বাঙলা দেশে কালীপূজা করে দস্যুতায় বের হত। এখনও 'গঙ্গাম্মা' ও 'মাড়ীআম্মা'র পূজক সে-সব দেশের অন্ত্যজরাই।

কোল ও দ্রাবিড়ের মিলনে হয়ত শিবের পূর্ণপ্রতীক হল সযোনি-শিবলিঙ্গ এবং তারই প্রচলন হল সর্বত্র। মোটের উপর পশুপক্ষী-রক্তপ্রিয় কালী হলেন অলক্ষ্যে শিবশক্তি। আর শিব-পূজা প্রবল হল সারা দক্ষিণাপথে।

উত্তরাপথে প্রতিষ্ঠিত হলেন বেদোক্ত প্রেমের দেবতা বিষ্ণু;

তাঁর সঙ্গে স্বভাবত এলেন তাঁর শক্তি। সম্ভবত প্রথমে শিব ও বিষ্ণু দুই-ই ছিলেন সৃষ্টির দেবতা, পরে প্রলয়ের দেবতা বলেও গৃহীত হলেন। বেদোক্ত ন্যায়ের দেবতা রুদ্র বা শিব পরিবর্তিত হলেন প্রলয়ঙ্কর শিবরূপে, বিষ্ণুও গীতায় বর্ণিত হলেন সংহারকর্তারূপে। পূর্বেই বলা হয়েছে, এ সব মতের সঙ্গে বা বিপক্ষে যে যুক্তি রয়েছে তার কোনোটিই প্রবল নয়।

মতান্তরে লিঙ্গপূজার সঙ্গে মহেঞ্জোদরোর শিবের কোন সম্পর্ক নেই—রুদ্রের তো নেই-ই, কারণ বেদে লিঙ্গপূজক 'শিশ্নদেবে'র ভক্ত বলে ঘৃণিত। লিঙ্গপূজার জন্ম হয়েছে আরো আদিম জগতে এবং তার প্রচলনও ঘটেছিল সারা জগতেই। পাশ্চাত্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত এর প্রভাব ছিল অপরিসীম, বিশেষ করে ফরাসী দেশে, এবং অত্যন্ত কদর্যরূপে। এখনো হয়ত তার ছিটেফোঁটার সন্ধান মেলে সে দেশে।

বৌদ্ধ ও জৈন মত---দু'টিই বেদ-বিরোধী। বৈষ্ণবতন্ত্র, শিবতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্য অর্ধ-বেদোক্ত বলা চলে ; শাক্ত পুরোপুরি বেদ-বহির্ভূত।

বাঙলায় অষ্টম শতক থেকে যে মতদ্বয়ের প্রাবল্য দেখা গেল তা হল বৌদ্ধ-তান্ত্রিকবাদ বা বৌদ্ধ সহজ-মত ও শৈব 'নাথ'-মত। দু'য়ের মধ্যে যে প্রভেদ বেশি ছিল তা নয়। ক্রমে এ দু'টির স্পষ্টতর রূপ দেখতে পাওয়া যাবে। ব্রাহ্মণ্যের মধ্যেও ছিল তান্ত্রিকবাদ ; এই তান্ত্রিকবাদের মধ্য দিয়েই ক্রমে এ দু'য়ের অর্থাৎ বৌদ্ধ ও হিন্দু মতের মিলন হয়ে গেল। বৌদ্ধতন্ত্রমতের চামুণ্ডা, বাশুলী, তারা, ক্ষেত্রপাল ঠাঁই পেল হিন্দুধর্মে ; কেউ কেউ বলেন, হিন্দুর কালী, ভদ্রকালীও বৌদ্ধতন্ত্রেরই দেবী। অপর পক্ষে, নালান্দায় পরে দেখা গেল শিব, পার্বতী ও বিষ্ণুমূর্তি ; নিশ্চয়ই তাঁরা মহাযান বৌদ্ধদের পূজা পেতেন। তান্ত্রিকবাদ দু'টির মধ্যে শিবের স্থান ছিল একটু বিশিষ্ট ; দু'দলই শিবকে পরম মান্য করে চলত। এমন কি,

শেষাশেষি বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতায় শিবের স্থান ছিল স্বয়ং বুদ্ধের পরেই। শৈব 'নাথ'-মতেও শিবের স্থান অতি উচ্চে।

প্রবল তান্ত্রিকতার মধ্যে দৈবের আর কোনো স্থান রইল না। যথাযথ তান্ত্রিক আচার পালন করে মানুষ যে দেবতার চেয়েও ক্ষমতাশালী হতে পারে, এ ধারণা হল বদ্ধমূল। মহাযান-ঘেঁষা নাথধর্মে দেখা যায় দেবতারা মানুষের ভয়ে কম্পমান হয়েছেন। গোরখনাথ তো মৃত্যুঞ্জয়ই হলেন ; ইচ্ছামত তিনি যা কিছু করতে পারতেন। 'ময়নামতীর গানে' ক্রমে এর আরো কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

বাঙালী জাতির জন্ম হয়েছে বৌদ্ধ-সংস্কারের আঁতুড় ঘরে, যদিও সে ঘরের দুয়ার অন্যান্য মতের কাছেও ছিল অবারিত। কিন্তু সে বৌদ্ধমতের ধারা, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ ছাড়াও, বাঙলা দেশেও শুষ্ক হয়ে গিয়েছে। অস্তমান বৌদ্ধমত-সূর্যের শেষরশ্মি অবশ্য কিছু-দিন বজায় ছিল এই পূর্বাঞ্চলেই, কাজেই এ অঞ্চলই তার বিলয়ের শেষ সাক্ষী। বাঙালী জাতির চরিত্র ও সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাই সে অস্তমান সূর্যের হিসাব-নিকাশের মূল্য রয়েছে। আমরা সে ইতিহাসের অনুসরণ করছি।

বাঙলার 'সমতটে'ই যে বৌদ্ধমত সর্বাপেক্ষা বেশি প্রসারলাভ করেছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সপ্তম শতকের তৃতীয় পাদে সমতটের রাজা রাজভট্ট ছিলেন গোঁড়া বৌদ্ধ ; তাঁরই আত্মীয় শীলভদ্র হিউয়েন-সাংএর শিক্ষাগুরু। তাই সমতটে বৌদ্ধমতের প্রাধান্যও ছিল ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত। পূর্ব বাঙলার চন্দ্র রাজারাও অবশ্য বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু গোঁড়া নন। রানী প্রভাবতী কুমিল্লার দেউল-বাড়িতে শর্বাণীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। আরো কিছুকাল পরে, দশম কি একাদশ শতকে, বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমতপন্থী গ্রাম বজ্রযোগিনীতে ধর্মদেবের মূর্তি-প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধ ও বাসুদেবকে সমপর্যায়ে ফেলা হয়। অন্যত্র কিন্তু হিউয়েন-সাংএর কাল থেকেই বৌদ্ধমতের

অবক্ষয় শুরু হয়েছিল—ব্রাহ্মণ্যের অধিকার-বিস্তারে। কথিত আছে, মহানায়কত্বে গোপালের মনোনয়নের পূর্ব-মুহূর্তে জনসাধারণ ধ্বংসোন্মুখ বৌদ্ধবিহারের ইট, কাঠ নিয়ে নিজেদের বাড়ি নির্মাণ করতে শুরু করেছিল।

কালক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রের মধ্যে যে সেতুটির সৃষ্টি হল তার ফলে পূর্বাঞ্চলের মহাযান বৌদ্ধমত আর তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে বজায় থাকতে পারল না। পাল রাজারা কালের গতি রোধ করতে কিছু কিছু চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা নিজেরাও গোঁড়া ছিলেন না, আবার তাঁদের মন্ত্রীরাও ছিলেন বিষ্ণু-উপাসক ব্রাহ্মণ। ফলে মহাযান বৌদ্ধমতের কাঠামোই বদলে গেল। বাঙালীর আঁতুড় ঘরের সংস্কার লোপ পেল বটে, কিন্তু তা রেখে গেল তান্ত্রিকতার অক্ষয়-চিহ্ন যা তার ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনে আজও অব্যাহত রয়েছে। ব্রাহ্মণ্যকে এখনও সে গুরুভার বহন করতে হচ্ছে। ফলত বাঙালীর দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ ও প্রেরণার ভিত্তি সবই তান্ত্রিক।

এবার বৌদ্ধধর্মমতের অবক্ষয়ের কারণগুলি ক্রমে দেখা যাক।

প্রথমত, হীনযান ও মহাযান দু'টি মতের উদ্ভব। ক্রমে মহাযানে তন্ত্রের অনুপ্রবেশ, যার ফলে এর কাঠামোই গেল বদলে; অষ্টম শতক থেকে তান্ত্রিকতা প্রবল হল, যদিও এর বহু পূর্ব থেকেই এর ক্ষীণধারা ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে দেখা দিয়েছিল। পাল রাজাদের উদারতার সুযোগে সে ধারা ক্রমবর্ধিত হয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যাতে হিন্দু ও বৌদ্ধে পার্থক্য আর বিশেষ কিছু রইল না।

দ্বিতীয়ত, পাল বংশের পরবর্তী সেন রাজারা ছিলেন বৈষ্ণব, অবশ্য তান্ত্রিকতা-ভিত্তিক। রাজধর্ম হল প্রবল, বৌদ্ধরা হল আরো কোণ-ঠাসা। অনেক বৌদ্ধ পেগু, আরাকান প্রভৃতি দেশে চলেও গেল।

তৃতীয়ত, এর পরে, ত্রয়োদশ শতকের শুরুতেই বাঙলার অনেকাংশ

দখল করল তুর্কীরা। প্রধানত অর্থের লোভে লুঠ করল বহু বৌদ্ধ-বিহার। মগধের বিক্রমশীলা বিহারের একটি ভিক্ষুও রক্ষা পেল না। এমনি হত্যাকাণ্ড ও দস্যুতা ঘটল অনেক বৌদ্ধবিহারে। বৌদ্ধদের মধ্যেও নৈতিক চরিত্রের এত অবনতি ঘটেছিল যে এ সব ব্যাপারে লিপ্ত অর্থগৃধ্নু গুপ্তচরের অভাব হয়নি! ক্রমে মুসলমান পীর-দরবেশের দল নানাস্থানে ঘাঁটি করে বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে শুরু করল প্রধানত তাদের কেরামত দেখিয়ে। প্রাণভয়েও অনেকে রাজধর্মে দীক্ষা নিল। এদিকে বাঙলার হিন্দুর দলের বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর প্রতি ঘৃণা উঠল চরমে; অবশ্য তার কারণ ছিল, সে কারণ এদের নৈতিক চরিত্রের চরম অবনতি। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, "ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হিন্দু-পল্লীর আশপাশ দিয়া চলিয়া গেলে তাহাদের ছায়াস্পর্শ অসহ্য হইত। এই ঘৃণার দরুন পূর্ববঙ্গের শত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া ত্রাণ পাইয়াছিল।"

ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি বাঙালী বৌদ্ধকবি রামচন্দ্র কবি-ভারতী এর জন্যই দেশ ছেড়ে পাড়ি দিলেন লঙ্কাদ্বীপে। লঙ্কা তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করল।

তা ছাড়াও বৌদ্ধরা কিছু কিছু হিন্দু হল, কেউ কেউ নাথধর্মে ও সহজিয়া ধর্মে হতে থাকল রূপান্তরিত।

এমনি চলল কয়েক শ' বছর। পরিশেষে বাঙলার বৌদ্ধমতের ধারাটি এসে মিশে গেল শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব-সমুদ্রে—ষোড়শ শতকে। তাই বলে যে বাঙলায় বৌদ্ধদের নিঃশেষ বিলয় ঘটল তা নয়; তাদের চিহ্ন রয়ে গেল উত্তর-বাঙলার দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে আর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়েক লক্ষ মানুষের মধ্যে। তবে তা বেঁচে রইল জীবন্মৃত হয়ে।

দ্বাদশ শতকে কবি জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দে' বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলে বন্দনা গাইলেন। হিন্দুরা অবশ্য তা পূর্বেই মেনে

নিয়েছিল, ষষ্ঠ শতক থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায় গরুড় পুরাণে, বরাহ পুরাণে ও বৃহৎ সংহিতায়।

পরিশেষে আর একটি কথা বলে আমাদের পটভূমিকা রচনা শেষ করব। কোনো বিশিষ্ট কালের সামাজিক ইতিহাস রচনায় সেকালে রচিত সাহিত্যের মূল্য অভাবিত। সে সাহিত্যের মধ্যেই সেকালের মানুষের জীবনযাত্রা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তাধারা, সমস্যা প্রভৃতি প্রতিফলিত হয়। অবশ্য লেখকের ব্যক্তিগত রুচি সে প্রতিফলনকে কিছুটা অস্পষ্ট করতে পারে, তথাপি তার গতি ও প্রকৃতি নানাসূত্রে ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে মোটামুটিভাবে কোনো বিশিষ্ট কালে রচিত সাহিত্যই সেকালের মানুষের সমাজগত জীবনযাত্রার দর্পণ—সে যে দেশেরই হোক না কেন। আমরা এই সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা রচনায় এ পথটিই অনুসরণ করব।

চর্যাপদের কাল

[দুই]

উত্তরবঙ্গ ও রাঢ়	পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ
মহীপাল (৯৮৮-১০৩৫)	চন্দ্রবংশ
রামপাল (১০৭০-১১২০)	গোবিন্দচন্দ্র (১০১০-১০৩৫)
	পরে
	বিক্রমপুরে বর্মবংশ
	কুমিল্লায় পট্টিকেরা

আমাদের যবনিকা উত্তোলিত হল একাদশ শতকের প্রারম্ভে, যখন পালবংশের প্রথম গৌরব-পর্বের শেষে মহীপাল হৃতগৌরব উদ্ধারে ব্যস্ত।

তখনো মহীপাল 'গৌড়বঙ্গের' রাজা, কিন্তু সে গৌড় ও বঙ্গের সঠিক সীমা-নিধারণ প্রায় অসম্ভব। মোটামুটিভাবে সে গৌড় ছিল রাঢ় ও বরেন্দ্রের এক সমষ্টিগত দেশ। রাঢ় ছিল অজয় নদ দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত। উত্তর রাঢ়কে বলা হত ব্রহ্ম, দক্ষিণকে সুহ্ম।* রাঢ় ছিল মোটামুটি আধুনিক বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ, হয়ত তার সঙ্গে জুড়ে ছিল মানভূম ও হাজারীবাগের খানিকটা।

বঙ্গের সীমা নির্ধারণ আরো কঠিন ব্যাপার। সমতট ও হরিখেল বঙ্গের ভিতরে না বাইরে ছিল তা বলা অসম্ভব। হরিখেল বোধহয় আধুনিক বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালির কিয়দংশ, আর সমতট আধুনিক চব্বিশ পরগনা ও কুমিল্লা। এ সবই প্রায় অনুমান, কিছুই সঠিক বলা যায় না।

---

* উত্তর রাঢ় ও তক্ষন রাঢ়।

আর কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার আগে, বৌদ্ধধর্মের হীনযান, মহাযান, বজ্রযান ও সহজযান সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করে নেওয়া ভাল।

মূলত এ মতগুলির দ্বন্দ্ব গৌতম বুদ্ধের দু'টি কথার তাৎপর্য নিয়ে। কথা দু'টির একটি 'নির্বাণ', অন্যটি 'করুণা'। কোনোটির অর্থই বুদ্ধ নিজে স্পষ্ট করে বলে যাননি, লিখেননি তো নিজে কিছুই। অথচ নির্বাণ-ই বৌদ্ধধর্মের শেষ কথা।

হীনযানে জৈন মতেরই মত ঈশ্বরের স্থান নেই। একমাত্র জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদে হীনযানীরা বিশ্বাস করে। এই কর্মচক্রই জন্মজন্মান্তরে মানুষের মন, দেহ ও স্থান অর্থাৎ জগতের কোন্ স্তরে তার জন্ম হবে তা নির্ধারিত করে। এ কর্মচক্রের অচ্ছেদ্য বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায় 'ত্রিশরণ'—বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ—নিয়ে। ত্রিশরণ নিলে নির্বাণ অর্থাৎ দুঃখ থেকে আত্যন্তিক মুক্তিলাভ ঘটে। কৃচ্ছ্র-সাধন-যুক্ত এ পথ বড় কঠিন পথ, তাই এ পথের যাত্রীসংখ্যাও কম।

কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর সংখ্যা, বাড়ল তাদের নৈতিক সমস্যা। বুদ্ধের তিরোধানের পরে বৌদ্ধ-বিহারে-বিহারে শৃঙ্খলা বজায় রাখা বেশি দিন চলল না; নির্বাণের অর্থ সম্পর্কে নানা তর্কবিতর্কেরও সৃষ্টি হল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে, অর্থাৎ বুদ্ধের জন্মের প্রায় সাত শ' বছর পরে এলেন নাগার্জুন তাঁর মহাযান মতের বার্তা নিয়ে। তিনি হীনযানের প্রচলিত মতকে নাকচ করে দিয়ে নির্বাণের যে অর্থ করলেন, তাতে মনে হল, নির্বাণলাভ করলে মানুষ শূন্যে পরিণত হয়; কোথাও সে যায় না, কোনো কিছুই তার অবশিষ্ট থাকে না। হীনযানের ভাষ্য লেখা হত পালিতে, মহাযানের ভাষ্য লেখা হল সংস্কৃতে; ফলে ক্রমে মহাযানপন্থীর দল বেড়ে গেল, নানা ধর্মমতের সঙ্গে হল এর সংযোগ, আর নানা মতের অনুপ্রবেশও ঘটল মহাযানে। ক্রমে মহাযানীরা হীনযানে একক আত্মনির্বাণের চেষ্টাকে বলল আত্মপরায়ণতার নামান্তর, আর তারা করুণার সঙ্গে

যুক্ত করে সর্বপ্রাণীর মুক্তি বা নির্বাণের আদর্শ গ্রহণ করল। ফলে মূলগত আদর্শে দেখা দিল চরম প্রভেদ।

কিন্তু নির্বাণরূপী শূন্যবাদে সাধারণ লোকের মন ভরল না ; ক্রমে এর সাথে যুক্ত হল বিজ্ঞানবাদ অর্থাৎ পরম জ্ঞানই নির্বাণের পরিসমাপ্তি। কিন্তু তা-ও সাধারণ লোকের কাছে বোধগম্য হল না ; তাই ক্রমে যুক্ত হল এর সাথে মহাসুখবাদ অর্থাৎ পরম সুখই নির্বাণের চরম অবস্থা। এই ত্রয়ীর, অর্থাৎ শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখবাদের সমন্বয়ে যে নির্বাণ গঠিত তা-ই হল বজ্রযানের মত।

এর সঙ্গে এসে যুক্ত হল 'বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা', যার জন্ম হয়েছিল হয়ত বুদ্ধের আমলেই। ফলে, মহাসুখের অর্থ গেল বদলে ; ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর কাছে সমাজবন্ধন শিথিল, তাই মহাসুখের অর্থ স্থূল হতে স্থূলতর হয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটল নারী-সঙ্গমে। অর্থাৎ নারী-সঙ্গমে যে সুখ তা-ই মহাসুখ। এর নজির খুঁজেও বের করা হল ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে (দ্বিতীয় অধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড ১—২)—বামদেব্যা-উপাসনায়। এ মন্ত্রটির যে অংশটি মহাসুখবাদীরা লুফে নিল তা হল 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ ; তদ্ ব্রতম্' অর্থাৎ কোনো স্ত্রীকেই পরিহার করবে না—এই ব্রত।

এই মহাসুখবাদ প্রচার করলেন সিদ্ধাচার্য বাঙালী লুইপাদ ; কাজেই, গৌতম বুদ্ধ যা পারেননি, লুই তা পারলেন। এই সহজ-যানে অর্থাৎ সহজ-সংঘের পালে ভর করে তার ভবনদী-পারের নৌকা তরতর করে ছুটে চলল নির্বাণের পথে ; অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম জাহান্নমে গেল। এই লুইপাদকে কেন্দ্র করে যে সমাজ-জীবন গড়ে উঠল একাদশ শতকে বাঙলায়, তারই অপূর্ব চিত্র এঁকেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর উপন্যাস 'বেণের মেয়ে'তে।

'ধান ভানতে মহীপালের গীত' গেয়ে সেকালে পল্লীবধূরা যে প্রশস্তি রচনা করেছিল তা জাতীয় ইতিহাসের প্রবাদ হয়ে উঠেছে। একথা সত্য যে পাল রাজারা ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ মতের মধ্যে সমন্বয়

সাধন করে একটা বাঙালী জাতীয়তা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন ; তবু বলতে হবে যে এই সহজসংঘকে সংযত না করে মহীপাল জাতীয় চরিত্রের নিরতিশয় অকল্যাণ সাধন করে গিয়েছেন। কথাটা আরো স্পষ্ট হবে যদি পাশাপাশি এই কালেরই চরিত্র-সৃষ্টি লাউসেনের কথাটা স্মরণ করা যায়। এঁর কাহিনী নানারূপে কীর্তিত হয়েছে পরবর্তী যুগের নানা মঙ্গলকাব্যে। ব্যভিচারে তাঁকে লিপ্ত করতে চেষ্টা হয়েছিল বহু ; কিন্তু দৃঢ়তায় তিনি অটল থেকে বলেছেন ঃ

> "ধর্মের সেবক হৈয়্যা সুখ নাহি চাই
>
> ... ...
>
> বৈশ্যবাসের কুলে নাই আমিস্য ভোজন
> ধর্ম বিনা অধর্ম করি না কখন।"
>
> —রূপরামের ধর্মমঙ্গল

একাদশ শতকে বাঙালী সমাজ শুধু কৃষিনির্ভরই ছিল না, বাণিজ্য-নির্ভরও ছিল। পালদের আমলে, কর অপরিমিত ছিল বলে মনে হয় না। কর দিতে হত চার রকমে ঃ ভাগ, অর্থাৎ ফসলের ষষ্ঠাংশ ; ভোগ, অর্থাৎ সাময়িক ফলসম্ভার ; জ্বালানী কাঠ ও ফুল ; কর সাময়িক, আকস্মিক ও বাণিজ্য-ভিত্তিক। ভাগের বদলে হিরণ্য বা নগদও দেওয়া চলত। অর্থদণ্ডের উল্লেখও পাওয়া যায়।

তাম্রলিপ্তি লুপ্ত হল অষ্টম শতকে ; ক্রমে তার স্থলে দেখা দিল সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ, বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর হিসাবে। কৃষিতে যে লাভ হত তার চেয়ে বহুগুণ লাভ হত বহির্বাণিজ্যে। বৌদ্ধ বণিকেরা বা বেনেরাই এ কাজে দক্ষ ছিল। গুপ্তযুগে গৌড়ে অর্থাৎ পৌণ্ড্রবর্ধনে ও রাঢ়ে ব্রাহ্মণের সংখ্যা কিছু বেড়েছিল ; তারা শুধু অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিয়েই ব্যস্ত থাকত না, কেউ কেউ করত কৃষিকার্য, কেউ রাজকার্য। অর্থের সামর্থ্যে বেনেরা ছিল পরম শক্তিশালী ; সমাজের প্রায় চূড়ামণি বললেও চলে। বৌদ্ধবিহারগুলি গৃহস্থ-বৌদ্ধ ধরে ধরে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী করে নেবার চেষ্টায় সজাগ থাকত,

কারণ ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী তাদের নিজেদের সম্পত্তি নিয়ে বিহারে যোগ দিতে পারত ; সন্ন্যাসী হিন্দুর মত তাদের বিত্ত-ঐশ্বর্য ছেড়ে সংসার ত্যাগ করতে হত না।

বহির্বাণিজ্যের জন্য নানারূপ সমুদ্রগামী নৌকা তৈরি হত, তার কিছু চিহ্ন রয়েছে জাভার বরবুদুর মন্দিরে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায় তাদের বর্ণনা দিচ্ছি ঃ

"নৌকাগুলির আকার একরূপ নয়। কতকগুলি হালের দিকে খুব উঁচা, অপর দিকে তত উঁচা নয়। এগুলি প্রায় গোল। ইহাদের খোল ফাঁদাল ও গভীর—অনেক মাল ধরে—প্রায় আগাগোড়া ছইয়ে ঢাকা। একখানি ছইয়ের নীচে অনেকগুলি কামরা।

"আর এক সাজ্যায় নৌকাগুলি লম্বা ছাঁদের। তাহাতেও ঐরূপ ছই, ঐরূপ অনেকগুলি কামরা। প্রত্যেক নৌকার দুইধারে পিতলের দুইটা করিয়া বড় বড় চোখ। মাঝখানে বড় বড় বেণের নাম লিখা। এক এক নৌকায় ৩০।৪০ খানি করিয়া দাঁড়, প্রকাণ্ড মাস্তুল ও অনেকগুলি করিয়া পাল।"

এসব নৌকা তৈরি করত বাঙলার সূত্রধর, বাঙলারই সেগুন, গাম্ভারী, তমাল, পিয়াল, কাঁঠাল, মনপবন প্রভৃতি কাঠে। কারো কারো মতে মনপবনও বোধ হয় একরকম কাঠ, হয়ত তা বিরল হতে হতে এখন লুপ্ত হয়েছে। তক্তা জোড়া দিত বাঙলায় তৈরী লোহার পেরেক দিয়ে। গলুই ও হাল পৃথক্ পৃথক্ তৈরী করে পরে জুড়ে দিত ; সামনের গলুইটিকে সাধারণত গড়া হত একটি প্রকাণ্ড ময়ূরের আকারে।

এদের নামের বাহারই বা কত! সবই কাব্যঘেঁষা—সাগরফেনা, হংসরব, রাজবল্লভ।

দক্ষিণাপথের চোল রাজ্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল বাঙলা দেশ আক্রমণ করেন একাদশ শতকে। তাঁরই নির্দেশে উৎকীর্ণ তিরুমলয় পাহাড়ের শিলালিপি মেনে নিলে, বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্র বা

গোবিন্দচন্দ্রকে একাদশ শতকের লোক বলে ধরা যায়, আর 'ময়নামতীর গান'ও মূলত এই শতকেরই কথা বলে বলা চলে— যদিও তার মধ্যে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ এসে পরে জুড়ে বসেছে। এই বহির্বাণিজ্যের ফলে বাঙলার শুধু বণিকের নয়, সাধারণ লোকেরও আর্থিক সচ্ছলতার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে 'ময়নামতীর গানে'।

"সেই জে রাজা রাইয়ত প্রজা দুস্কু নাহি পায়।
কারও মারুলি* দিয়া কেহ নাহি যায়॥
কারও পুস্কনির জল কেহ না খায়
আথাইলে ধনকড়ি পাথাইলে শুকায়॥**
সোনার ভ্যাটা দিয়া রাইয়তের ছাওয়ালে খ্যালায়॥"

দেশ থেকে কোন্ কোন্ বেসাত নিয়ে গিয়ে বণিকেরা সর্বসাধারণের এত সচ্ছলতার ব্যবস্থা করতেন? ইতিহাসের পাতায় এর কোনো স্পষ্ট সাক্ষ্য নেই, তবে মনে হয়, পণ্যের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল কাপড়; মসলিন, বারাণসী, রেশম, তসর, গরদ, এণ্ডী, পাট, থলে, আর হয়ত গাঁজা, সিদ্ধি, কাঠের ও কাচের খেলনা।†

বহির্বাণিজ্যে এই জন্মবীজ-জাত দ্রাবিড়ী অনুপ্রেরণা ক্রমে বাঙালীর চরিত্রে ক্ষয় পেয়ে গেল; তা হ'ল নানা কারণে। হয়ত পরবর্তী শতকে দৈবের প্রতি বেশী নির্ভরশীল হয়ে বাঙালী কর্মের মাহাত্ম্য গেল ভুলে, হয়ত মনুর সমুদ্রযাত্রার নিষেধ-বাধা পরবর্তী কালে প্রবলতর হল, হয়ত দেশে যথাযোগ্য বেসাত সংগ্রহ হল কষ্টসাধ্য, হয়ত সমুদ্রপারের বাজারে নবাগত আরবীয় বণিক্‌দের সঙ্গে পাল্লায় বাঙালী হেরে যেতে লাগল। যে কারণে, বা যে সমষ্টিগত কারণেই হোক, বাঙালীর বহির্বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল।

---

* মারুল=গ্রাম্যপথ, আইল।

** অনায়াসলব্ধ অর্থ যেখানে সেখানে ফেলে রাখে।

† বণিকের স্ত্রী যদি তার বিদেশযাত্রার কালে অন্তঃসত্ত্বা থাকত তবে তাকে 'জয়পত্র' দিয়ে যেতে হত যাতে তার সামাজিক কোন দুর্নাম না ঘটে।

এই অবলুপ্তির সূচনা হয়েছিল যে এই শতকেই, বা তারও কিছু আগে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংকলিত 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র গল্পে। 'শঙ্খমালা'য় দেখা যায়, সওদাগরকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে:

"যাগ কর না, যজ্ঞ কর না, গাব দেও না, গব্য দেও না, জলের তলে চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর সাপ, কুমীর হইয়া গেল।"

'ঠাকুরদাদার ঝুলি' ও 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্পগুলির রচনা হয়েছিল দ্বাদশ শতকের পূর্বে। এরা লিখিত ভাষার জালে ধরা পড়েছে মাত্র বিংশ শতকের শুরুতে। এর আগে এরা শ্রুতির স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছিল। বাঙালীর এই অপূর্ব জাতীয় রূপকথা ও গীতকথা কথ্যভাষায় শতকে শতকে পরিবর্তিত হয়ে বাঙালার শিশুদের মনের খোরাক জুগিয়েছে, বয়স্কদের আনন্দ দান করেছে। বাঙলী জাতির সঙ্গে সঙ্গে শতকে শতকে এরা ভাষান্তরে পরিবর্তিত হয়েছে লোকের মুখে মুখে, পৌরাণিক ও বৌদ্ধজাতকের গল্পের মত এগুলি কোনো বিশিষ্ট ধর্মমতের দাবি বা সাক্ষ্য বহন করে আসে নি, এরা জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বজনীন; তাই, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সর্ব-বাঙালীরই প্রিয়। কথায় ও কাহিনীতে এরা জাতিহীন।

রূপকথায় ও গীতিকথায় প্রভেদ এই যে প্রথমটিতে রয়েছে ছড়া, কিন্তু গান নেই আর গীতিকথার মজ্জা গান। গীতিকথায় অতি প্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ থাকে বটে, তবে রূপকথার মত রাক্ষস-খোক্কসের কথা বিরল। শতকে শতকে গল্পগুলির কথ্যভাষার রূপ পরিবর্তিত হয়েছে বলেই এরা রয়েছে সাবলীল, স্রোতোবহা নদীর মতই প্রাণবন্ত; নইলে, 'চর্যাপদের' মত এগুলিও 'সান্ধ্য' বা অস্পষ্ট ভাষারূপের সাক্ষ্য হয়েই পুঁথিগত হয়ে থাকত। এগুলির মধ্যে প্রাণ-প্রাচুর্যের একটু নমুনা উদ্ধৃত করছি:

"ঢা কড়্ কড়্, ঢা কড়্ কড়্, ঢাকে বলে ভাই রে;
তবে গানা গাইতে পারি, আকাশ ছাউনি পাই রে।

তা কুড়্ কুড়্, তা কুড়্ কুড়্ যত ঢোলে কয়
ঢুলীর নাচনে ভাই সাতটা পুকুর হয়।
শানাই বাঁশরী সিঙ্গা ফেটে হল চীর
হারে, অষ্টরাজ্যের লোক হল রে বধীর!"

এই স্রোতোবহা নদীর স্রোতে দশম একাদশ শতকের বাঙলার সমাজ-কথাও কিছু কিছু ভেসে এসেছে। ভেসে এসেছে রাজকন্যার 'এলোকেশ চুল', 'মেঘডম্বর শাড়ী', আর 'চন্দনরাঙা চাদর' ও 'মালা-চন্দন'। এ সব ছিল উচ্চ পর্যায়ের বেশবাস।

তখনো বিবাহের পরে মেয়েরা সিঁদুর পরত, ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করত, শুভকার্যে শাঁখে ফুঁ ও হুলুধ্বনি দিত, বিবাহে বরণডালা সাজাত, ডালে-চালে খিচুড়ি রাঁধত, জাদুমন্ত্রে মানুষ ছাগল, ভেড়া হয় বলে বিশ্বাস করত, আর বিশ্বাস করত ঝাড়্-ফুঁক, তুকতাকে।

গল্পের আসর ছেড়ে এবার 'ময়নামতীর' গানে একাদশ শতকের বাঙালীর সামাজিক রীতিনীতির চিত্তের সন্ধান করা যাক।

ব্রাহ্মণের দরবারী বেশভূষা কি ছিল? ধুতি শালকিরাণি, চটক ও মটক, কোমরবন্ধ্, চল্লিশ পাগড়ি (চল্লিশ বার পাক দিয়ে যা তৈরি হয়েছে), এক হস্তে অঙ্গদ, অপর হস্তে বলয়, কণ্ঠে স্বর্ণ-মালা, জোড়া জোড়া পৈতা গলায়, কক্ষে একরাশি পুঁথি—যেন হিন্দুস্তানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

একাদশ শতকের পুরুষের অলঙ্কার ও প্রসাধন-প্রীতির কথার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য অল্‌বেরুনি। তিনি লিখেছেন, পুরুষেরাও স্ত্রী-লোকের মত প্রসাধন-দ্রব্য ব্যবহার করে। অলঙ্কারও পরে; কানে মাকড়ি, হাতে বালা, হাতের আঙুলে আর পায়ের বুড়ো আঙুলে নানারূপ আংটি।

এর পাশেই হির নটির বেশভূষার বাহার তুলে ধরছি:

নাসের কাঁকই, বহুপ্রকারের খোঁপা (নিচু করে চুল বাঁধলে

'খোপ্যক', উঁচু করে বাঁধলে 'ঘোড়াচূড়' বা ঘোড়াচুলা), নিয়র-মেলানি শাটী* (মসলিন), নাকের নত (নথ), 'হেট কানে পেন্দে ঢেরি, উপর কানে চাকি, শতেশ্বরি হার, পাএ বাঁকামল, সোনার কাচলি (কাঁচুলি), পানের খিলি হাতে।

তারপর ভদ্র পরিবারের মেয়েদের বেশবাশ : নিচের হাতে শাঁখা, উপরের হাতে 'বাহ্‌খড়' গলায় সাতেসরী বা দেবচ্ছন্দ হার, মাথায় হংসপদিকা, কানে সোনার তারঙ্গ বা কচি তালপাতার অবতংস তালীপত্র (কুণ্ডল হিসাবে), পরনে সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র, মলমল বা পাটের কাপড় ; 'মেঘ-উড়ুম্বর', 'গঙ্গাসাগর', 'লক্ষ্মীবিলাস', 'দ্বার-বাসিনী', 'সিলহটি', 'গাঙ্গেরী'—কত নাম ! পট্ট ও নেতবস্ত্র (সিল্ক)। পাটের শাড়ির প্রচলন এখনো বাঙলায় রয়েছে বটে, তবে 'নেতে'র অধোগতি হতে হতে এখন তা পরিণত হয়েছে ঘরপোঁছার 'ন্যাতা'য়, যদিও উড়িষ্যায় তার গৌরব এখনো অক্ষুণ্ণ।

এ সব কাপড় ছিল বাঙলার তৈরী ; 'মলমলে'র সুতা কাটা হত প্রতিটি গৃহে, বাঙলার তৈরী কাপড়ের আদর ছিল সারা উত্তর ভারতবর্ষ জুড়ে ; এতে বাঙলার ঘরে ঘরে ছিল অর্থের সচ্ছলতা।

একাদশ শতকের বাঙালীর বেশভূষার সঙ্গে বিংশ শতকের বাঙালীর বেশভূষার কোনও মৌলিক প্রভেদ নেই। কখনো কখনো নূতন নূতন রাজনৈতিক পটভূমিকায় উচ্চস্তরের মুষ্টিমেয় লোক নূতন নূতন পরিধান গ্রহণ করেছে বটে—যেমন সার্ট, স্কার্ট, আচকান, সালোয়ার, কিন্তু জনসাধারণের পোশাক, ধুতি ও শাড়ি, রয়েছে অবিকৃত। শুধু বাঙলার কেন, সারা ভারতবর্ষেই তা জাতীয় পোশাক।

পান খেত সবাই, শুধু বাঙলায় নয় ভারতবর্ষের সর্বত্র। তাম্বুল

---

*নিয়র-মেলানি শাড়ি এত সূক্ষ্ম যে রাতে তা দেখা যেত না ; শাড়ি পরলেও নটিকে বিবসনা বোধ হত—'শাড়ি আর নটি গেইল মিলিয়া।'

দান ও গ্রহণ ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গবিশেষ। কবে যে এ রীতিটির সৃষ্টি হয়েছিল তা বলা যেমন দুষ্কর, তেমনি তাম্বুল-লতার উদ্ভবের কথাও অজ্ঞাত। অথচ, এর প্রতিপত্তির কথা পাওয়া যায় সর্ব শতকেই।

ধনীদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরত তাদের তাম্বুলবাহী সেবক। আদর-আপ্যায়নে পানের স্থান সকলের উপরে; 'তামাক' এসেছে এর অনেক পরে—মাত্র ষোড়শ শতকে।

সধবাদের তো কথাই নেই, বিধবারাও পান খেতেন। 'ময়নামতীর গানে'র ময়না যে পান খেতেন—তাতে থাকত 'লং (লবঙ্গ), জায়ফল, এলাঞ্চি, দালচিনি (দারুচিনি), গুআমুরি, ধনিয়া, করপুর ও জৈষ্ঠমধু' (যষ্টিমধু)।

সেকালেও বিবাহের কথা পাকা হলে 'দরগুআ' করা হত অর্থাৎ 'গুয়াপান' বিলানো হত। সুপারি কথাটাও আধুনিক নয়; চতুর্দশ শতকে এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, 'সিপরি' নামে।

ছবি আঁকতো সবাই, হয়ত গুপ্তযুগে, চতুর্থ, পঞ্চম শতকে চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার ব্যাপক প্রসারের ফলে। গরীবেরা অন্তত ঘরের দেওয়ালে দুটো ময়ূরও এঁকে রাখত। বেণেদের বাড়ীর দুপাশে আঁকা থাকত দুটো টাকার থলি, তার সঙ্গে একপাশে একটা শাঁখ, অন্যদিকে একটা পদ্ম।

শুধু তাই নয়, নাচতেও জানতো সবাই—ছেলে ও মেয়ে। মেয়েরা যে এতে বিশেষ পারদর্শী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। নটীদের তো কথাই নেই, সাধারণ ভদ্র পরিবারের মেয়েরাও নাচত—নাচত রাজবাড়ির বধূও। ময়না রাজবধূ—'ময়না গর খ্যামটা আড়খ্যামটা নাচে হাততালি দিয়া'।

একাদশ শতকেও বাঙালীর সমাজ দানা বাঁধেনি। উচ্চপর্যায়ে বাদ সেধেছে 'গুভাজু' বা সদ্ধর্মী বা বৌদ্ধ ও 'দেবভাজু' বা হিন্দুর লড়াই, আর নিম্নপর্যায়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বাস করেছে বিপুলসংখ্যক

বাঙালী—তাঁতি, ডোম, বাগদী, হাড়ী, শবর ইত্যাদি। উচ্চপর্যায়ের সঙ্গে নিম্নপর্যায়ের কোনো সম্পর্কই ছিল না—তারা থাকত শহর ও গ্রামের বাইরে। তারা তথাকথিত অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য।

এই সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতার স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন আরব দেশের মনীষী অল্‌বেরুনি। তিনি ভারতবর্ষে এসে বহুদিন বসবাস করেছিলেন একাদশ শতকেরই মধ্যভাগে। বাঙলা দেশ সম্পর্কে তাঁর লেখা থেকে কিছুটা অনুবাদ করে দিচ্ছি ঃ

"অন্ত্যজ গোষ্ঠীর এক-একটি জাতি এক-একরকমে সমাজসেবা করে ; সেবাই এদের পেশা। এদের বৃত্তি আট প্রকারের ঃ রজক, চর্মকার, ঐন্দ্রজালিক, বেত ও বাঁশের তৈরী জিনিসের কারিগর, নৌ-চালক, মৎস্যজীবী, ব্যাধ অর্থাৎ মৃগয়াজীবী ও তাঁতি। রজক, চর্মকার ও তাঁতির সঙ্গে অন্য পাঁচটির কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক নেই ; নিজ নিজ দলের মধ্যেই এদের বিবাহাদি চলে। অন্য পাঁচটি দলের মধ্যে বিবাহাদি চলে।

"হাড়ী, ডোম (ডোম্ব) ও চণ্ডাল শ্রেণীর মানুষ কোনো বিশিষ্ট বৃত্তিভোগী বলে গণ্য হয় না ; তারা নানারূপ কাজকর্ম করে। যে যে বৃত্তি অবলম্বন করে সে অনুসারেই তাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। মোটের উপর এদের সংকরশ্রেণী বলেই ধরা হয় ; এরা উচ্চশ্রেণীর বর্ণ-সংকর বিবাহজাত পুত্রকন্যারূপে অধঃপতিত। এদের মধ্যে হাড়ীকে একটু উচ্চপর্যায়ে ধরা হয়—এদের পরিচ্ছন্নতার জন্য ; ডোমের স্থান এরই পরে ; এরা বাঁশি বাজায় ও গান করে।"

ডোমের বা ডোম্বের বৃত্তি সম্পর্কে এঁর মন্তব্য প্রামাণিক নয় ; কারণ সমসাময়িক অন্য সব পুঁথিতেই ডোমকে আঁকা হয়েছে বাঙালীর দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার সেনা হিসাবে। 'ডোমকে নেই যমের ভয়', 'ডোমের পুত যমের দূত' বাঙলার প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে আর

"আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে
ডাল, মৃগল ঘাঘর বাজে,

বাজতে বাজতে পড়ল সাড়া
সাড়া গেল বামনপাড়া।"

অলঙ্কৃত করে রয়েছে বাঙলার শিশুদের ছড়ার বই। বাগদীরা ছিল পদাতিক; এরাও দুর্ধর্ষ ও বিশালকায়, মাথায় বাবরিকাটা চুল, হাতে বড় বাঁশের লাঠি, যার নাম ছিল 'রায় বাঁশ'। এরাই হয়ত 'রায়বেঁশে নাচে'র আদি কর্তা।

তখনো বাঙালী সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়নি— তা হয়েছে অনেক পরে। একদিকে মুষ্টিমেয় মহাযানী বা শূন্যবাদী বৌদ্ধ সওদাগর ও অভিজাত সম্প্রদায়। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে অল্পসংখ্যক হিন্দু ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতি, নানা-বৃত্তিজীবী কিন্তু বিত্তশালী। এরা মূলত পৌরাণিক ধর্মী—বৈদিক ধর্মী নয়; হয়ত বেশির ভাগই বিষ্ণু-উপাসক, কারণ দেখা যায় প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পালরাজাদের মন্ত্রীরা ছিলেন বিষ্ণু-উপাসক। তাই বলে যে শাক্ত একেবারেই ছিল না তা নয়। তার প্রমাণ রয়েছে শ্রীধর দাস-সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে। গ্রন্থটি ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে সংস্কৃতে রচিত বিভিন্ন কবির নির্বাচিত কবিতাংশের একটি প্রখ্যাত সংকলন। এ গ্রন্থটি সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন সংকলনের মধ্যে গণ্য।

গ্রন্থটিতে শতানন্দ নামক কবির একটি কালীধ্যান রয়েছে। কালী মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডিকারই রুদ্র রূপ। পুরাণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে গণ্য বায়ুপুরাণ; তার পরেই স্থান মার্কণ্ডেয় পুরাণের। এর কাল বলা দুষ্কর, তবে অনুমান চতুর্থ শতক। কালী বাঙালীর প্রিয়তম দেবতা। যে রূপে তিনি এখন পূজিত হন তা অবশ্য এসেছে অনেক পরে এবং কেন এ দেবতা বাঙালীর জীবন-সূত্রে একান্তভাবে গ্রথিত হয়েছে তারও মূল রয়েছে অন্যত্র। সেকথা যথাস্থানে বলা যাবে।

শতানন্দ ছিলেন নবম শতকের প্রথমার্ধে পালরাজাদের রাজকবি।

আর্যা ছন্দে লেখা তাঁর কালীবন্দনার শ্লোকাংশটি এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

"জয়তি তব কৃপিতেক্ষণমশ্লতা দশনপেষমসুরাস্থি।
কল্লশিখিস্ফুটদত্রিক্কাণকরালঃ কউৎকার॥"

[ক্ষণ=রাত্রি, পেষ=পিষ্ট করা, চর্বিত করা, কল্ল=মাদক দ্রব্য]

ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা পণ্ডিতশ্রেণী তাঁরা সবাই স্মার্ত; শ্রুতি নিয়ে তাঁদের কারবার বেশি ছিল না। তাঁদের মতে বেণেরা শূদ্র --গৃহ্যসূত্রোক্ত সংস্কার হলেই তারা চাতুর্বণ্য সমাজে স্থান পাবে। বৌদ্ধেরাও মনুসংহিতার অনুশাসন মেনে চলত, ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে দশকর্ম করাত, আবার বুদ্ধের মন্দিরেও ধূপধুনা দিত।

এই উচ্চতর সমাজের বাইরে বাঙালীর যে বৃহত্তম অংশ ছিল তার সঙ্গে কারো যোগাযোগই ছিল না ; না বৌদ্ধের, না পৌরাণিক-ধর্মীর। বস্তুত তাদের ধর্ম ছিল বিভিন্ন, সমাজ ছিল মূলত গোষ্ঠীসীমাবদ্ধ।

ধর্মে ছিল তারা হয় বৌদ্ধ সহজপন্থী অর্থাৎ লুইসিদ্ধার চেলা, অথবা নাথপন্থী ; সহজপন্থী ও নাথপন্থীর মূলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে ও সাধনপন্থায় বিশেষ পার্থক্য ছিল না।

নাথপন্থীরা পূর্বভারতীয় তান্ত্রিক পর্যায়ের এক বৃহৎ শৈব সম্প্রদায়-ভুক্ত গোষ্ঠী। এ পন্থার জন্ম হয়েছে নবম বা দশম শতকে—সম্ভবত চন্দ্রদ্বীপে অর্থাৎ বাঙলার অধুনাতন বাখরগঞ্জ জেলায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ভেলকি বা নিম্নস্তরের যাদুবিদ্যায় অশেষ পারদর্শিতা অর্জনই নাথপন্থীদের পরম লক্ষ্য। যাঁরা এ লক্ষ্যে পৌঁছে যেতেন তাঁদের বলা হত 'নাথ'। এঁরা সবাই নিম্নস্তরের লোক, তাই এঁদের রচিত তান্ত্রিক গ্রন্থের সংস্কৃত ভাষা অশুদ্ধ ও দুর্বোধ্য। এ মন্তব্য হয়ত আংশিক সত্য।

ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা, হাঁড়িপা বা হাঁড়িপাদও তাই। হাঁড়িপা বাঙালী, গোরক্ষনাথ হয়ত পঞ্জাবী। প্রবাদ, গোরক্ষনাথ

কালীঘাটের কালী প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রবাদের অবশ্য কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। মৎস্যেন্দ্রনাথ নাথসিদ্ধদের অন্যতম শীর্ষমণি, কিন্তু তাঁর পরিচয় নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক রয়েছে। কিছু যা নিয়ে মতদ্বৈধ নেই তা এই, যে এই নাথসিদ্ধটিই মহাযান বৌদ্ধপন্থার সঙ্গে নাথপন্থার মিলন ঘটিয়েছিলেন। তাই নাথপন্থা বৌদ্ধমতেরই অঙ্গ হয়ে গিয়েছে।

নাথপন্থীদের ভেলকিবাজির মূলে হয়ত রয়েছে অথর্ববেদের মন্ত্র, যা পরবর্তী কালে তান্ত্রিক সাধনায় পরিবর্তিত হয়েছে। অথর্ববেদ সংকলিত হয়েছে ঋগ্বেদের পরে, কিন্তু তা বলে মনে করার কারণ নেই যে অথর্ববেদে গ্রথিত অনেকগুলি মন্ত্রই ঋগ্বেদ রচনার পূর্বেই রচিত হয়নি। কারণ মানুষ আদিম কাল থেকেই মরণাপন্ন রোগে, শত্রু-দমনে, পুত্রলাভের আশায়, সর্পভয় দূর করতে এবং অন্যান্য অনুরূপ কারণে মন্ত্র-তন্ত্র, তুকতাকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অথর্ববেদের অনেকাংশই এরূপ মন্ত্র-তন্ত্রে ভরা। ভাষ্যকার সায়ণ বলেছেন যে অথর্ববেদ রাজাদের পক্ষে ছিল অপরিহার্য ; রাজপুরোহিতকে অথর্ব-বেদে দখল রাখতে হত। সর্বসাধারণের কাছেও, বিশেষ করে গৃহস্থের কাছে, এ সব মন্ত্র বা প্রক্রিয়ার মূল্য ছিল সমধিক, তাই এর অনেকাংশ গৃহ্যসূত্রেও স্থান পেয়েছে। মানুষের, বিশেষ করে হিন্দুর মন থেকে এ সংস্কার কখনো যায় নি। তাই তুকতাকে অবিশ্বাস তার কখনো ঘটে নি, ঘটবেও না। বলা বাহুল্য, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি এ সব তুকতাকেরই রকমফের মাত্র ; তাবিজ, কবচ, ঝাড়ফুঁক, সাপের মন্ত্র প্রভৃতিরই সমগোত্রীয়। কথাটা রূঢ় হলেও সত্য।

কারো কারো মতে, বুদ্ধের জ্ঞাতসারেই তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে তন্ত্র-মন্ত্রের সাধনাও করতেন। তাঁদের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার কথা 'বিনয় পিটকে'র কোনো কোনো গল্পে রয়েছে। বৌদ্ধসঙ্ঘেই তান্ত্রিক সাধনার সূচনা হয়েছে এবং প্রথম বৌদ্ধতন্ত্র লেখা হয়েছে 'গুহ্যসমাজে'—যার জন্মকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতক। এরূ

দ্বিতীয় ধাপ দেখা দিয়েছে "সংগীতি"র আকারে, তা-ও মহাযান পন্থার পরবর্তী কালে ; এবং এই পন্থার সহজ ছিদ্রপথে সে সব বৌদ্ধধর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশও করেছে।

এর পরে এসেছে হিন্দুর পৌরাণিক পূজা—জনসাধারণের পরম চিত্তগ্রাহী হয়ে। ফলে, পৌরাণিক ধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মহাযানকে বিভিন্ন তান্ত্রিক দেবদেবীর সন্ধানে তৎপর হতে হয়েছে। ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার ফলে পৌরাণিক ধর্মেও ঢুকেছে তান্ত্রিক সাধনা, যা অনেক ক্ষেত্রেই বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনার রূপান্তর মাত্র।

সমগ্র পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে বাঙলায় ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে, বৌদ্ধের মহাযান পন্থায় ও হিন্দুর পৌরাণিক ধর্মে লেগেছে বিষম প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব, যার ফলে কালক্রমে উভয় ধর্মকেই অতিক্রম করে সর্বত্র তান্ত্রিকবাদই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাই বাঙালীর পৌরাণিক ধর্মেও বারো আনি তান্ত্রিক খাদ মেশানো। এই তান্ত্রিকতার পটভূমিকায়ই বাঙালীর প্রকৃত পরিচয় এ কথা বিস্মৃত হলে বাঙালীর জাতীয়-মানস স্পষ্ট করে বোঝা যাবে না। 'ষোড়শমাতৃকা' পূজা তান্ত্রিক অথচ, এ পূজাটি প্রথমে না করে বৈদিক কর্ম অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি বাঙালী সমাজে বিধিবহির্ভূত। শুধু একটি মাত্র দৃষ্টান্তের কথাই এখানে উল্লেখ করা গেল। যে প্রতিযোগিতার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে বাঙলার সর্বত্র তা প্রবল হয়ে উঠেছিল একাদশ শতক পর্যন্ত।

এবার আবার বাঙলার একাদশ শতকের সমাজ-কথায় ফিরে আসা যাক।

সহজপন্থার সিঁড়ি বেয়ে এল ব্যভিচারের স্রোত প্রধানত নিম্নশ্রেণীর বাঙালীর সমাজে, আর নাথপন্থার তুকতাক এল অগ্নি-পরীক্ষা, জলপরীক্ষা, সর্পপরীক্ষা, জলপড়া, চালপড়া, নলচালা, বাটিচালা প্রভৃতি রূপে।

এর ফলেই উদ্ভব হল 'শাকুন' শাস্ত্রের অর্থাৎ সুলক্ষণ-দুর্লক্ষণ

সংহিতার। বাঙালীর মনে তা স্থায়ী আসন গেড়ে বসল। এই 'শাকুন-শাস্ত্র'ই বাঙালীর মনে হাঁচি-টিক্‌টিকির এক অলজ্ঘ্য বাধার প্রাচীর গড়ে তুলল। অনেক ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পেল প্রায় প্রবাদ-বাক্যরূপে, যেমন 'ডাকে'র বচনে। প্রবাদের পূর্বে 'প্রায়' বিশেষণটি দেওয়া হল এজন্য যে প্রবাদের প্রাণ শুধু শব্দের স্বল্পতা ও শব্দার্থের আধিক্য নয়, তার সঙ্গে জুড়ে থাকে তার উপযোগিতা। এর উপযোগিতা এই যে প্রবাদ-বাক্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে তার অভিপ্রায় ও সংকেত যা প্রবাদটি শোনামাত্র মর্মে প্রবেশ করে।

ময়নামতীর গানে 'ডাকের বচনে'র হাঁচি-টিকটিকির কথা রয়েছে।

"হাঁচি জিঠি যে জন বারে
বিঘ্নের সময় সে জন তরে।"
[জিঠি অর্থাৎ জ্যেষ্ঠী=টিকটিকি]

ডাক ও খনার বচনের উদ্ভব একাদশ শতকের পূর্বে হয়েছে বলে ধরা চলে। দু'য়ে প্রভেদ আছে। ডাকের বচনে রয়েছে সামাজিক বার্তা, মানুষের চরিত্র প্রভৃতির কথা, আর খনার বচন মূলত চাষবাস, জলহাওয়া, শুভক্ষণ বা তিথি গণনা নিয়ে। বলা বাহুল্য, এদের আদিম ভাষা লোকের মুখে মুখে বদলে গেছে, আর ডালে ও চালে মিশে খিচুড়ির সৃষ্টিও হয়েছে তাপে নয়, কালধর্মে। দু'য়ের মধ্যে কোনো ভাষাগত আদিম পার্থক্য ছিল কি না এখন তা আর বোঝার উপায় নেই। তবে কৃষিভিত্তিক ও তুকতাক-ভক্ত বাঙালী সমাজে যে দুটিরই বহুল প্রচাব ও প্রসার ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তী কালে কৃষিকর্ম যত অনাদর পেয়েছে খনার বচন তত ক্ষীণ হয়ে এসেছে, কিন্তু বাঙালীর তুকতাক ভক্তি 'ডাক'কে রেখেছে জীয়ন্ত। বাঙালী সমাজে এখনো কে না জানে

"অজা জালি, পাকা মেষ, দই-এর আগা, ঘোলের শেষ,
শাকের ছা, মাছের মা, ডাক বলে, বেছে খা॥"
[অজা জালি=কচি পাঁঠা]

অথবা চার্বাকপন্থীর—

"দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ, ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ
বলে ডাক, এই সংসার, আপনে মইলে কিসের আর ?"

খিচুড়ির নমুনা—

"ভরা[১] হতে শূন্য ভাল, যদি ভরতে যায়
আগে হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়।
মরা[২] হতে তাজা ভাল যদি মরতে[৩] যায়
বাঁয়ে হতে ডানে ভাল যদি ফিরে চায়[৪]
বাঁধা[৫] হতে খোলা ভাল (যদি) মাথা তুলে চায়
হাসা হতে কাঁদা ভাল যদি কাঁদে বায়।"

এগুলি সুলক্ষণ—যাত্রায়।

নিছক খনার বচনে—

"খাটে খাটায় লাভের গাঁতি, তার অর্ধেক মাথায় ছাতি
ঘরে বসে পুছে বাত, তার কপালে হাভাত।"

"যদি বর্ষে আগনে রাজা যায় মাগনে"
"যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজা পুণ্য দেশ"
[আগনে = অগ্রহায়ণে]

ডাক ও খনার বচনে নানা শতকের খাদ মিশেছে। তা থেকে একাদশের চিত্র বাছাই করা দুঃসাধ্য। তবে মনে হয়, তখন পিঁড়িতে বসে কলাপাতে ভাত খাওয়াই ছিল রীতি ; আর সুলক্ষণা কন্যা দেখে বধূ বাছাই করা হত। কারণ, 'পিঙ্গল আঁখি', 'ডাগর ওষ্ঠ, ও 'পেট পিঠ উচ্চ ললাট'-ওয়ালা মেয়েকে ঘরে না আনতে বারবার মানা করে দেওয়া হয়েছে।

ফসলের মধ্যে আখ, আম, কাঁঠাল, কলা, নারকেল, ধনে, পান ও সুপারি যে প্রধান ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

---

[১]ভরা কলসী [২]মৃতদেহ [৩]গঙ্গাযাত্রী [৪]কে ?—শেয়াল [৫]কি—গরু

অল্‌বেরুনি একাদশ শতকের ভারতবর্ষে হিন্দুদের যে ছয়টি উৎসব-পালন দেখেছিলেন তার একটার ফিরিস্তি রেখে গেছেন। তার মধ্যে হয়ত হু'তিনটি বাঙলায় প্রচলিত ছিল; যেমন, চৈত্র পূর্ণিমাতে বসন্তোৎসব, কার্তিকে দীপাবলী, ফাল্গুনে দোল ও শিবরাত্রি।

তিনি গাজনের কথা লিখেন নি, কিন্তু গাজন ছিল নিম্নপর্যায়ের বাঙালীর, বিশেষ করে লুইসিদ্ধার শিষ্যদের প্রধান উৎসব। ব্রাহ্মণেরা অবশ্য গাজন দেখাও দোষ বলে মনে করত। গাজনের মিছিলে থাকত অনেক কিছু: বাজন্দার, দেবদেবীর সঙ্, লাঠিয়াল বাগদী, ডোম ঘোড়সওয়ার, গাজনের মূল সন্ন্যাসী-গুরু আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষ। গুরু ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের দল গাইত কীর্তন খোল-করতাল সহযোগে, নানা রাগ-রাগিণীতে। এসব রাগিণী পটমঞ্জরী, গবড়া, গুঞ্জরী, শীবরী (শবরী), বাংগালা ইত্যাদি। বাঙলার কীর্তন তাই শ্রীচৈতেন্যর কালের দান নয়, তারও বহুপূর্বের।

স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল অবাধ। ময়না 'হাটে গ্যাছেন, বাজারে গ্যাছেন, কিনিয়া খাইছেন খই'। পাঠশালে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা হত, একত্রে—'ঝুলি'র গল্পগুলিতে তার সাক্ষ্য রয়েছে। পড়া হত সংস্কৃত, প্রাকৃত—বাঙলা, মাগধী, শৌরসেনী। উচ্চপর্যায়দের পাঠশালায় ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধভিক্ষু ছিল গুরু, নিম্নপর্যায়দের ক্ষেত্রে ডোম।

নিম্নপর্যায়ে ডোমেরা ছিল উচ্চপর্যায়ের ব্রাহ্মণতুল্য। শূন্যপুরাণের রচয়িতা ও ধম্মঠাকুরের প্রতিষ্ঠাতা রামাই পণ্ডিত ডোম; তিনি নিজেকে বলেছেন 'দ্বিজ রামাই।' বস্তুত কেউ কেউ বলেন, এখনও দক্ষিণ রাঢ়ে ডোম পণ্ডিতদের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদের বৃত্তি শিক্ষকতা।

লেখা হত 'পাকা' তালপাতায়। পাতা পাকানোর রীতি ছিল এরূপ: প্রথমে মাজ-পাতা কেটে ছ-মাস পুকুরে পুঁতে রাখতে হত; তারপর পাতা সেদ্ধ হত দুধে। তারপর শাঁখ দিয়ে ডলে, কাঠি বাদ

দিয়ে সমান করে কেটে নিতে হত। কলম ছিল কঞ্চির, বাখারির বা লোহার। সাধারণত ভুসাকালির ব্যবহার হত আর ব্লটিং বা চোষকের কাজ হত মিহি বালি দিয়ে।

অভিনন্দর 'রামচরিত' পুরোবর্তী হলেও সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' অধিকতর মূল্যবান রচনা। প্রথমখানি অষ্টম শতকের, রামায়ণেরই কথা কিন্তু দ্বিতীয়খানি একাদশ শতকের একখানি উপাদেয় সংস্কৃত শ্লিষ্ট কাব্য। শ্লিষ্ট শব্দের অর্থ—যার দু'রকম অর্থ হয়। রচনায় এ মুনশীয়ানা ছাড়াও এটির আরো অনেক মূল্য রয়েছে—ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিক্ থেকে। তালপাতায় লেখা এ পুথিখানি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে সংগ্রহ করেন। এটি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের বাঙলা অক্ষরে লিখিত। সন্ধ্যাকর নন্দীও বাঙালী, বরেন্দ্রীর শ্রীপৌণ্ড্রবর্ধনপুরের সন্নিকটে কায়স্থকুলে এঁর জন্ম, রাজা রামপালেরই প্রায় সমসাময়িক। একাদশ শতকেরও বাঙলা অক্ষরের নমুনা পাওয়া গেছে জাপানের 'হরিউজি' মন্দিরে অর্থাৎ বিহারে রক্ষিত কয়েকখানি ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে।

এ কাব্যখানির প্রায় প্রতিটি শ্লোকই দ্ব্যর্থবাচক। রামচরিত বলতে আমাদের স্বভাবতই মনে পড়বে রামায়ণের রামচন্দ্রের কথা ; বস্তুত প্রথম অর্থে এটি তা-ই বটে। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে শ্লোকগুলি গৌড়াধিপ রামপাল সম্পর্কেও সমানভাবেই প্রযোজ্য—কোথাও বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি নেই, এমনি এর মুনশীয়ানা। রামপাল অস্তগামী পালসূর্যের প্রায় শেষরশ্মি।

কিন্তু অস্তগামী হলে কি হবে, সে রশ্মিটিরও তেজ ছিল প্রচণ্ড। এঁর অগ্রজ দ্বিতীয় মহীপালের কালে এঁদেরই সামন্তরাজ দিব্বোক বা দিব্য বিদ্রোহী হয়ে গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন। বহু বছর পরে তা উদ্ধার করেন রামপাল, দিব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমকে যুদ্ধে পরাজিত করে। এ কাব্যখানিতে রয়েছে সে যুদ্ধের বর্ণনা, তার মধ্যে ফুটে উঠেছে গৌড়ের সাধারণ চিত্র।

দিব্য ছিল জাতে কৈবর্ত। কৈবর্তেরা ছিল দু'ভাগে বিভক্ত : হালিক ও জালিক। হালিক বলতে সাধারণত চাষজীবী আর জালিক বলতে মৎস্যজীবী বুঝা যায়। এদের কুলগত কর্ম নিয়ে নানা তর্কবিতর্ক রয়েছে। ধর্মে এরা শৈব।

দ্বাদশ শতকের পণ্ডিত হলায়ুধ বলেছেন, "কৈবর্তো ধীবরো দাসো মৎস্যজীবী চ জালিকঃ"। কারো কারো মতে কৈবর্তেরা কর্ণধার, নৌচালক, নাবিক। বালী, জাভা প্রভৃতির ঔপনিবেশিক বাঙালী এই কৈবর্তজাতীয় অর্থাৎ নৌচালক, যুদ্ধব্যবসায়ী।

প্রথমেই যুদ্ধের কথা বলা যাক। রাজারা যুদ্ধ করতেন চতুরঙ্গ সেনা অর্থাৎ পদাতিক ধনুর্ধর, অশ্বারোহী, গজারোহী আর নৌবহর নিয়ে। এ যুদ্ধে অবশ্য নৌবহরের কাজ ছিল না। অস্ত্রের মধ্যে ছিল অসি, কুন্ত অর্থাৎ বর্শা, শঙ্কু অর্থাৎ বড় ছুরি, তীরধনুক প্রভৃতি। পাথর ছুঁড়েও শত্রুদমন করা হত। রণসম্ভার বহন করত মহিষ। বলা বাহুল্য, নিম্নকোটির বাঙালী থেকেই সৈন্যদল গড়া হত ; তাদের মধ্যে যুদ্ধে রত থাকার কালে জাতি-বিভেদের প্রশ্ন উঠত না বলেই মনে হয়।

রামপালের নূতন রাজধানী তৈরী হল রামাবতীতে। রামাবতী মালদহের সন্নিকটে ছিল বলে অনুমিত হয়েছে। রামাবতী 'দেবগণ' ও 'আঢ্যজনের' পুরী—সবৈশ্বর্যজ্ঞাপক। প্রাসাদ কারুকার্যখচিত ইষ্টকালয় ; তার তুলনা হয় না। ইষ্টক বা ইষ্টকা এর বহুপূর্বেই ভারতবর্ষে দৃঢ় গৃহনির্মাণে তার স্থান কায়েম করে বসেছে। প্রখ্যাত নাটক 'মৃচ্ছকটিকে' এর স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে ; এর রচনাকালকে কোনোক্রমেই ষষ্ঠ শতকের পরে বলে নির্ধারণ করা চলে না। পুরনো ইট ছিল আজকের ইটের তুলনায় অনেক ছোট ও সরু। হয়ত প্রাসাদ ছিল বরাহমিহির-বর্ণিত 'বজ্রলেপ' ও ইটের সংযোগে তৈরী ; আজ অবশ্য এর কোনো চিহ্নও নেই। বাঙলায় এক রাজমহল ছাড়া পাথর কোথাও নেই ; আর তা সংগ্রহ করাও ছিল দুঃসাধ্য। তাই

কোথাও পাথর দিয়ে মন্দির, বিহার বা প্রাসাদ তৈরি হয়নি। তারপর, বহুপূর্ব থেকেই বাঙলায় পোড়ামাটির কাজের ছিল আদর।

প্রাসাদের অভ্যন্তরেও ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। হীরক, বৈদুর্য, মুক্তা, মরকতমণি, পদ্মরাগমণি, নীলমণি-খচিত আভরণেরই-বা বাহার কত! কবির অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও, বিত্ত-ঐশ্বর্যের যে একটা বিপুল সমাবেশ ছিল রাজার অঙ্গে, আভরণে ও রাজান্তঃপুরে তা স্পষ্ট; একাদশ শতকের উচ্চকোটি সমাজের মানুষের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য বর্তমান, বিশেষ করে বেণেদের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে। ধবল প্রাসাদ-শ্রেণী, কনক-কলস প্রাসাদ-চূড়ায়। সেকালেও অট্টালিকায় চুন ফেরানো হত—সে চুন নিঃসন্দেহে কলিচুন।

'শ্লক্ষ্ণ' বস্ত্রেরও ছিল ছড়াছড়ি; 'শ্লক্ষ্ণ' বলতে শুধু মনোহর নয়, মোলায়েমও বুঝা যায়। অবশ্য বাঙলা দেশই ছিল ভারতবর্ষের বস্ত্র-ভাণ্ডার। প্রসাধনে ব্যবহার হত কস্তূরী, কালাগুরু (কৃষ্ণ অগুরু-কাষ্ঠ), চন্দন, কুঙ্কুম ও কর্পূর। ছিল নানা বাদ্যযন্ত্র; তার ফিরিস্তিও রয়েছে। গুপ্তযুগে সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন প্রসিদ্ধ বীণাবাদক; হয়ত তাঁরই আদর্শে পালরাজারাও ছিলেন গীতবাদ্যে উৎসাহী; সে ধারাটি প্রশস্ততর হয়েছিল পরবর্তী শতকে। গৃহপালিত জীবের মধ্যে গরু ও মহিষ ছিল প্রধান। যুদ্ধের জন্য ঘোড়া সংগ্রহ হত সিন্ধুদেশ থেকে। বাঙলা তো হাতীর জন্য প্রসিদ্ধই ছিল।

পানীয় জল ও জলসেচের জন্য রামপাল বড় বড় দীঘি খনন করান; প্রজার করভারও লাঘব করেন। ফলে, একদিকে যেমন ফসল বেড়ে গেল, অন্যদিকে তেমনি বেড়ে উঠল চাষীর সচ্ছলতা। কাব্যখানিতে একটি উপবনের চিত্র রয়েছে। সেখানে নানাবিধ কন্দ (ফলাকার উদ্ভিদ্ মূল), লকুচ বা লকচ (মাদার ফল), শ্রীফল (বেল), লবনী (লতা), কন্দল (কলাগাছ), প্রিয়ালা (আঙ্গুরের লতা), আমলকী, পূগ (গুবাক), অসন (পীতসাল—হয়ত এ বৃক্ষটি

এখন লুপ্ত হয়েছে), বৃহৎ মালতী, শ্রেষ্ঠ নাগকেসর, বকুল, অশোক, পারিজাত, ও লবঙ্গলতার সমাবেশ।

বরেন্দ্রী সুজলা তাই শস্যশ্যামলা ; মাঠে বহুবিধ ধান্য আর নারিকেলের বন।

মহাযানপন্থী পালরাজারা গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন না। রামপাল তিন পংক্তি শিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া তাঁর রাজ্যে ছিল অনেক মন্দির। এ সব মন্দিরে দেবতাদের মধ্যে ছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, আদিত্য, স্কন্দ (কার্তিকেয়) ও বিনায়ক (গণেশ)।

এত সব ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাস করেও রামপালের এতে আসক্তি জন্মেনি বলে মনে হয়, কারণ কবি বলেছেন, শেষ বয়সে তিনি ছেলের হাতে রাজ্যভার দিয়ে মুদ্‌গিরিতে অর্থাৎ মুঙ্গেরে স্বেচ্ছায় গঙ্গাপ্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করেন। সেকালে এ প্রকার আত্মাবলুপ্তির কথা বহু রয়েছে।

এবার আমরা চর্যাপদের কথা বলব নেপাল থেকে এ পুঁথির আবিষ্কর্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত অনুসরণ করে।

চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়া মতের অতি পুরনো বাঙলা গান। হয়ত নানা কারণে এতে পশ্চিমা-অপভ্রংশের অল্প কিছু রূপ অনুপ্রবেশ করছে, কিন্তু তাতে এর বাঙলাত্ব মুছে যায়নি।

প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে প্রভেদ কি ? সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন হলেই তাকে বলে প্রাকৃত ; সে হিসাবে অশোকের শিলালিপিও প্রাকৃত, পালিও প্রাকৃত, আবার বাঙলাও প্রাকৃত। প্রাকৃত ব্যাকরণের সীমানা যে শব্দ লঙ্ঘন করে তাকে বলে অপভ্রংশ।

সহজিয়া ধর্মের সকল পুঁথিই সান্ধ্যভাষায় লেখা। সান্ধ্যভাষার অর্থ আলো-আঁধারি ভাষা ; এর কিছুটা স্পষ্ট, কিছুটা অস্পষ্ট। চর্যাপদেরও তা-ই।

সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের আদি যে লুইপাদ সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। লুইপাদ বাঙালী। এর চেলাদের মধ্যে অনেকে

সংকীর্তনের পদ লিখেছেন আর লিখেছেন দোঁহা। বৌদ্ধ ও হিন্দু দু'দল থেকেই কেউ কেউ নাথপন্থা গ্রহণ করে। নাথপন্থীদের দু'জন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে গোরক্ষনাথ ছিলেন বৌদ্ধ, আবার মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন হিন্দু। এটা অনেকের অভিমত। সমসাময়িক নাথপন্থীরাও অনেক পুঁথি লিখেছেন এরূপ বাঙলা ভাষাতেই। অনুমান, এই দোঁহা থেকেই পরবর্তী কালে পয়ারের সৃষ্টি হয়েছে।

একালে কীর্তনের পদকে বলা হয় পদ, একাদশ শতকে তাকে বলা হত চর্যাপদ।

সহজ-মতের পন্থা তিনটি: অবধূতী, চণ্ডালী ও ডোম্বী বা বঙালী। অবধূতী দ্বৈতবাদী; চণ্ডালী দ্বৈতও নয়, অদ্বৈতও নয়; আর ডোম্বী বা বঙালী নিছক অদ্বৈতবাদী।

চর্যাপদের কথা বুঝবার পক্ষে সুবিধা হবে বলে এ প্রস্তাবনাটি দেওয়া গেল।

চর্যাপদ সান্ধ্যভাষায় লেখা, এ পর্যন্ত তার সাতচল্লিশটি শ্লোক পাওয়া গিয়েছে। এগুলিতে নিম্নকোটি বাঙালীর সিদ্ধাচার্যদের সাধনার কাহিনী রয়েছে। এর মাঝে সামাজিক কথাও উঁকিঝুঁকি মারছে। তা থেকে মাত্র একটি উদাহরণ দিচ্ছি:

"উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরি।
নিত্য ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী॥

... ...

গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ ণিঅমন বাণেঁ।
একে শর সন্ধানেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরমণি বাণেঁ॥"

এ পদ কয়টির আধুনিক বাঙলা রূপ হল:

উঁচা পাহাড়ে বালিকা শবরী বাস করে। শবরীর পরনে ময়ূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জামালা। এখানে গুঞ্জার অর্থ হয় পুষ্পস্তবক, নয়

তালবৃক্ষের পাতা। শবরী শবরকে বলছে, তুমি আমাকে অবহেলা করে অন্য কারো কাছে যেয়ো না। আমি সহজ সুন্দরী—তোমার নিজ গৃহিণী, তোমারই গুহায় ঘুরি ফিরি।

... ...

গুরুবাক্যকে ধনু করে, নিজ মনকে বাণ করে, এক শরসন্ধানে পরম নির্বাণকে বিদ্ধ কর—বিদ্ধ কর।

এর মাঝে যে তত্ত্বকথা অর্থাৎ রহস্যাবৃত সাধনার কথা রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তত্ত্বকথায় আমাদের প্রয়োজন নেই; সামাজিক ইতিহাসের জন্য খুঁজতে হবে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাহিনী।

এখানে শুধু একটি কথা বলে রাখি শেষের দুটি পংক্তি সম্পর্কে। এ দুটি যে উপনিষদের প্রতিধ্বনি তাতে সন্দেহ নেই। মুণ্ডকোপনিষদের দ্বিতীয় মুণ্ডক থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি।

"ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরঃ হ্যুপাসা-নিশিতং সংদধীত।
আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি॥" ৩৫।৩

অর্থাৎ, হে প্রিয়দর্শন, উপনিষদবেদ্য মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ করে তাতে উপাসনা দ্বারা শোধিত শর যোজনা কর। তারপর ব্রহ্মে তন্ময় হয়ে সে তন্ময় চিত্ত দিয়ে সে অক্ষর পুরুষকে বিদ্ধ কর।

এটুকু বলা হল এজন্য যে উপনিষদে 'গুরু'র কথার ছায়ামাত্রও নেই, কিন্তু সহজিয়া দোঁহায় 'গুরুবাক্' ছাড়া পরমনির্বাণ লাভ অসম্ভব। এখানেই হয়েছে পরবর্তী কালের বাঙলার অন্ধ গুরুবাদের সূত্রপাত।

চর্যাপদে এই নিম্নকোটি বাঙালী সমাজের বৃত্তির কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে; তার সঙ্গে মিলে যায় অলবেরুনির ঐতিহাসিক সাক্ষ্য।

ডোমেরা তাঁত (তন্ত্রী) ও চাঙারি (চাঙেড়া) বা করণ্ডহো (চুপড়ি) তৈরি করে বিক্রি করত, কেউ কেউ বারুণী (মদ) চোলাই করত মণ্ড (ভাতের মাড়) থেকে, মদের সাথে চাটও ছিল নাপাকেলা বা কাঁচা কাঁকুড়। এদিকে 'হাঁড়ীতে ভাত নাহি' অথচ 'নিতি আবেগী' অর্থাৎ নিত্যই তার প্রয়োজন। এত দারিদ্র্য সত্ত্বেও যে 'আকাশ ফুলিআ' বা আকাশ-কুসুমের চাষ হত না তা নয়, শবর-শবরীও প্রেমে মশগুল হত, কেউবা 'নেউর' বা নূপুর বেঁধে নাচও করত। 'কুঠার' যখন ছিল তখন কেউ কেউ নিশ্চয় কাটত কাঠ। কেউ কেউ 'সংক্রম' অর্থাৎ সাঁকোও তৈরি করত। খালেঁ (খালে), ণই (নদী) ও ণাব (নৌকা)-এর কথা বহু ; সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে কাচ্ছী (নৌকার কাছি), খুন্টি (নোকা বাঁধিবার খুঁটা), গুণে (নৌকার গুণ), নৌবাহী (নেয়ে), পতবাল (হাল) বেরড়ুয়াল (বৈঠা) ও কবড়ী (কড়ি)। কোথাও যেন এই চিত্রটি মনে জাগে ; নদীতে খেয়া বেয়ে নেয়ে পারাপার করে ; পারের কড়ি না পেলে হয় যাত্রীর লাঞ্ছনা : নেয়ে তার তল্পিতল্পা পারের কড়ির জন্য তল্লাশ করে, এমন কি বাণ্ডকুরণ্ডও অর্থাৎ বটুয়া ও করঙ্কও। গঙ্গাসাঅরুর বা গঙ্গাসাগরের উল্লেখের ফলে মনে হয়, কোনো কোনো সিদ্ধাচার্য চন্দ্রদ্বীপের মানুষ ছিলেন।

পশুদের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে গঅন্দা বা গজেন্দ্রের, গোহালী অর্থাৎ গোশালা যখন রয়েছে তখন গরুও আছে, আছে তুরঙ্গ অর্থাৎ ঘোড়া, মূষা বা মূষিক, শিয়ালহ অর্থাৎ শিয়াল, রয়েছে হরিআ বা হরিণ ; বোড়ো বা বোড়া সাপেরও অভাব নেই। আর রয়েছে হরিণ-শিকারের চিত্র।

"বেরিল হাক পড়অ চৌদীস।

... ...

তুরঙ্গতে হরিণার খুর দীঘঅ ॥"

হরিণ ভয় পেয়ে ছুটছে ; তার গতি এত দ্রুত যে তার খুরের

চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। মৃগয়া শব্দের অর্থ হয়ত ছিল নিহত জীবের মাংস বিতরণ।

ফলের মধ্যে দেখা যায় কঙ্গুরি বা কাঁকুড়, তেন্তলি বা তেঁতুল, কলু বা কলা, ও সিরফল বা বেল। ফসলের মধ্যে ভাতের মূল ধান; তুসিঁ অর্থাৎ তুষ যখন ছিল তখন ধানভানাও হত। তুলা আঁশ আঁশ করে ধোনাও হত; তন্ত্রী যখন চলত, তখন সুতাও কাটা হত বৈকি।

বিবাহে বর পেত 'জউতুকে' বা যৌতুক; হয়ত ডোম হত বহ্মণ বা ব্রাহ্মণ; বহুড়ী বা বৌ ঘরে আসত। চোরের ভয়ও ছিল, কারণ ঘুমন্ত বধূর কানের গয়না যেত চুরি।

"কানেট চোরেঁ নিল আধারাতী॥
সসুরা নিদ্ গেল বহুড়ী জাগই।
কানেট চোরেঁ নিল কা গই মাগই॥"

কানের গহনা চোরে নিল আধা রাতে
শাশুড়ী ঘুমায় বউ জেগে আছে
কানের গহনা যে চোরে নিল কোথায় খোঁজা যায়॥

খেলার মধ্যে হয়ত শ্রেষ্ঠ ছিল 'নববল' বা দাবাখেলা। সে-কালেও 'উপকারিক' খেলোয়ারকে চাল বলে দিত।

'ইষ্টমালা' বা জপমালা ছিল। পরম জ্ঞানের সন্ধানে কেউ কেউ বা যেত লঙ্কায়। সরহপাদ লঙ্কায় যেতে মানা করছেন: "নিঅহি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক"।

চর্যাপদের অনেক পদই ক্রমে বাঙলা প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

ভুসুকুর 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' অর্থাৎ সুস্বাদু মাংসের জন্য হরিণ নিজেই নিজের শত্রু হয়েছে—এর প্রতিধ্বনি পরবর্তী কালে মেলে। সরহপাদের 'বর সুণ গোহালী কি সো দুঠ্ট বলঙ্গে'র অধুনিক রূপ, 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল'। ঐ সিদ্ধাচার্যেরই 'হাথেরে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপন' হয়েছে 'হাতের শাঁখা দর্পণে দেখা'।

ঢেণ্টণপাদের 'তুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাঅ' হয়েছে 'দোয়া দুধ কি আর বাঁটে সেধোয় ?'

এবার একবার একাদশ শতকের বাঙালী সমাজের সামগ্রিক চিত্রের সন্ধান করা যাক।

বাঙালীর তখনো কোনো অখণ্ড সমাজসত্তা গড়ে উঠেনি। একদিকে মুষ্টিমেয় উচ্চকোটি মানুষ, অন্যদিকে বিরাট্ ও নিঃস্বপ্রায় নিম্নকোটির জনতা ; মধ্যে কোনো মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংস্থা নেই। উচ্চকোটির কাছে নিম্নকোটি ঘৃণ্য, অবহেলিত। এক যোগসূত্র রয়েছে ক্রমবর্ধমান তান্ত্রিকবাদে। উচ্চকোটি উত্তরাপথের দিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিপাত করে নিজেদের আর্যসভ্যতার ধারক বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে, ওদিকে নিম্নকোটি মানুষ বাঙলার আদিম সভ্যতার বাহক হয়ে, নিজেদেরই গড়া সমাজে, উচ্চকোটি থেকে পরিপূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ধর্মে উচ্চকোটি শূন্যবাদী বৌদ্ধ ও পৌরাণিকধর্মী হিন্দু, নিম্নকোটি বৌদ্ধ সহজযানপন্থী ও নাথপন্থী। শূন্যবাদী বা মহাযানপন্থী বৌদ্ধের চারিত্রিক দৃঢ়তা ক্রমশ লোপ পাচ্ছে, বহির্বাণিজ্যে এসেছে ভাঁটা, ফলে দেশের সচ্ছলতাও ক্ষীয়মাণ। শূন্যবাদী বৌদ্ধের দৃষ্টি সহজযানের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে বটে, তবে সে পথের পরিসমাপ্তি যে নোংরামিতে তারও দৃষ্টান্ত তার চোখ এড়াচ্ছে না। উচ্চকোটিতে হিন্দু ও বৌদ্ধে মূলত কোনো সামাজিক প্রভেদ নেই ; উভয়েই মনুসংহিতার নির্দেশ মেনে চলে, শুধু গৃহ্যসূত্রোক্ত দশসংস্কার হলেই বৌদ্ধ হিন্দু হতে পারে। বৌদ্ধ-সমাজের চূড়ামণি বেণেরা তাই ক্রমশ সেদিকে ঝুঁকে পড়ছে।

চাতুর্বর্ণ্য ধর্মের বাহক হিন্দুরা নানা বৃত্তিভোগী। ব্রাহ্মণেরা স্মার্ত ; অনেকেই বিষ্ণুভক্ত, শ্রুতিতে অর্থাৎ বেদে উপনিষদ তাঁদের দখল কম।

রাজারা বৌদ্ধ বটে, কিন্তু অন্য কোনো ধর্মের প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ নেই। দেশে সামন্তরাজের সংখ্যাও কম নয় ; মূল রাজাকে

তাদের কর দিতে হয়। করভার খুব বেশি নয়, দেশেও মোটামুটি শান্তিই বর্তমান।

অন্তর্বাণিজ্যেও ছিল বিনিময় প্রথা। নগদ অর্থ হিসাবে কড়ির প্রচলনই বেশি, হয়ত কিছু স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রারও ব্যবহার ছিল, কিন্তু তার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য স্পষ্ট নয়।

চিকিৎসা সুশ্রুত-পন্থী, কিন্তু সর্বসমাজেই টোটকা, তুকতাক, ঝাড়ফুঁক অন্তত প্রাথমিক সম্বল। মূলত এ কারণেই তান্ত্রিক পন্থার আকর্ষণ বেশি।

শিক্ষার বাহন প্রাকৃত ও সংস্কৃত। পোশাক ধুতি ও শাড়ি। বৌদ্ধরা পাগড়ি পরত না, তাদের ছোঁয়াচে একালে সর্বশ্রেণীর বাঙালী ক্রমশ পাগড়ি ছেড়ে দিয়ে উত্তরাপথে প্রচলিত এই মাথার বোঝা লাঘব করে 'নাঙ্গাশির' হয়।

মৎস্য সম্পর্কে বৌদ্ধরা 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' মানত বলে মনে করার কারণ নেই ; হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণও হয়ত সামান্য কিছু বাচ-বিচার করত। সহজযানের প্রবর্তক লুইপাদের মৎস্যপ্রীতি তা সর্বজনবিদিত। তিনি 'মাছের আঁতড়ি' (পাতরি ?) 'তেলের বড়া', ছেঁচড়া, চচ্চড়ি খেতে ভালবাসতেন।

প্রাসাদ, বিহার ও মন্দির হত ইষ্টকে তৈরী। শহরে, বন্দরে দেখা যেত 'ইটকোঠা', 'মাটকোঠা', বেত, বাঁশ, কাঠ ও শণের তৈরী বাড়ি। 'ইটকোঠা' ও 'মাটকোঠা'র বাড়ির প্রত্যেকটিতেই থাকত বাতায়ন আর রাস্তার দিকে একটা গোল বারান্দা। গ্রামে স্বভাবতই মাটকোঠা ও বেত-বাঁশ-শণের বাড়ি বেশি।

লাঙ্গলের প্রচলন হয়েছিল বহু পূর্বে—টানতো জোড়া বলদে লাঙ্গল শব্দটি মূলত অস্ট্রিক ভাষার অর্থাৎ আদি অস্ট্রেলিয়ার ভাষার যা ক্রমশ সারা দূরপ্রাচ্যে ও ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে ধানচাষের প্রসারের ফলে। আর্যদের প্রথমে চাষবাসও ছিল না ; তাই সংস্কৃতে এরূপ শব্দের প্রয়োজনও ঘটেনি। এদের মধ্যে চাষবাস প্রচলনের

সঙ্গে সঙ্গে এ শব্দটিও সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস।

চাষের নানা যন্ত্রপাতি তৈরিও হত গ্রামে গ্রামে—শহরে তো বটেই। খাবার খাওয়া হত কলাপাতে, মাটির ও কাঠের থালায়—পিঁড়িতে বসে। এ ব্যাপারে কলাপাতার ভূমিকা যে ব্যাপক ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তার সাক্ষ্য মেলে একালেও বহু নিমন্ত্রণে, আর তার রেশ বাজে একটি খনার বচনের আধুনিক রূপে :

"এক হাত অন্তর দু'হাত খাই (খাদ, গর্ত)
কলা রুয়ো চাষা ভাই,
রুয়ো কলা না কেট পাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।"

মূলত এ প্রথাটিই এখনো বর্তমান, তবে ক্রমশ দ্বিতীয় দু'টির স্থান নিয়েছে ধাতুর তৈরী পাত্র। অবশ্য রাজরাজড়া, বণিকশ্রেণী ও ধনীদের গৃহে স্বর্ণ ও রৌপ্যের থালার ব্যবহার হত, বিশেষ করে উৎসবে।

উৎসবে যে যে মাঙ্গলিক দ্রব্যাদির ব্যবহার হত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায়ই তা তুলে ধরছি :

"রাস্তার দুধারে বাঁশের থাম। প্রত্যেক থামের গোড়ায় পূর্ণকলস, তাহার উপর আম্রশাখা, একটি টাটকা ডাব। কলসীতে সিন্দূর, চন্দন ও হলুদের দাগ। পূর্ণকলসের পিছনে একটি কলাগাছ।"

একালেও সে মাঙ্গলিক চিহ্নের কোনো পরিবর্তন ঘটেছে কি ?

অশন ও বসনেও বাঙালী সমাজে মূল পরিবর্তন বিশেষ কিছু হয়নি ; যেমন ছিল একাদশ শতকে তেমনি রয়েছে উনবিংশ শতকেও। কিন্তু সবচেয়ে যা অপরিবর্তিত রয়েছে তা হল জাতির একটা অখণ্ড সমাজবোধের অভাব। তার সে ফাঁক কোনোদিনই ভরেনি, হয়ত কোনো শতকে একটু কমেছে মাত্র। এ অখণ্ড জাতীয়তাবোধের

অভাবের ক্ষেত্রে সে অবশ্য সমগ্র ভারতবর্ষেরই অংশীদার, কিন্তু তার এই সহজাত দৈন্য তাকে চরম দুর্বল করে রেখেছে। সমাজ-দেহের এই বিচ্ছিন্ন বৃহৎ অঙ্গটি তাই সর্ব শতকেই নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত ঘাট খুঁজে মরেছে।

একালেও বাঙলা ও গুজরাটের ছিল বহির্বাণিজ্যে সুনাম। এজন্য বাঙালী বণিক্ তাদের রপ্তানির মাল চারিদিক থেকে এনে গুদামজাত করত কোনো কোনো স্থানে। সম্ভবত এর জন্যই সেসব স্থানে গড়ে ওঠে ছোট ছোট শহরাঞ্চল; এ গুলিকে আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রে পরিণত করা হল সুবিধাজনক। তার চারদিকে বেষ্টনী তুলে করা হল সুরক্ষিত। বড় বড় গ্রামেও যে প্রধান বেষ্টনী থাকত তাতে সন্দেহ নেই; তার প্রমাণ রয়েছে চর্যাপদে। নিম্নকোটির বাঙালী সমাজের স্থান কখনো সে বেষ্টনীর মধ্যে হয়েছে কিনা সন্দেহ।

গুপ্তযুগের আমল থেকে বাঙলা তথা সৌরাষ্ট্র থেকে সমগ্র উত্তরাখণ্ডে গুপ্তাব্দের প্রচলন হয়েছিল। গুপ্তাব্দ শুরু হল ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, প্রথম চন্দ্রগুপ্তের আমলে। বাঙলায় গুপ্তাব্দ চালু ছিল ষষ্ঠ শতকের প্রায় প্রথম পাদ পর্যন্ত। পালাব্দ শুরু হল ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হয়ত গুপ্তাব্দও কিছু চলত।

বিক্রমাব্দের প্রচলন ঘটেছিল সারা উত্তরাখণ্ডে, নবম শতক থেকে। বিক্রমাব্দের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, তারপর, সারা উত্তরাখণ্ডে তা চললেও বাঙলায় এটি চলেনি।

এসব অব্দ চলত সাধারণ রাজকার্যে। সামাজিক ব্যাপারে, দিনক্ষণ দেখতে, লাগত 'তিথি'-বিচার। এ বিচার সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে উঠল মানুষের জীবনে দৈবশক্তির তথা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাববৃদ্ধির ফলে। বাঙলার বৌদ্ধযুগেও দিনক্ষণ দেখা হত বটে, তার পরিচয় রয়েছে 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'তে। দিনক্ষণ দেখে সওদাগরেরা বাণিজ্যে যাত্রা করত। মধুমালায় রানী ও রাজকন্যা

'ক্ষণ-সময় দেখিয়া মদনকুমারকে সোনার ময়ূরে চড়াইয়া মধুমালার দেশে পাঠাইয়া দিলেন।'

কিন্তু সারা দেশ যে গণক-জ্যোতিষে ভর্তি ছিল না, তার পরিচয় রয়েছে ডাকের বচনে ঃ

'যে দেশে নাই গণক জ্যোতিষা
গোধূলি লগন, যাত্রা উষা।'

তাই, তিথি-বিচার প্রবল হল দ্বাদশ শতকে।

গীতগোবিন্দের কাল

[দ্বাদশ শতক]

[তিন]

উত্তর বঙ্গ ও রাঢ়	**পূর্ববঙ্গ**
রামপাল (১০৭৭-১১২০)	বর্মবংশ (পুনরুত্থান)
বিজয় সেন (১০৯৫-১১৫৮)	
বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯)	
লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৬)	

গৌড়বঙ্গের প্রায় অর্ধশতকের প্রতাপশালী সম্রাট রামপালের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে পালরাজলক্ষ্মী চিরতরে রামাবতীর রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করলেন। তাঁর শেষ আশীর্বাদের জোরে সম্রাটের বংশধরেরা আরো কিছুদিন লক্ষ্মণাবতী রাজপ্রাসাদে কায়েম রইলেন বটে, তবে, সুযোগ বুঝে, সামন্তরাজরা হল বিদ্রোহী, আর বহিঃশত্রুও ক্রমাগত গৌড়বঙ্গের দ্বারে হানা দিতে লাগল। পূর্ববঙ্গে বর্মরাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন।

সেনেরা যে কি সূত্রে বাঙলার রাঢ় অঞ্চলে এসে জুড়ে বসেছিল তা জানা যায়নি। তবে তারা এসেছিল প্রাচীন কর্ণাট থেকে অর্থাৎ আধুনিক বম্বে প্রদেশ ও হায়দরাবাদের দক্ষিণ এবং মহীশূর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে। এরা প্রথমে ছিল জৈনধর্মী, পরে শৈবপন্থী। রাঢ়ে প্রথমে হয়ত ছিল অখ্যাত জোতদার, ক্রমে এই বংশের বিজয় সেন হল সামন্তরাজ। রামপালের মৃত্যুর পরে দেখা গেল বিজয় সেনের অমিত পরাক্রম। দ্বাদশ শতকের তৃতীয় পাদের প্রারম্ভে তিনি পুত্র স্বনামখ্যাত বল্লাল সেনকে যে রাজ্যভার দিয়ে গেলেন তার পরিধি বহুবিস্তৃত। সে রাজ্যকে বল্লাল ভাগ করলেন পাঁচ ভাগে—রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী, বঙ্গ ও মিথিলা। ঐতিহাসিকের

মতে, বিজয় সেনই প্রথম বিক্রমপুরে সেনরাজাদের অন্যতম রাজধানীর পত্তন করেন। বল্লাল-পুত্র লক্ষ্মণ সেন পিতার তক্তে বসেন প্রায় ষাট বছর বয়সে। বিশ বছর দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যশাসন করে গঙ্গাতীরে বিজয়গড় বা নবদ্বীপের রাজপ্রাসাদে এসে প্রধানত কাব্য ও শাস্ত্রচর্চায় মন দেন। তুর্কী হামলাদার গৌড়ে এসে হাজির হয় ত্রয়োদশ শতকের প্রায় শুরুতেই; তারপরও লক্ষ্মণ সেন রাজত্ব করেন অন্তত তিন-চার বছর। এই হল মোটামুটি দ্বাদশ শতকের বাঙলার রাজনৈতিক কাহিনী।

একাদশ শতকে বাঙলার সমাজ-কাঠামোর কোনও বাঁধনি ছিল না। সমাজের উপরতলায় ছিল 'গুভাজু' ও 'দেবভাজু'র লড়াই আর নিচের তলায় সহজিয়াপন্থীদের ক্রমবর্ধমান বীভৎস কীর্তি। দুয়ের মধ্যে যে সিঁড়ি বর্তমান তার ভিত্তি তান্ত্রিকবাদে। বৌদ্ধ সমাজের চূড়ামণি বেণেরা ক্রমশ পৌরাণিক হিন্দুধর্মে আকৃষ্ট হচ্ছিল; নানা কারণে তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তাও কমে আসছিল। দিক্‌পতি রাম পালের তিরোধানের পরেই রাজধর্মে এল বিরাট্ পরিবর্তন, কারণ হিন্দু সেনেরা বৌদ্ধ পালদের মত উদারপন্থী ছিলেন না। তাঁরা মূলত ছিলেন গোঁড়া—কাজেই এর ফলে বৌদ্ধদের প্রতি যে সামাজিক অত্যাচার শুরু হল না একথা জোর করে বলা চলে না। দেখা যায়, একালে অনেক বৌদ্ধ বাঙলা থেকে পেগু, আরাকান, কুকীরাজ্য, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে চলে যাচ্ছে।

বাঙালী সমাজের দুটি বিভিন্ন স্তরের মাঝে যে সংযোগের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ তান্ত্রিকবাদ সম্পর্কে মোটামুটি আরো একটু স্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন; কারণ সমাজের সর্বস্তরেই এর প্রবল প্রভাব ছিল উনবিংশ শতক পর্যন্ত।

তাত্ত্বিক দিক থেকে তন্ত্রশাস্ত্রের মূলসূত্র ও আদর্শ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার অভেদত্ব উপলব্ধি করা। তাই তন্ত্রসাধন-বিধির প্রথম কথাই 'শিবো ভূত্বা শিবং যজতে; দেবী ভূত্বা তু তাং যজতে' অর্থাৎ

তান্ত্রিক সাধনে পূজক নিজেকে শিব মনে করে শিব-পূজা করবে; নিজেকে দেবী মনে করে দেবী-পূজা করবে। এ পূজার প্রথম সোপান দীক্ষা। গুরুর কাছে দীক্ষা না নিলে তন্ত্রের পথে পদক্ষেপ করা চলে না। জাতিনির্বিশেষে যে-কোনো হিন্দুই, পুরুষ ও স্ত্রী দুই-ই, তান্ত্রিক দীক্ষা নিতে পারে; বৌদ্ধের মধ্যে তো জাতিভেদ নেই-ই। ব্রাহ্মণের কাছেও এ দীক্ষামন্ত্র বা 'ইষ্টমন্ত্র' তার গায়ত্রী থেকেও গরিষ্ঠ। এই প্রাথমিক দীক্ষা তান্ত্রিকের নিত্যপূজার জন্য; এ পথে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি হলে, যথাযোগ্য কালে গুরুই তাকে পূর্ণাভিষেক বা পূর্ণদীক্ষা দান করবেন। তারপর তার যাত্রা শুরু হবে আরো উচ্চলোকের পথে।

এ পথে, বিশেষ করে শক্তি সাধনার, দুটি স্তর রয়েছে। প্রথমটি ষট্‌কর্ম। ষট্‌কর্ম কি কি? (১) মারণ বা ধ্বংস (২) উচ্চাটন বা বিতাড়ন (৩) বশীকরণ বা নিজের আয়ত্তে আনা (৪) স্তম্ভন বা রোধ করা, যথা, ঝড়কে শান্ত করা বা কারো বাক্‌শক্তির হানি করা (৫) বিদ্বেষণ বা দু'জনের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করা, আর (৬) স্বস্ত্যয়ন বা কোন মানুষের বা তার পরিবার-গোষ্ঠীর সর্ব-শুভ করা।

দ্বিতীয় দূতীযান। এতে রয়েছে পঞ্চ-'ম'কার সাধনা। এই পাঁচটি 'ম' কি কি? (১) মদ্য (২) মাংস (৩) মৎস্য (৪) মুদ্রা বা মদের চাট, আর (৫) মৈথুন।

সাধক বিচারে নয়টি শ্রেণীবিভাগ রয়েছে; এর মধ্যে সর্বোচ্চ হল কৌলাচারী।

কিন্তু একমাত্র সর্বোচ্চ স্তরের সাধকই, অর্থাৎ কৌলাচারীরও একটি অংশ মাত্র পঞ্চ-'ম'কার সাধনার অধিকারী। এ সাধনা চলে মাত্র পরমহংস বা জ্ঞানযুক্ত গুরুর সাহচর্যে। তাত্ত্বিক দিক্ থেকে এ সাধনার অর্থ এই যে, যেসব জিনিস মানুষকে নিচু স্তরে টেনে আনে তার মধ্যে প্রবেশ করেও সাধকের মন অবিচলিত থাকে কিনা তার পরীক্ষা দেওয়া। প্রলোভনের এলাকা থেকে দূরে থেকে সংযম

এক কথা, আর প্রলোভনের মধ্যে থেকেও তাতে অবিচলিত থাকা অন্য কথা ; বলাবাহুল্য, এ পথ দুর্গমতর।

এজন্যই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে গীতার মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবন-গঠনের পন্থাগুলির যে সমন্বয় ঘটেছে তার চেয়েও মূল্যবান্ সমন্বয়ের কথা রয়েছে তান্ত্রিকবাদে, কারণ তন্ত্রের মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিকূলতাকে অনুকূল করে নেবার পথ দেখানো হয়েছে।

তন্ত্রের সূচনা অথর্ববেদে গ্রথিত থাকলেও শাস্ত্রহিসাবে তার উদ্ভব সর্বপ্রথম কোথায় হয়েছে তা নিয়ে মতদ্বৈধ রয়েছে। বাঙলা দেশেই এর গোড়া পত্তন হয়েছিল কিনা তা জোর করে বলা দুষ্কর, তবে এ সম্পর্কে অনেকে অজ্ঞাত কবির একটি পুরনো, বহুপ্রচলিত শ্লোকের উপর নির্ভর করেন ঃ

"গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা মৈথিলৈঃ প্রবলীকৃতা।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা ॥"

বাঙলায় এর প্রথম প্রকাশ না হলেও, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল যে তান্ত্রিকবাদের প্রধানতম আশ্রয় ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমাদের কথা তাত্ত্বিক নয়, সামাজিক। নিতান্ত স্বাভাবিক-ভাবেই ষট্‌কর্ম ও পঞ্চ-'ম'কার সাধনা জনসাধারণের পরম আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠল। তুক্‌তাকের উপর ভক্তি ও নির্ভরতা হল অপরিসীম আর পঞ্চ-'ম'কার সাধনা ক্রমে পরিণত হল কাম-চর্চায়। গুরুবাদের ভিত্তি দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হল এবং তান্ত্রিক সাধকের কদর বেড়ে গেল সমাজের সর্বশ্রেণীর কাছেই। শ্মশানে, তান্ত্রিক সাধুদের আস্তানায়, গৃহস্থের বাড়িতেও মারণ, বশীকরণ, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির জন্য হোম যজ্ঞ প্রভৃতির ধুম পড়ে গেল ; সঙ্গে সঙ্গে চলল 'ভৈরবী চক্র' ও 'কারণবারি'-রূপ আসবপানের সঙ্গে নির্লজ্জ কামাচার।

এই পঙ্কিল স্রোতের সঙ্গে এসে মিশল বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থার আবিলতা যার বর্ণনা করতে গিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন,

"লুই-সিদ্ধার যে দল হইয়াছে তাহারা বেশ্যাবৃত্তিকেও হারাইয়া দিয়াছে।" এমনিই তো শৈব নাথপন্থীদের সঙ্গে সহজিয়া সাধনার বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না, এবার শৈব তান্ত্রিকবাদের সঙ্গে এসে সে আবর্জনার স্রোত মিশে বাঙালী সমাজের জাহান্নমের পথ প্রশস্ততর করে দিল। ফলে সমাজ-বন্ধন হল আরো শিথিল, বাঙালী আরো উন্মার্গগামী। কিন্তু এও শেষ নয়, আরো কথা রয়েছে।

এই শিথিল সমাজ-বন্ধনকে দৃঢ় করতে চেষ্টা করলেন এ যুগের দুজন রাঢ়ী স্মার্ত পণ্ডিত; এক, ভবদেব ভট্ট, দুই, জীমূতবাহন। এঁদের কাল দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধ। ভট্টমহাশয় ছিলেন বিক্রম-পুরের বর্মরাজাদের মন্ত্রী; নানা শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের তুলনা হয় না। এঁকে বলা হত 'বালবলভীভুজঙ্গ' অর্থাৎ বাড়ির সর্বোচ্চ কক্ষের অধিবাসী। এঁর "ছান্দোগ-কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি" সে কালের বাঙালীর সমাজ-ব্যবস্থার দিগ্দর্শন।

সমাজের প্রতিটি মানুষেরই সামাজিক কর্তব্য নির্ধারণ করে দিত স্মৃতিশাস্ত্র—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। কাজেই স্মার্ত পণ্ডিতদের সমাদর ও সম্মানের অন্ত ছিল না। এঁদের মধ্যে যাঁরা পণ্ডিতাগ্রগণ্য তাঁদের দেওয়া পাঁতি ছিল সর্বজনগ্রাহ্য। ভট্টমহাশয়ই প্রথম বাঙালী ব্রাহ্মণের আমিষ ভোজনের অনুমোদন করে পাঁতি দেন। শাস্ত্রীয় যুক্তির ছাড়পত্র পেয়ে বাঙালী ব্রাহ্মণ ভারতীয় অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সভায় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল; নইলে মৎস্যভক্ষণের জন্য তারা তাদের সমবর্ণীদের কাছে ছিল হেয়।

আর্যজাতি অবশ্য নিরামিষভোজী ছিল না; পরবর্তী কালে সম্ভবত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রসারের ফলে নিরামিষের বহুল প্রচলন ঘটে। বাঙলা যে সে বিধি মানেনি তার কারণ সম্ভবত এ অঞ্চলে প্রবল তান্ত্রিকবাদের প্রভাব।

ভট্টমহাশয় আমিষ ভক্ষণকে পাতে তুললেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে সিদ্ধ চাল ও মসুরির ডাল দুই-ই রইল অভক্ষ্য।

এরাও ক্রমে ছাড়পত্র পেল, তবে তা কয়েক শতক পরে। এর ফলে বাঙালী ব্রাহ্মণ ক্রমে ভারতীয় সাধারণ ব্রাহ্মণ-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপন বৈশিষ্ট্যে আপনি প্রতিষ্ঠিত হল।

অসামান্য পণ্ডিত জীমূতবাহনও অবশ্য সায় দিলেন আমিষ ভোজনের পক্ষে। কিন্তু তিনি মাত্র হাঁড়ির পার্থক্যে বাঙালী ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য অর্পণের পথ প্রশস্ত করেই দিলেন না, সমস্ত বাঙালী জাতিকে ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক্ করে ফেললেন 'দায়-ভাগ' বিধি রচনা করে। উত্তরাধিকারসূত্রে হিন্দু বাঙালী তাই ভারতীয় অন্যান্য জাতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্।

কথাটা আরো একটু স্পষ্ট করে নেওয়া যাক।

বাঙালী জাতিটা আগাগোড়াই মাতৃকেন্দ্রিক। এর কারণ বোধহয় এদের মধ্যে দ্রাবিড় ও কোল রক্তের প্রচুর সমাবেশ ঘটেছে। আর্যেরা পিতৃকেন্দ্রিক, কিন্তু বাঙালীর আচার-আচরণে তাদের প্রভাব চিরদিনই কম। দ্রাবিড় জাতিও মূলত মাতৃকেন্দ্রিক, কিন্তু আর্যভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আচার-ব্যবহারের কিছুটা গ্রহণ করেছিল। মাতৃকেন্দ্রিকতার ফল স্ত্রীলোকের বহুভর্তৃকতা; এখনও তার চিহ্ন রয়েছে মালাবারে ও কোচিনে, অবশ্য কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে। নায়াররা এখনও বংশতালিকা তৈরি করে মায়ের দিক্ থেকে। বাঙলায় এ প্রথা চলেছিল কিনা বুঝবার উপায় নেই, তবে মাতৃজাতির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ওদিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বটে। বাঙালী দেশকে দেখে মাতৃরূপে; পূজার মধ্যে দেবী-পূজাই তার সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

হিন্দুর আইন-কানুনের মূল রয়েছে মনুসংহিতায় অর্থাৎ মনুর অনুশাসনে। মনুসংহিতার ভাষ্য লিখেছেন বিশেষজ্ঞ স্মার্ত পণ্ডিতেরা। নবনব ভাষ্যের ফলে প্রদেশে প্রদেশে আইনের কিছু তারতম্য ঘটেছে। মোটামুটি হিসাবে, এ পরিবর্তনের ধাপ তিনটি। খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০০ সাল*

---

* Sir H. S. Gour-এর মত।

থেকে দ্বাদশ শতকের অর্ধেক পর্যন্ত প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে অষ্টাদশের তৃতীয় পাদের প্রায় শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বের শুরু পর্যন্ত ; তৃতীয় ধাপ সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত পরবর্তী সর্ব-পরিবর্তনের যুগ।

এই দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধেই রচিত হল মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ ; প্রথমটি প্রণয়ন করলেন হায়দারাবাদের অধিবাসী বিদ্বানেশ্বর, দ্বিতীয়টি বাঙালী জীমূতবাহন। মিতাক্ষরা মনুর ব্যাপক ভাষ্য, কিন্তু মিত অর্থাৎ পরিক্ষিত অক্ষরে লেখা অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত। ভারতবর্ষের সর্ব-প্রদেশেই এ ভাষ্যের সম্মান রয়েছে, আর বাঙলায় দায়ভাগেরই প্রাধান্য অর্থাৎ যে ব্যাপারে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগের মধ্যে মিল নেই, সে ব্যাপারে বাঙলা দায়ভাগের ভাষ্যই মেনে চলে। বোম্বাই প্রদেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা—সেখানে প্রাধান্য পায় 'ব্যবহার-ময়ূখ'। 'দায়' শব্দের অর্থ দান বা উত্তরাধিকার ; দায়ভাগের অর্থ লোকান্তরিত ব্যক্তির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের রীতি। এক্ষেত্রে অমিল মনুর 'সপিণ্ড' কথাটির ব্যাখ্যা নিয়ে।

মিতাক্ষরার দৃষ্টিভঙ্গী পিতৃকেন্দ্রিক সমাজের—সেজন্য লোকান্তরিত মানুষের সম্পত্তিতে সর্বপ্রথম অধিকার তার পুত্রের, পুত্রের অভাবে পৌত্রের, তার অভাবে প্রপৌত্রের, তার অভাবে বিধবা স্ত্রীর, তার অভাবে কন্যার, তার অভাবে দৌহিত্রের। অর্থাৎ দৌহিত্রের স্থান ষষ্ঠ। দায়ভাগের দৃষ্টিভঙ্গী মাতৃকেন্দ্রিক ; সর্বপ্রথম অধিকার অবশ্য পুত্রেরই, তার অভাবে পৌত্রেরও, তার অভাবে প্রপৌত্রেরও, কিন্তু তার অভাবে দৌহিত্রের ; অর্থাৎ দৌহিত্রের স্থান চতুর্থ। ফলে, পুত্রহীন লোকান্তরিত মানুষের সম্পত্তি বাঙলায় সোজাসুজি পাবে তার দৌহিত্র। সমাজ-ব্যবস্থায় দ্বাদশ শতক থেকে বাঙলায় তাই কন্যা পুত্রের প্রায় শামিল হয়েই রয়েছে।

মহাপণ্ডিত জীমূতবাহনের তিনখানি পুথি, 'ব্যবহার-মাতৃকা', 'দায়ভাগ' ও 'কালবিবেক' অবিকৃত অবস্থায়ই পাওয়া গেছে।

মোটামুটি পুরা দ্বাদশ শতকটাই বাঙলায় কর্ণাটী সেনদের রাজত্বকাল। এঁদের সামাজিক দিক্ থেকে প্রধান দু'জন ; এক বল্লাল, দুই, লক্ষ্মণ। পিতাপুত্র উভয়েই শাস্ত্রজ্ঞ, বিদ্বান্, লেখক, প্রতাপবান্ এবং তান্ত্রিকবাদে বিশ্বাসী। দু'জনেই যে সমশ্রেণীর বিদ্বান্ ছিলেন তার প্রমাণ 'অদ্ভুতসাগর' পুঁথিখানির শুরু করেছিলেন বল্লাল, শেষ করেন লক্ষ্মণ।

বল্লাল ও লক্ষ্মণ দুজনেই বাঙালীর নবসমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন ব্রাহ্মণ্যের বা চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে। সেকালে শূদ্রের ছিল বৃহত্তর সংজ্ঞা : অব্রাহ্মণ মাত্রই শূদ্ররূপে পরিগণিত হত। এ বৃহত্তর সংজ্ঞা পুরাণেও দেখা যায় ; শুধু চতুর্থ বর্ণটিই শূদ্র নয়, অন্য তিনটি বর্ণের মধ্যেও যারা তান্ত্রিকবাদী তারাও শূদ্র, বৌদ্ধ হিন্দুত্ব বরণ করলেও সে শূদ্র।

এ প্রচেষ্টার ফলে বৌদ্ধদের মধ্যে হয়ত অনেকেই হল দেশত্যাগী, স্বর্ণবণিক্‌দের মধ্যে সামান্য বৃত্তিগত তারতম্যে ভেদ-বিভেদ বেড়ে গেল, কিন্তু হিন্দু সমাজের চির-সমস্যার, অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন বিরাট্ নিম্নকোটি সমাজ-সংস্কারের কোনো সমাধান হ'ল না। এর ফলে যে বাঙালী হিন্দু সমাজ দুর্বলতর হয়ে গেল তাতে সন্দেহ নেই।

বেদে বর্ণভেদের কথা নেই বলে ধরা যেতে পারে। ঋগ্বেদের একটি মাত্র মন্ত্রে তা রয়েছে বটে তবে সেটি আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ত বলে ধরা হয়। বেদের পরে মনুসংহিতাই প্রাচীনতম পুঁথি। মনু বলেছেন :

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রক নিরবর্ত্তয়ৎ।"

অর্থাৎ সর্বলোকের সমৃদ্ধি-কামনায় পরমেশ্বর নিজের মুখ, হাত, উরু ও পা থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণের সৃষ্টি করেন।

জাতিভেদের ভিত্তি হয়ত এই শ্লোকটিই। কিন্তু শুরুতে এ

বর্ণবিভাগ যে নিতান্তই বৃত্তিগত ছিল, ধর্মের সাথে যে এর কোনো সম্পর্ক নেই এবং ব্রাহ্মণও যে অব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করলে বর্ণান্তর লাভ করত, আর অব্রাহ্মণও যে ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করে ব্রাহ্মণ হত সে কথা আমরা ভুলে গেছি। এর কারণ অযোগ্য ব্রাহ্মণদের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা। বর্ণভেদটা যে নিতান্তই বৃত্তিগত তার আরো প্রমাণ রয়েছে। দ্বাদশ শতকেও অসবর্ণ বিবাহ অপ্রচলিত ছিল না, তবে উচ্চবর্ণের কন্যা নিম্নবর্ণের পুরুষকে বরণ করতে পারত না। অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকলেও তা নিন্দনীয় হয়ে উঠছিল। অসবর্ণ বিবাহের ফল সঙ্কর জাতি ; সমাজ ক্রমশ সে-সব জাতিরও বর্ণবিভাগ করতে শুরু করল। ফলে হিন্দু সমাজে অসংখ্য জাতির হল উদ্ভব। যথাকালে সে কথায় আসা যাবে।

এবার বল্লালের কথায় ফিরে যাওয়া যাক।

বাঙলার কৌলিন্য প্রথা যে বল্লালেরই সৃষ্টি এ অমূলক প্রবাদ বহুদিন যাবৎ চলে আসছে। কিন্তু ইতিহাসে এর কোনো প্রমাণ মিলে না। এটি ইতিকথা মাত্র। কৌলিন্যের লক্ষণ নয়টি বলে ধরা হয়েছে :

> "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
> নিষ্ঠা, শান্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥"

আচার বা আচরণ, বিনয় অর্থাৎ শালীনতা বা শাস্ত্রানুশাসন-মান্যতা, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-পরিক্রমণ, নিষ্ঠা, শান্তি, তপস্যা ও দান— কুলীনের এই নয়টি লক্ষণ।

বল্লালের লেখা 'অদ্ভুতসাগর' ও 'দানসাগরে' এর কোনো উল্লেখই নেই ; লক্ষ্মণের বিশিষ্ট ও পরম পণ্ডিত সভাসদ্‌দের কারো কোনোও লেখাতেই এর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।

তবে বল্লাল ও লক্ষ্মণের নামের সঙ্গে এ সমাজ-সংস্কারের যোগ হল কেন? ব্যাপারটা মোটেই জটিল নয়। এই শ্রেণীবিভাগ বস্তুত পরবর্তী কালের, সম্ভবত ঘটকদের সৃষ্টি। কিন্তু বল্লাল ও লক্ষ্মণ

গৌড়-বঙ্গের শেষ দু'জন হিন্দু সম্রাট্; তাঁদের দোহাই না দিলে এ বিভাগ যে ধোঁপে টিকবে না এ ধারণা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বস্তুত বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি 'উপাধ্যায়'দের সৃষ্টি অবশ্য দ্বাদশ শতকেই হয়েছে; তবে তা তাদের গ্রামের বা 'গাঁঞী'-এর নাম থেকে। উপাধ্যায় বলা হত তাঁদেরই যাঁরা অর্থ নিয়ে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন; যাঁরা অর্থমূল্যে বিদ্যা বিক্রয় করতেন না তাঁরা আচার্য।

এমন করেই, গ্রামের নাম থেকেই, সৃষ্টি হয়েছে ভট্টশালী, বটব্যাল, ঘোষাল, মৈত্র, লাহিড়ি প্রভৃতি।

কৌলিন্যের ভিত্তি পোক্ত করার জন্যই সৃষ্টি করতে হয়েছে রাজা আদিশূরের কাল্পনিক উপাখ্যান। রাজা আদিশূর নাকি বাঙলায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব দেখে কান্যকুব্জ থেকে পাঁচঘর ব্রাহ্মণ এনে তাঁদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে এসেছিল পাঁচঘর শূদ্রও। কিন্তু এই আদিশূর কে? ইতিহাসে তার কোনো উল্লেখ নেই। শূর বা স্ূর রাজবংশ একটা ছিল বটে দক্ষিণ রাঢ়ে একাদশ শতকে, কিন্তু সে বংশেও তো আদিশূর নামধেয় কোনো রাজার সন্ধান পাওয়া যায় না। তারপর তাঁরা তো সম্রাট্ বা গৌড়বঙ্গের স্বাধীন রাজাও ছিলেন না, হয়ত ছিলেন সামন্তরাজ। তাঁরা সহসা বাঙালী ব্রাহ্মণ-সমাজে একটা প্রবল পবিবর্তন-সাধনে তৎপর হবেন কেন? তাই, আদিশূরের কাহিনীটি অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধেয়। এসব রটনা কুলজি-পুঁথির যার রচনাকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক।

দ্বাদশ শতকের প্রসিদ্ধ লেখক হলায়ুধ লক্ষ্মণ সেনের রাজকর্মচারী, বোধহয় বিচারক। তিনি অবশ্য দুঃখ করে লিখেছেন যে বাঙালী ব্রাহ্মণেরা বেদবিদ্ নন, কিন্তু তিনি নিজেও তো তান্ত্রিকমতবাদী ছিলেন বলে কথিত। বাঙালী ব্রাহ্মণ বেদবিদ্ যে নয় তাতে আশ্চর্য হবার কি রয়েছে? সারাটা দেশই তো ছিল তান্ত্রিকপন্থী; বেদ,

উপনিষদ্ এদেশে কোনদিনই শিকড় গেড়ে বসতে পারেনি।• এমনকি বল্লাল ও লক্ষ্মণ উভয়েই তান্ত্রিকপন্থী ছিলেন বলে মনে করার কারণ রয়েছে। একাদশ শতকে অর্থাৎ বৌদ্ধ আমলে এ প্রবল স্রোত রোধ করার প্রচেষ্টার কাহিনী শূর বংশের মত একটি দুর্বল বংশের ভূপতির পক্ষে সম্ভবপর কি ?

এবার লক্ষ্মণ সেনের কথায় আসা যাক।

পূর্ব পরিচ্ছেদে শ্রীধর দাস সঙ্কলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থের কথা বলা হয়েছে। পুঁথিখানি লক্ষ্মণ সেনের অনুগ্রহ ও উৎসাহের ফলেই গ্রথিত হয়েছিল। এর মধ্যে দ্বাদশ শতকের প্রখ্যাত কবিদের কাব্যাংশেরই ছড়াছড়ি। এতে ৪৮৫ জন কবির রচিত ২৩৭০টি মনোজ্ঞ কবিতা সংগৃহীত রয়েছে। পুঁথিটি পাঁচ খণ্ডে বা প্রবাহে বিভক্ত— অমরপ্রবাহ, শৃঙ্গারপ্রবাহ, চাটুপ্রবাহ, অপদেশপ্রবাহ ও উচ্চাবচ-প্রবাহ। প্রবাহ কয়টির প্রত্যেকটি নানা বীচিমালায় বিভক্ত। অমর-প্রবাহে নানা দেবতার কথা, শৃঙ্গারপ্রবাহে প্রেম ও প্রেমিক-প্রেমিকার কথা, চাটুপ্রবাহে চাটুবাক্য বা খোশামোদের নানা রীতি, অপদেশ-প্রবাহে কিছু কিছু দেবতার কথা, আর তার সঙ্গে রয়েছে সেকালের নানা পশু, পক্ষী, পতঙ্গ ও ফুলের বিবরণ, উচ্চাবচপ্রবাহে নানাজাতীয় কাব্যাংশ। সবচেয়ে বেশী কাব্যাংশ রয়েছে শৃঙ্গারপ্রবাহে। সঙ্কলক যে বৈষ্ণবপন্থী তা তার কাব্যচয়নের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে।

লক্ষ্মণ সেনও কবি ছিলেন, বল্লালও। লক্ষ্মণ সেনের ছেলে কেশবও কাব্যচর্চা করতেন ; অর্থাৎ তাঁরা তিন পুরুষই সাহিত্যিক ও কবি। কিন্তু হয়ত লক্ষ্মণ ও কেশবের কঠোর রাজকার্যের পরিবর্তে কাব্যচর্চায়, বিশেষ করে শৃঙ্গারপ্রবাহে ডুবে যাওয়াই বাঙলার পক্ষে কাল হল।

কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করে নেওয়া যাক।

এখানে শৃঙ্গারপ্রবাহের রকমারি বিষয়বস্তুর একটি তালিকা দিচ্ছি। এর মধ্যে রয়েছে মুগ্ধা, প্রগণ্ডা (হয়ত কনুই থেকে কাঁধ

পর্যন্ত যার শোভা মনোহর), নবোঢ়া, অসতী, গুপ্তাসতী, বিদগ্ধাসতী, বেশ্যা, দাক্ষিণাত্যস্ত্রী, পাশ্চাত্ত্যস্ত্রী, গ্রাম্যা, ভ্রূ, নয়ন, কর্ণ, অধর, স্তন, নায়ক (অনুকূল, দক্ষিণ, অর্থাৎ এক নায়িকায় যে অনুরক্ত, শঠ, ধৃষ্ট অর্থাৎ অবিশ্বাসী, গ্রাম্য), মানী, বাদ্যম্, নৃত্যম্, গীতম্, দ্যূতম্, দৃষ্টি, কটাক্ষ, আলিঙ্গন, চুম্বন, বস্ত্রাকর্ষ, রতারম্ভ, রতম্, বিপরীতরতম্। অর্থাৎ নির্লজ্জ কামশাস্ত্রের অদ্বিতীয় সংস্করণ !

লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ ও কাব্যসঙ্গী ছিলেন মোটামুটি পাঁচজন ; এঁরা তাঁর পঞ্চরত্ন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা সন্ধিবিগ্রহিক উমাপতিধর, 'আর্য্যা সপ্তশতী'র রচয়িতা গোবর্ধন, কবি শরণ, 'পবনদূত' কাব্যের কবি ধোয়ী ও অমর কাব্য 'গীতগোবিন্দে'র কবি জয়দেব। এ ছাড়া ছিলেন হলায়ুধ ; তিনি মূলত বিচার-বিভাগের লোক হলেও কাব্যচর্চাও করতেন।

ধোয়ীর 'পবনদূত' দুরূহ মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখা—ভাষায় ও ভাবে হুবহু কালিদাসের 'মেঘদূতের' অনুসরণ বটে, তবে কাব্যমাধুর্যে তাঁর নিজস্ব ছাপও রয়েছে। কাব্যখানির উপজীব্য নায়ক লক্ষ্মণ সেনের দক্ষিণাপথ বিজয়ের কথা যা অবশ্য নিতান্তই কাল্পনিক ইতিহাস। কবি জয়দেবের সঙ্গে অবশ্য তাঁর তুলনা চলে না, তবু সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে ধোয়ীর বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।

গোবর্ধনও ত্রুটিবিহীন শৃঙ্গারকাব্য লিখতেন। জয়দেবের কথা পরে আসবে।

সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে উমাপতিধরের কাব্যাংশ রয়েছে পঁচাশিটি, জয়দেবের ত্রিশটি, ধোয়ী ও শরণের বিশটি করে, গোবর্ধনের ছয়টি, হলায়ুধের তিনটি, বল্লাল সেনের একটি, লক্ষ্মণ সেনের এগারটি, কেশব সেনের পাঁচটি।

অমরপ্রবাহে যেসব দেবদেবীর কথা রয়েছে তার মধ্যে প্রধান—সূর্য, শিব, ভৈরব, গৌরী, দুর্গা, কালী, গণেশ, কার্তিকেয়, গঙ্গা, বুদ্ধ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও রামচন্দ্র। অবশ্য এর মধ্যে সবকটিই শ্লে

বাঙলায় পূজিত হতেন তা নয়, তবু বাঙালী সমাজে যে এসব দেবদেবী পূজ্য বলে গৃহীত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

পালবংশের শেষ-জ্যোতিষ্ক রামপাল যে জনসাধারণের করভার লাঘব করেছিলেন তার সাক্ষ্য রয়েছে 'রামচরিতে'। বহির্বাণিজ্যে ভাঁটা পড়ে, তখন দেশ মোটামুটি কেবল কৃষির উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। খাজনা কমিয়ে দেওয়ায় চাষীর অবস্থাও হল কিছু সচ্ছল।

উদ্বৃত্ত ফসল রেখে দেওয়া হত গোলাজাত করে। বাঙলার আবহাওয়া আর্দ্র, তাই গোলা তৈরী হত বেদীর উপরে; অন্যত্র, যেখানে আবহাওয়া শুষ্ক তা তৈরি হত মাটির নীচে।

গোলার বাইরে থাকত মাটি ও গোবরের প্রলেপ; ভিতরে থাকত খড়ের আবরণ। ভিতরটা থাকত বেশ গরম—তাতে শস্য থেকে অঙ্কুরোদ্গম রোধ হত, আর ইঁদুর ও উইয়ের উৎপাত থেকেও শস্য রক্ষা পেত। বাইরের প্রলেপটি ছিল বর্ষার রক্ষাকবচ। বহুদিন গোলায় থাকলেও শস্যের আর কোনো পরিবর্তন ঘটত না, হয়ত রংটা একটু চটে যেত।

ইতিহাসের ইঙ্গিত যে, দ্বাদশ শতকে সেনদের রাজত্বকালে নিখুঁত-ভাবে জমিজেরাতের জরিপ হল, আর সে সম্পর্কে দলিল-দস্তাবেজ তৈরি হয়ে সবই গুপ্তযুগের 'পুস্তপালের' মত একজন দলিল-রক্ষকের দপ্তরে জমা রইল। মনে হয়, জমানবিসদের খরচ জোগাতে আর রাজস্ববৃদ্ধির জন্য জমাও বেড়ে গেল, বিশেষ করে অনুন্নত অঞ্চলে, অর্থাৎ বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম দেশে। তার ফলে সাধারণ গৃহীর অবস্থা হল অসচ্ছল।

বল্লালের আমলের পূর্বে গৃহস্থ ও চাষীদের সাময়িক ধার মিলত স্বর্ণবেণেদের কাছ থেকে। তাদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে সচ্ছল। কিন্তু বল্লালের বিদ্বেষ-দৃষ্টিতে পড়ে বৌদ্ধ বেণেদের কেউ কেউ হল দেশত্যাগী, কারো কারো হল ধনসম্পত্তির লাঘব। তাদের কেউ আর সাধারণ গৃহস্থ ও চাষীকে যথাযোগ্য ঋণ দিতে পারত না।

ফলে, কারো কারো মতে এই দ্বাদশ শতক থেকেই কুসীদজীবী এল বাঙলার বাইরে থেকে—রাজস্থানী ও গুজরাটী।

এরা ভারতবর্ষের সনাতন ব্যবসায়ীর জাত। যে বিজয়সিংহকে 'হেলায় লঙ্কা-জয়ী' বলে বাঙালী এখনো গর্ব করে, তিনি গুজরাটী—বাঙালী নন। গুজরাটের সঙ্গে লঙ্কার বহির্বাণিজ্য বহুকালের। বস্তুত বাঙালীর বিত্ত-ঐশ্বর্য হয়েছিল বহির্বাণিজ্যের ফলেই—বাঙালী তা বেমালুম ভুলে গিয়ে আয়াসের জীবন ছেড়ে বহুকাল ধরে সুখের দাসত্ব ও আয়েশের জীবন খুঁজে মরছে।

কুসীদজীবীর চাহিদা সমাজে বৃদ্ধি পেল ক্রমে ক্রমে—আফগান ও মোগল আমলে, এবং তা চরমে উঠল ইংরেজ আমলে। তার কারণও হল ভূমিসংস্কারের চেষ্টা।

মোটের উপরে সেনদের রাজত্বকালে প্রজা হল আরো দরিদ্র। মুদ্রার নিম্নতম মান ছিল কড়ি—ধাতব মুদ্রার কোনো চিহ্ন এখনো পাওয়া যায়নি। পাল আমলের মাত্র তিনটি তামার পয়সা পাওয়া গেছে।

সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে এই দারিদ্র্যের চিহ্ন কিছু রয়েছে, উচ্চাবচ-প্রবাহে। সে প্রবাহে স্থান পেয়েছে দরিদ্র গৃহী, দরিদ্র গৃহিণী আর দরিদ্র গৃহ। বসুকল্পের দরিদ্র গৃহী বলছেন 'দারিদ্র্যান্মরণং বরম্' অর্থাৎ দারিদ্র্যের চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়, একজন অজ্ঞাত কবির 'দরিদ্র গৃহিণী'র গণ্ডদেশ দিবারাত্র অশ্রুপাতে মলিন। এবং আরো একজন অজ্ঞাত কবির দরিদ্র গৃহের বর্ণনা :

> "চলৎকাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণসংচয়ম্।
> গণ্ডুপদার্থি-মণ্ডূককীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম ॥"

অর্থাৎ আমার ঘরের খুঁটি (কাঠ বা বাঁশের থাম) নড়নড়ে, তৃণাচ্ছাদিত চালের ফুটো দিয়ে জল চোঁয়াচ্ছে, ভেকের দল পোকা-মাকড়ের সন্ধানে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বাঙলার দরিদ্র গৃহের হুবহু বর্ষার চিত্র; সেকালেও যা এ কালেও তাই!

বাঙলার কবি বিদ্যাকর-এর 'শুভাষিত-রত্নকোষ' একাদশ-দ্বাদশ শতকে সংকলিত হয়েছিল। পুঁথিখানি এখনো দুষ্প্রাপ্য; এখানি পুনঃসংকলিত ও সহজলভ্য হলে সেকালের বাঙলার কথা আরো জানা যাবে।

শৃঙ্গারপ্রবাহে 'বাদ্যম্ নৃত্যম্ গীতম্' কথা-তিনটি রয়েছে। বস্তুত একাদশ ও দ্বাদশ শতকে, বিশেষ করে দ্বাদশ শতকে এ তিনটিরই সমাজে বহুল প্রচলন ছিল। প্রধানত নৃত্য। তার কারণ হয়ত দক্ষিণাপথ থেকে মন্দিরে মন্দিরে 'সেবাদাসী' প্রথার উড়িষ্যায় অনুপ্রবেশ, ক্রমে বাঙলায়। গৃহস্থবধূও এর ফলে প্রায় নটী হয়ে ওঠল, তার প্রমাণ রয়েছে 'সেক-শুভোদয়া'র বিদ্যুৎপর্ণার চরিত্রে। সে কথায় পরে আসা যাবে।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের অনুশাসন মেনে পুরুষেরা এই নৃত্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাদ্যযন্ত্রে সংগত করতেন। বিদ্যুৎপর্ণার 'সুহৈ' রাগ মানুষকে সম্মোহিত করে দিত। এ 'সুহৈ' রাগের অধুনাতন সংস্করণ সূহা বা সূহা-কানাড়া। 'ভাটিয়াল' ও 'ভাটিয়ালী' রাগও এক নয়; ভাটিয়াল বাঙলা দেশের রচিত নিজস্ব কায়দার 'বংগাল' রাগ; ভাটিয়ালী পূর্ববঙ্গের নৌকার মাঝিশ্রেণীর অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও ভাবময় লোকগীতি। বাদ্যের ফিরিস্তি মোটামুটি একাদশ শতকের কাহিনীতেই বলা হয়েছে।

'দাক্ষিণাত্য' ও 'পাশ্চাত্ত্যে'র স্ত্রীর কথাও শৃঙ্গারপ্রবাহে বলা হয়েছে। দেশের রাজা দক্ষিণাপথের লোক, তার উপর দক্ষিণাপথের মেয়েরা নৃত্যগীতপটীয়সী। কাজেই অনেক বাঙালী যে সে-সব মেয়ে বেশী পছন্দ করবে তাতে সন্দেহ কি? স্বয়ং জয়দেবের স্ত্রী পদ্মাবতীও তো জগন্নাথ-মন্দিরের সেবাদাসী ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা

কি কান্যকুব্জ বারাণসী প্রভৃতির সঙ্গে যোগযোগ রেখে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করতেন পাশ্চাত্ত্যের স্ত্রী গ্রহণ করে ?

'সেক-শুভোদয়া' পুঁথিখানি লক্ষ্মণ সেনের আমলে তাঁরই সভাসদ্ হলায়ুধের লেখা বলে দাবী করা হয়েছে। নানা কারণে এ দাবি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য বলে মনে হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে পুঁথিখানি লেখা বা সঙ্কলিত হয়েছে চতুর্দশ শতকে, হয়ত বা পঞ্চদশ শতকে। এ পুঁথির মধ্যে রয়েছে বহু আখ্যায়িকা—লক্ষ্মণ সেনের পূর্বের আমলের অথবা লক্ষ্মণ সেনের আমলের অথবা লক্ষ্মণ সেনের কালের। এগুলি সবই প্রবাদ থেকেই সংগৃহীত বটে, তবে তাদের ঐতিহাসিক মূল দৃঢ়, কারণ সে মূলের বিস্তৃতির চিহ্ন নানা ঐতিহাসিক সূত্রেও মেলে।

আমরা তাই সেগুলিই মাত্র দ্বাদশ শতকের আমলের বলে ধরে নিয়ে, চতুর্দশে 'সেক-শুভোদয়া'র বাকি আখ্যানভাগের পরিচয় দেব।

প্রথম আখ্যানে, বিদ্যুৎপর্ণার 'সুহৈ' রাগ সম্পর্কে। এ প্রবাদটির কাল যে আরো প্রাচীন, হয়ত নবম শতকের, তার পরিচয় রয়েছে পৌণ্ড্রবর্ধনের, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরের ভূমিগর্ভে প্রোথিত একটি ভাঙ্গাচোরা মন্দিরের গা থেকে। এ আলেখ্যে দেখানো হয়েছে, মা কুয়া থেকে জল তুলতে গিয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে জলতোলা ঘড়ার বদলে ছোট্ট ছেলেকেই দড়ি বেঁধে কুয়ায় ফেলে দিয়েছে। বিদ্যুৎপর্ণার 'সুহৈ' রাগের আখ্যানেও সেই প্রবাদেরই পুনরুক্তি; তবে এক্ষেত্রে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে মুসলমান দরবেশের অর্থাৎ 'সেক'-এর কেরামতির কথা। সেটুকু এই যে, শিশুটি জলমগ্ন হয়ে হতপ্রাণ হলেও, তাকে সেকের নির্দেশ অনুসারে পা ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে সে পুনর্জীবন ফিরে পেয়েছে। অধুনাকালেও অবশ্য জলমগ্ন মানুষের সঞ্জীবনী হিসাবে এ প্রক্রিয়ার প্রচলন রয়েছে।

অন্য আখ্যান কয়টির দু'টি পালসূর্য রামপাল সম্পর্কে। একটিতে বলা হয়েছে তাঁর অপূর্ব ন্যায়পরায়ণতার কথা। সতীত্বনাশের অভিযোগ প্রমাণিত হবার ফলে তিনি তাঁর পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত

করেন—এর বিপক্ষে নানাদিক থেকে রাশি রাশি সাক্ষ্য-সুপারিশ সত্ত্বেও তিনি তাঁর ন্যায়োচিত পথে অবিচলিত রইলেন।

তাঁর সংসার-নির্লিপ্ত মনে যে আসক্তি ছিল না তার প্রমাণ রয়েছে শেষবয়সে তাঁর স্বেচ্ছায় গঙ্গায় আত্মবিসর্জনে। এরূপ মহাপ্রয়াণ সেকালে বেশ প্রচলিত ছিল।

এরই পাশে 'সেক-শুভোদয়া'য়ও, এক শতক পরবর্তী লক্ষ্মণ সেনের যে চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে তা থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শতকের মধ্যে বাঙালী-চরিত্রের নিদারুণ অধোগতির কথা কল্পনা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। এর কারণ জনসাধারণের নৈতিক চরিত্রের চরম অবনতি। কেন? সে কথার অবতারণা করা হয়েছে এ পরিচ্ছদেরই প্রথম দিকে, পূতিগন্ধময় ত্রিস্রোতা সামাজিক নরদমার কথায়; তার সঙ্গে জুড়ে দেব আরো একটি স্রোতের কথা।

চতুর্থ উপাখ্যান লক্ষ্মণ সেনের নিজের সম্পর্কে। লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে তাঁর সভাসদ্ উমাপতিধরের বিবাদ-বিসংবাদের কথা সর্বজন-বিদিত। এর কারণ লক্ষ্মণের উপপত্নী নিচুজাতীয়া বল্লভা। মহারাজের যে বহু উপপত্নী ছিল তাতে সন্দেহ নেই, তার মধ্যে প্রধান নীচকুল-জাতা এই মহিলাটি; এর দাপট ও লক্ষ্মণের উপর এর প্রভাব ছিল অপরিসীম। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ প্রভাবকে চরম হেয় চোখে দেখতেন—রাজার কলঙ্ক ও রাষ্ট্রের অনিষ্টকর বলে। লক্ষ্মণ সেনের ছিল বহু উপপত্নী; শুধু রাজার নয়, তথাকথিত সম্ভ্রান্ত পরিবারেও এ নিয়ম ছিল যুগধর্ম হিসাবে। ধর্মপত্নীদের তুলনায় উপপত্নীরা যে সমাজে হেয় ও অবজ্ঞাত ছিল তা বলা চলে না। লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে উমাপতিধরের বল্লভা নিয়ে যে মনকষাকষি, তা ঐতিহাসিক সত্য। বল্লভাও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি ছিলেন পরম বিরূপ।

এ ছাড়া রাজা ও মন্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল পরদারিক। পরদারগমন তখন যে সমাজে চরম নিন্দার্হ, তাতে যে শুধু জাতি-পাতই ঘটে তা নয়, আইনের মধ্যে যে তার জন্য কঠোর শাস্তিমূলক

ব্যবস্থা একালে বর্তমান, তার কোনো ইঙ্গিতই 'সেক-শুভোদয়া'র উপাখ্যানগুলিতে দেখা যায় না। এ সামাজিক শৈথিল্য সেকের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই তার মুখে শোনা গিয়েছে—

"যত্র রাজা চ মন্ত্রী চ দ্বাবপি পারদারিকৌ।
তস্য রাষ্ট্রবিনাশঃ স্যাৎ সংশয়ো নাত্র বিদ্যতে॥"

যে দেশে রাজা ও মন্ত্রী উভয়েই পরদারের প্রতি অনুরক্ত, সে রাষ্ট্রের বিনাশ যে অবধারিত তাতে সংশয় নেই।

নিচুজাতীয়া বল্লভার ব্যবহার ব্রাহ্মণ-সমাজের চোখে ছিল অবমাননাকর। তাঁরা রাজার এই অপ্রীতিকর উপপত্নী-অনুরক্তির ফলে নদীয়া বা বিজয়নগর ছেড়ে অন্যত্র যেতে শুরু করলেন। সেনদের বিক্রমপুরে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপনের পর, রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরা বঙ্গে যেতে শুরু করেছিলেন ; ক্রমে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। কায়স্থ করণ-শ্রেণীর লোকেরা, অর্থাৎ যারা রাজাদের দপ্তরে লেখা-পড়ার কাজ করত তাদেরও কিছু কিছু ওদেশে গিয়ে হাজির হল। এই বাসস্থানের নাম অনুসারেই তারা হল বঙ্গজ কায়স্থ।

বরেন্দ্রভূমে যে ব্রাহ্মণেরা বাস করতেন তাঁরা হয়ে রইলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, যাঁরা রাঢ়ে বা রাঢ় থেকে বঙ্গে গেলেন তাঁরা রইলেন রাঢ়ী। যাতায়াতের অসুবিধার জন্য বারেন্দ্র ও রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈবাহিক ব্যাপার ও সামাজিক আদান-প্রদান এল কমে ; এবং পরবর্তী কালে, ক্রমে বিশেষত ঘটকদের কারসাজিতে সারা বাঙলার প্রধান দুটি ব্রাহ্মণ-সমাজ আত্মঘাতী ও অবাঞ্ছিত রেষারেষির জালে বদ্ধ হয়ে পড়লেন। নইলে বারেন্দ্র ও রাঢ়ী ব্রাহ্মণের মধ্যে সমাজগত কি পার্থক্য রয়েছে বা থাকতে পারে ?

নবদ্বীপ ছেড়ে ব্রাহ্মণদের দেশ পরিত্যাগকে লক্ষ্য করে 'সেক' বলেছেন :

"আশা ধৃতিং হন্তি সমৃদ্ধিমন্তকঃ,
ক্রোধঃ শ্রিয়ং হন্তি যশঃ কদর্যতাম্।

অপালনং হন্তি পশুংশ্চ রাজন্,
একঃ ক্রুদ্ধো ব্রাহ্মণো হন্তি রাষ্ট্রম্ ॥"

অর্থাৎ, আশা ধৈর্যকে নষ্ট করে, মৃত্যু করে ঐশ্বর্যকে। ক্রোধ স্বভাব-'শ্রী'কে করে বিকৃত, গৌরব ও যশোলাভ করলে কুরূপও সুরূপে পরিণত হয়। হে রাজন্! যথোচিত যত্নের অভাবে গৃহপালিত জন্তুর বিনাশ ঘটে। একজন ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ একাই একটা রাজ্য ধ্বংস করতে পারে।

শেষের চরণটির মধ্যে দৃশ্যত অতিশয়োক্তির কথা ছেড়ে দিলেও দ্বাদশ শতকে ব্রাহ্মণের কদর ও মর্যাদা যে বৃদ্ধি পেয়েছিল তার প্রমাণ অতিশয় স্পষ্ট। কারণটাও সুবোধ্য; সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্যের ভিত্তিতেই বাঙালী সমাজের সংস্কার করতে চেয়েছিলেন নিম্নকোটির বিপুল জনতাকে দূরে অপাঙ্‌ক্তেয় ও প্রায় অস্পৃশ্য করে রেখে।

রামপালের সঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের চরিত্রের তুলনা করলে, একাদশ ও দ্বাদশ শতকের বাঙালী সমাজের একটু পরিচয় পাওয়া যাবে। যে-যুগে অশীতিপর বৃদ্ধ নৃপতি তখনো শৃঙ্গারানুরক্ত, তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গেরা নিখুঁত শৃঙ্গার-কাব্য রচয়িতা, ঘরে ঘরে ব্যভিচার ও নৃত্যগীতের অর্থাৎ তথাকথিত 'আর্টে'র পর্যাপ্ত সমাবেশ, নির্যাতিত বণিক্-সমাজ বহির্বাণিজ্যে পরাঙ্মুখ, তাদের মধ্যে কেহ দেশত্যাগী, কেহ বা শৃঙ্গার-ধর্মীতে পর্যবসিত, সংকীর্ণ জাতিভেদ-প্রথা যে যুগে ধর্ম-সংস্কারের ভিত্তি, সে-যুগের বাঙালী সমাজ যে একাধারে দুর্বল, আত্মবিশ্বাসহীন, অকর্মণ্য, বাক্‌সর্বস্ব ও দেশের স্বাধীনতা-রক্ষায় অসমর্থ হবে তাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু এ ছাড়াও, একাদশ শতকের বাঙালী সমাজে দৃষ্টিভঙ্গীর একটা মূলগত প্রভেদ এসে পড়ল। আমরা এখন সে কথায় আসছি। কথাটা রাধাকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক ভক্তিবাদ নিয়ে।

উপনিষদের পাতায় ভক্তিযোগের কথা থাকলেও শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাকেই আশ্রয় করে ভারতবর্ষের সর্বত্র এর সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়েছে।

গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় থাকলেও, ভক্তিযোগের আদর্শকে শ্রেষ্ঠত্ব না হোক বৈশিষ্ট্য দান করেছে, সন্দেহ নেই। এজন্য বৈষ্ণব-সমাজ গীতাকে ধর্ম-ব্যাখ্যায় সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান গ্রন্থ বলে সম্মান করে।

ভাগবতপুরাণ রচিত হয় নবম বা দশম শতকে। এ পুঁথিটির জন্মস্থান দক্ষিণাপথ—সে দেশের বৈষ্ণব-পন্থী আড়বার সম্প্রদায়কে আশ্রয় করে এই আবেগময় ভক্তিবাদের প্রসারলাভ ঘটে। প্রকৃত ভক্ত বৈষ্ণব-চরিত্রের বর্ণনায় যে শ্লোকটি ব্যবহৃত হয় তা প্রায় সর্বজনবিদিত :

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

অর্থাৎ, যিনি তৃণের চেয়ে নিচু থেকে (অর্থাৎ সর্বপদদলিত হয়েও), বৃক্ষ থেকেও সহিষ্ণু হয়ে, মানহীনকেও সম্মান দেখিয়ে সর্বদা হরিনাম করেন, তিনিই বৈষ্ণব।

অষ্টম বা নবম শতকে শ্রীশঙ্করাচার্য যখন তাঁর অদ্বৈত বেদান্ত প্রচার করে ভক্তিবাদকে নির্মূল করতে ব্যস্ত, তারও বহুপূর্ব থেকে দক্ষিণাপথের এই আড়বার সম্প্রদায়-এর মূল দৃঢ় করে ফেলেছিলেন শুধুমাত্র আবেগ দিয়ে। ক্রমে শ্রীশঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের যুক্তির বিরুদ্ধে বৈষ্ণব আচার্যগণ নানা দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি করেন। এই দার্শনিক মতবাদের স্রষ্টাদের সম্প্রদায়গতভাবে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা চলে ; 'শ্রী' সম্প্রদায়, 'ব্রহ্ম' সম্প্রদায়, 'সনকাদি' সম্প্রদায়, 'রুদ্র' সম্প্রদায় ও 'গৌড়ীয়' সম্প্রদায়। এই 'শ্রী' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নাথমুনি এবং এর শ্রেষ্ঠ আচার্যদের অন্যতম রামানুজ। দক্ষিণাপথের শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরই এঁদের প্রধান কেন্দ্র। রামানুজ একাদশ শতকের মানুষ। তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মে 'গোপীজনবল্লভ গোপালকৃষ্ণে'র কথা ছিল না। এঁর ভক্তিবাদ প্রধানত আচার-নিষ্ঠামূলক উপাসনা—জাতিভেদ-প্রথা-ভিত্তিক।

রামানুজের তিরোধানের পরে, সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকে 'শ্রী' বৈষ্ণব সমাজ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এ বিভাগ আদর্শগত। একদল বলেন, ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেম জন্মে তার তুলনা চলে শুধু বাঁদর ও তার বাচ্চার ব্যবহারে। মর্কট-শাবক কোনোক্রমেই মাতৃক্রোড় ছাড়ে না; বাঁদরটি যতই লাফাক ঝাঁপাক, বাচ্চাটি জাপটিয়ে মাকে ধরে থাকে, তাকে কিছুতেই ছাড়ে না। একে বলা হয় 'মর্কট-ন্যায়'। অপরপক্ষে, অন্যদল বলেন ঈশ্বরপ্রেমের তুলনা মিলে বেড়াল ও তার বাচ্চার ব্যবহারে। বাচ্চাকে তার মা ঘাড় কামড়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যায়; বাচ্চা মাকে আঁকড়ে থাকতে কোনো চেষ্টা করে না। একে বলে, 'মার্জার-ন্যায়'। অর্থাৎ এর মধ্যে থাকে চরম আত্মনিবেদনের কথা। এই 'মার্জার-ন্যায়' দলের ভক্তেরা আর জাতিভেদের উপর তেমন জোর দেয়নি। 'মাধ্ব' ও 'ব্রহ্ম' সম্প্রদায়ের জন্মও হয়েছে দক্ষিণাপথে।

'সনকাদি' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য। এঁর জন্ম দাক্ষিণাত্যেই বটে, কিন্তু জীবনের বেশির ভাগ কাটে শ্রীবৃন্দাবনে। তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে 'রাধাকৃষ্ণে'র আরাধনাই প্রধান। 'শ্রী' সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা বিষ্ণু-নারায়ণ, আর তাঁর শক্তি তিনটি- 'শ্রী', 'ভূ' ও 'লীলা'। কিন্তু 'সনকাদি' সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা গোপীজনবল্লভ গোপালকৃষ্ণ ও তাঁর শক্তি রাধিকা। মথুরায় ও বাঙলায় এই সম্প্রদায়ের ভক্তদের বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

নিম্বার্কের কয়েক শতক পরে, ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে, অন্য যে দু'জন বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারকের জন্ম হয়েছে তাঁদের মধ্যে বল্লভাচার্য 'রুদ্র' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম, আর মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের। বল্লভাচার্য ধর্মপ্রচার করেন পশ্চিম ভারতবর্ষে, আর মহাপ্রভু প্রধানত বাঙলা দেশে ও উড়িষ্যায়। বল্লভাচার্য দক্ষিণাপথের মানুষ হলেও তাঁর উত্তরাধিকারিগণ এসে বসবাস করেন গোকুলে, মথুরার কাছে। এঁরাই গোকুল-গোঁসাইজী

শিষ্যগণের চোখে শ্রীকৃষ্ণতুল্য। এঁদের প্রধান কেন্দ্র ও মন্দির বা 'আখড়া' উদয়পুরের কাছে নাথদ্বারায়, বিগ্রহ শ্রীনাথজী। অর্থশালী বণিক্‌সমাজে এঁদের বিশেষ প্রতিপত্তি।

মহাপ্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাণস্বরূপ হলেও, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের বন্যার স্রোত বাঙলায় তাঁর বহুপূর্বেই প্রবাহিত হয়েছিল। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িকা শক্তি।

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে বাঙালীর চরিত্রে যে মূলগত পরিবর্তন ঘটল, আর মহাপ্রভুর কালে যার পরিণতি হল, তারই পটভূমিকা-রূপে বৈষ্ণব সমাজের এ ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে বলা হল। পাঠক-সাধারণের কাছে হয়ত একে অবান্তর বলে মনে হবে না।

এবার এল সে যুগের, শুধু সে যুগের কেন বাঙলার সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ গীতগোবিন্দের কথা।

কিন্তু মূলকথা বলার পূর্বে একটু বিশেষ ভূমিকার প্রয়োজন। সে ভূমিকাটুকু নিবেদন করব জোড়হাতে, কারণ এক্ষেত্রে প্রতিপদে অনর্থ-সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে হয়ত অনেকেরই মতের অমিল থাকবে, তবে বক্তব্যটি যে কোনো দুরভিসন্ধিজাত নয় সেটুকু বুঝলেই আমরা কৃতার্থ।

প্রথমেই বলে রাখি আমাদের কথা সামাজিক; এতে তাত্ত্বিক বিচার বা কাব্য-বিচারের স্থান নেই। আমাদের মতে, কাব্যের মূল্য শুধু তার আর্টের বিচার নয়, তার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-বিচার তো নয়ই, দেশের সজীব মানুষের উপর তার সহজবোধ্য, স্বাভাবিক ও আদর্শগত ভাবধারার সৃষ্টি ও প্রভাবের দিক্ থেকে। মহাকাব্যে আমরা যা দেখি, ধরা যাক রামায়ণে ও মহাভারতে, বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত কোন্ বিষয়ের অভাব রয়েছে? কিন্তু মূলগ্রন্থের আদর্শগত ভাবধারা সমাজকে অর্থাৎ জাতিকে শুধু চিরন্তন রস নয়, অফুরন্ত প্রাণধারায় সঞ্জীবনী-শক্তি দান করে চলেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যা শক্তি দান করে তাই পুণ্য; যা

দুর্বলতা আনে তা-ই পাপ। জাতীয় মানসে যা দুর্বলতা আনে, যা বুদ্ধিকে বিকৃত করে তোলে, যা মেধাকে হ্রাস করে দিয়ে মনকে ইতর-ধর্মে প্রবণতা জোগায় তার সম্পর্কে সচেতন না থাকলে জাতির পতন অনিবার্য। কাব্য, সাহিত্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য অর্থাৎ আমরা যাকে চলতি ভাষায় আর্ট বলি, সবই সৃষ্টি হয় জাতীয় মানসের উৎকর্ষের জন্য। দেহের সম্পর্কহীন মনের কল্পনা যেমন অবাস্তব ও অসম্ভব, জাতীয় মানসের অসংস্পৃষ্ট কাব্য বা সাহিত্য-বিচারও তেমনি অসার ও অর্থহীন।

তাই সামাজিক বিচারে শ্রীগীতগোবিন্দের 'মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী' নিছক কামকেলির বিবরণ মাত্র। এ কেলির নির্লজ্জতা এত স্পষ্ট ও প্রখর যে আধ্যাত্মিকতার ফুলদল দিয়ে তা সাধারণ জনের চোখের আড়াল করা অসম্ভব। তার সঙ্গে জুটেছে এর সুললিত ছন্দোবদ্ধ ভাষা—যে ভাষা বাঙলা ভাষার মতই মেয়েলী, কান্ত-সম্বিত হয়ে পড়ার দিকেই তার ঝোঁক, সংস্কৃতের মত পুরুষালি ভাষা নয়।

এই বিজন কেলির শুরু : 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।' অর্থাৎ মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে তমালতরুসমূহে শ্যামল বনভূমি, কাল রজনী, হে রাধে, এখান থেকে ভীরু কৃষ্ণকে নিয়ে গৃহে বা বিলাসকুঞ্জে যাও। কৃষ্ণ ভীরু, কেননা পূর্বরাত্রে তিনি অন্য নায়িকার সঙ্গে কেলি করেছেন।

কেলির শেষ হয়েছে দ্বাদশ সর্গে রতিশেষে যখন—

"ব্যালোলঃ কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ স্বেদলোলৌ কপোলৌ
ক্লিষ্টা দষ্টাধরশ্রীঃ কুচকলসরুচা হারিতা হারযষ্টিঃ।
কাঞ্চী কাঞ্চিদ্‌গতাশাং স্তনজঘনপদং পাণিনাচ্ছাদ্য সদ্যঃ
পশ্যন্তী সত্রপং মাং তদপি বিলুলিতস্রগ্ধরেয়ং ধিনোতি।"

শ্রীরাধার কেশপাশ আলুলায়িত, পার্শ্বের বা সমুখের কেশগুচ্ছ উলট-পালট হয়েছে, কপাল বা গাল ঘামে ভরা, ঠোঁটে কামড়ের

দাগ, গলার মালা নিষ্পেষিত, কটিভূষণ স্থানচ্যুত, মর্দিত স্তনের শোভায় গলার হার হার মেনেছে। রাধা এই বেশে হাত দিয়ে স্তন উরু দুটির মধ্যবর্তী স্থান ও পাছা ঢেকে তখনো কৃষ্ণের দিকে সলজ্জ দৃষ্টিপাত করছেন।

এবার কৃষ্ণের রূপটি চিন্তা করুন।

"চন্দনচর্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী।
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী ॥
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে ॥"

বনমালীর পরনে হলদে কাপড়, নীল দেহ শুভ্র চন্দনে চর্চিত, কানে মণিময় কুণ্ডল দোলানো এবং ঈষৎ হাসিতে গাল দু'টি সে কুণ্ডলের শোভায় শোভন। কামমত্তা, মুগ্ধ-বধূকুলকে নিয়ে হরি কেলিবিলাসে মগ্ন হয়েছেন।

হরি কি করছেন ?

"শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্।
পশ্যতি সস্মিতচারুপরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্ ॥"

হরি কাউকে আলিঙ্গন করছেন, কাউকে চুম্বন করেছেন, কারো সাথে কামক্রীড়া করছেন, কারো প্রতি সস্মিত অপাঙ্গদৃষ্টি দিচ্ছেন আর মানভঞ্জনের জন্য কারো কারো পিছু নিয়েছেন।

আর মানভঞ্জনের শ্রেষ্ঠ উপায় :

"স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদপল্লবমুদারম্ ;
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিত-বিকারম্ ॥"

হে প্রিয়ে! কামবিষের নাশক আমার শিরোভূষণ তোমার ওই দুটি সুঠাম চরণ আমার মাথায় নিতে দাও। আমার চিত্ত মদনানলে দগ্ধ—তোমার পদস্পর্শে তার জ্বালা জুড়াক।

কামোন্মত্ত নায়কের পক্ষেও হয়ত একটু বাড়াবাড়ি—তাই 'দেহি

পদপল্লবমুদারম্' পদটি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই পূরণ করে দিতে হয়েছে !

গীতগোবিন্দের আশিটি শ্লোক ও চব্বিশটি গীত একে অন্যের সাথে পাল্লা দিয়ে সার্থক শৃঙ্গার-রসের সৃষ্টি ও পুষ্টি করেছে।

ভক্তমাল গ্রন্থে নাভাজীদাস একে 'কোককাব্য নবরস সরস শৃঙ্গার কৌ আগর' অর্থাৎ কোক বা কামশাস্ত্র কাব্য নবরস ও সরস শৃঙ্গারের আগার বলে অভিনন্দিত করেছেন।

কি কুক্ষণেই না নিম্বাদিত্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনার প্রবর্তন করেন! তিনি ও তাঁর মতাবলম্বীরা অবশ্য রাধাকে কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী বলে উপাসনা করতেন; পরবর্তী কালে মহাপ্রভু হয়ত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভবের প্রারম্ভে তা-ই মানতেন, কিন্তু তাঁর শিষ্যসেবকের দল তাতে সন্তুষ্ট রইলেন না; রাধা স্বকীয়া থেকে পরকীয়ায় পরিবর্তিত হল। নইলে কি শৃঙ্গার রস জমে? হয়ত এ পরিবর্তন ঘটল তান্ত্রিক মতের পঞ্চ'ম'কার সাধনের সংস্পর্শে।

হিন্দু পুরাণের মতে কিন্তু কামদেব শ্রীকৃষ্ণেরই পুত্র, রুক্মিণীর গর্ভজাত। মদনভস্মের পরে কামদেবের পত্নী রতির কাতর প্রার্থনায় মহাদেবেরই বরে তার পুনর্জন্ম ঘটে প্রদ্যুম্নরূপে। অবশ্য এ সম্পর্কে ভিন্ন উপাখ্যানও রয়েছে।

তাত্ত্বিক বিচারে কি গীতগোবিন্দের এ নগ্ন শৃঙ্গার-রূপের কোন গভীর দার্শনিক তত্ত্ব বের করা চলে না? হয়ত চলে; পঞ্চ'ম'কার সাধনার মূলে কি কোনো দার্শনিক তত্ত্ব নেই? তা রয়েছে। কিন্তু এ সব দার্শনিক তত্ত্ব সাধারণ জনের জন্য নয়। তারা এসব তত্ত্বের জগতে প্রবেশ করতে চায় না—সহজ সূত্র ধরেই তাদের গতায়াত। মোটের উপর, দ্বাদশ শতকে লক্ষ্মণ সেনের শৃঙ্গার-রস-রসিক-সমাজে গীতগোবিন্দের কদর হয়েছিল মূলত আদিরসের প্রস্রবণ হিসাবেই।

গীতগোবিন্দের প্রচার ও প্রসার যে ভারতবর্ষের বহুদেশে ঘটেছিল তার নানা কারণের মধ্যে অন্যতম এর শৃঙ্গার-ধর্ম ও কান্ত-কোমল

পদাবলী। এর পূর্বশতকে গোপীচন্দ্রের গানও ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিশেষ আদর পায়; সঙ্গে সঙ্গে গোপীযন্ত্রও। গোপীযন্ত্র তৈরি হত লোহা, বাঁশ ও লাউয়ের খোল দিয়ে। এসব থেকেই হয়ত বাঙালীর কবি-প্রসিদ্ধির সূত্রপাত হয়েছে।

দেখা যায়, গীতগোবিন্দের কালে বুদ্ধদেবকে হিন্দুরা একেবারে দশাবতারের অন্যতম করে নিয়েছে।

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব, ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে॥"

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! যজ্ঞে পশুহনন দেখে তোমার মনে যে করুণার উদ্ভব হয়েছিল তার ফলে তুমি এ যজ্ঞবিধির মূল শ্রুতির অর্থাৎ বেদের নিন্দা করেছিলে। হে বুদ্ধ রূপধারী দেব, তোমার জয় হোক।

এ রূপান্তর ঘটেছে অবশ্য অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই। বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্রটির উদ্দেশ মেলে উপনিষদেরই পাতায়। উদাহরণস্বরূপ বৃহদারণ্যকের কথাই ধরা যাক:

"জগতে মানুষের মন আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ। তাদের চিন্তা সে আকাঙ্ক্ষারই অনুসরণ করে; তাদের কার্যকলাপ অনুসরণ করে সে চিন্তার। তাদের পুনর্জন্ম ঘটে সে কার্যকলাপেরই ফলে অর্থাৎ, বিচার করলে দেখা যাবে, তাদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষার ফলেই।"

অর্থাৎ এ আকাঙ্ক্ষার নিঃশেষ পরিসমাপ্তি ছাড়া আর জন্মমৃত্যুচক্র রোধের দ্বিতীয় উপায় নেই। এই আকাঙ্ক্ষার আত্যন্তিক নিবৃত্তির কথাই প্রচার করেছেন বুদ্ধ।

বুদ্ধ বহু প্রাচীনকালেই দশাবতারভুক্ত হয়েছেন—গীতগোবিন্দের কালের বহু পূর্বে। তখন তাঁকে 'শান্তাত্মন্' বা 'শান্তমন' বলা হত।

একাদশ শতকের শেষপাদেও বাঙালীর চরিত্রে যে দৃঢ়তা ছিল তা লোপ পেল দ্বাদশ শতকে। বাঙালী হয়ে পড়ল মূলত শৃঙ্গারধর্মী।

যেখানে অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা কেবল শৃঙ্গার-কাব্য, নৃর্ত্য, গীত বা বাদ্যের ব্যসনমত্ত, সে দেশের সমাজে আর কি আশা করা যায়? হিন্দুত্বের প্রসারের জন্য সেনরাজাদের অক্ষম প্রচেষ্টায় বৌদ্ধদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরল, বৌদ্ধ-চরিত্রের কর্মপ্রবণতা হল অন্তর্হিত। বৈষ্ণবী ভক্তিবাদ তামসিকতার রূপে জনসাধারণকে গ্রাস করতে শুরু করল। বহির্বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হওয়ায় দেশ ক্রমশ দরিদ্র হতে লাগল।

ওদিকে বাঙালী জাতির অন্ত্যজ আখ্যাধারী যে বহুলাংশ, তারা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই পড়ে রইল। নানা কারণে তাদের মধ্যে তুকতাক ও তান্ত্রিক সাধুদের কেরামতির প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল এবং শ্মশানে, মশানে ও নানাশ্রেণীর তান্ত্রিক সাধুদের আস্তানায় তাদের শিষ্যসেবকদের আনাগোনা বেড়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে নানা অবাঞ্ছিত ও ইতর রীতির প্রচলন হল।

দেশের যখন এমনি বিকারগ্রস্ত অবস্থা তখন হল সহসা পট-পরিবর্তন। তুর্কী হামলাদার এসে বাঙলায় ঢুকল উত্তর-পশ্চিম দুয়ার দিয়ে, কিন্তু সদর দুয়ার দিয়ে নয়। যে দুয়ার দিয়ে এসে গঙ্গা ঢুকেছে বাঙলায় অর্থাৎ আধুনিক রাজমহলের (কাজঙ্গলা) অনুচ্চ পর্বতের সংকীর্ণ পাদদেশ তা-ই হল সদর দুয়ার, কিন্তু হামলাদার বেছে নিল দক্ষিণ বিহারের জংলা বিপথ যাতে গা-ঢাকা দেওয়া চলে। আর সোজা এসে হাজির হল নদীয়ায়।

রাজা লক্ষ্মণসেন হয়ত খবর পেয়েছিলেন, অথবা ব্যাপারটা অতর্কিতও হতে পারে। তবে খবর পেয়ে থাকলেও শৃঙ্গারানুরক্ত অশীতিপর বৃদ্ধ সে ব্যাপারে বিশেষ মনঃসংযোগ করতে পারেন নি, ক'রে থাকলেও হয়ত তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মারণ-উচ্চাটনের মন্ত্রপাঠ ক'রেই শত্রুর প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করতেন! যৌবনের বলবীর্য তাঁর পূর্বেই অন্তর্হিত হয়েছিল। তা ছাড়া নদীয়ায় কোনো দুর্গ ই ছিল না।

সেন রাজারা গুপ্তাব্দ ও পালাব্দ বন্ধ করে শকাব্দের প্রচলন করেন। শকদের অভ্যুদয় হল প্রায় ১৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মধ্য-এসিয়ায়।

তারপর ৭০ খ্রীষ্টপূর্ব সনে আফগানিস্থান হ'য়ে মালোয়া, গুজরাট ও তক্ষশিলা জয় করে মথুরায় এসে হাজির হয়। সেখানে সাতবাহন রাজা তাদের দক্ষিণাপথের পথরোধ করে দাঁড়ান। এই শকদ্বীপের ব্রাহ্মণেরাই (বা সাইথিয়ান ব্রাহ্মণ) সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের প্রচলন করেন ১০০-২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে; এর পূর্বে চালু ছিল বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ। সিদ্ধান্তজ্যোতিষ বা সূর্যসিদ্ধান্ত বিজ্ঞানভিত্তিক; শকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা কোষ্ঠী তৈরি ও বিচারে শুধু শকাব্দের ব্যবহার করতেন। কালক্রমে পঞ্চম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই শকাব্দের প্রচলন ঘটে,—তিথি নিরূপণের জন্য নয়, মাস-বর্ষ-দিন নির্ণয়ের জন্য। শকাব্দের শুরু ১২৯, মতান্তরে ১২৩ খ্রীঃ পূঃ সালে। এর কারণ, শকেরা ব্যাকট্রিয়ার যুদ্ধে নামে ১২৯ খ্রীঃ পূঃ সালে; কিন্তু সে যুদ্ধ শেষ হয় ১২৩ খ্রীঃ পূঃ সালে, প্রায় সাত বছর পরে। কাজেই, ১২৩ খ্রীঃ পূঃ সাল থেকেই শকাব্দ চালু হওয়া অধিকতর সম্ভবপর।

কিন্তু নূতন শকাব্দে আমরা ১১৯ খ্রীঃ পূঃ সাল না ধরে মাত্র ২৯ খ্রীঃ পূঃ সাল গণনা করি কেন? কারণ, প্রথম দু'শ' বছর গণনায় আমরা সাধারণত অব্দকে বাদ দেই—সেটাই রীতি। কণিষ্কাব্দ বলতে যা বোঝা যায় সেটা আর কিছুই নয়—পুরনো শকাব্দ থেকে ঠিক দু'শ' বছর বাদ দেওয়া সাল।

বলা বাহুল্য, সিদ্ধান্তজ্যোতিষ সূর্যভিত্তিক দিন গণনা।

কিন্তু 'তিথি' চন্দ্রভিত্তিক; এক-একটি তিথি এক-একটি চান্দ্র দিন। এটি হিন্দু ফলিত জ্যোতিষের একটি অভিনব বিভাবন। ত্রিশটি তিথিতে একটি পূর্ণ মাস। সৌর দিন চব্বিশটি ঘণ্টায় বিভক্ত, কিন্তু চন্দ্রের গতি অনিয়ত বা অনির্দিষ্ট; গড়পড়তা চান্দ্রদিন ২৩·৬২ ঘণ্টা। এই অনির্দিষ্টতার জন্য কোনো কোনো তিথি বিশ ঘণ্টায় শেষ হয়, কোনটি আবার চলে ২৬·৮ ঘণ্টা পর্যন্ত।

হিন্দুর সামাজিক সর্বব্যাপারই তিথির সাম্রাজ্যে—গৃহ্যসূত্রোক্ত দশকর্ম, পূজা-পার্বণ সবই নিয়ন্ত্রিত হয় তিথি দিয়ে।
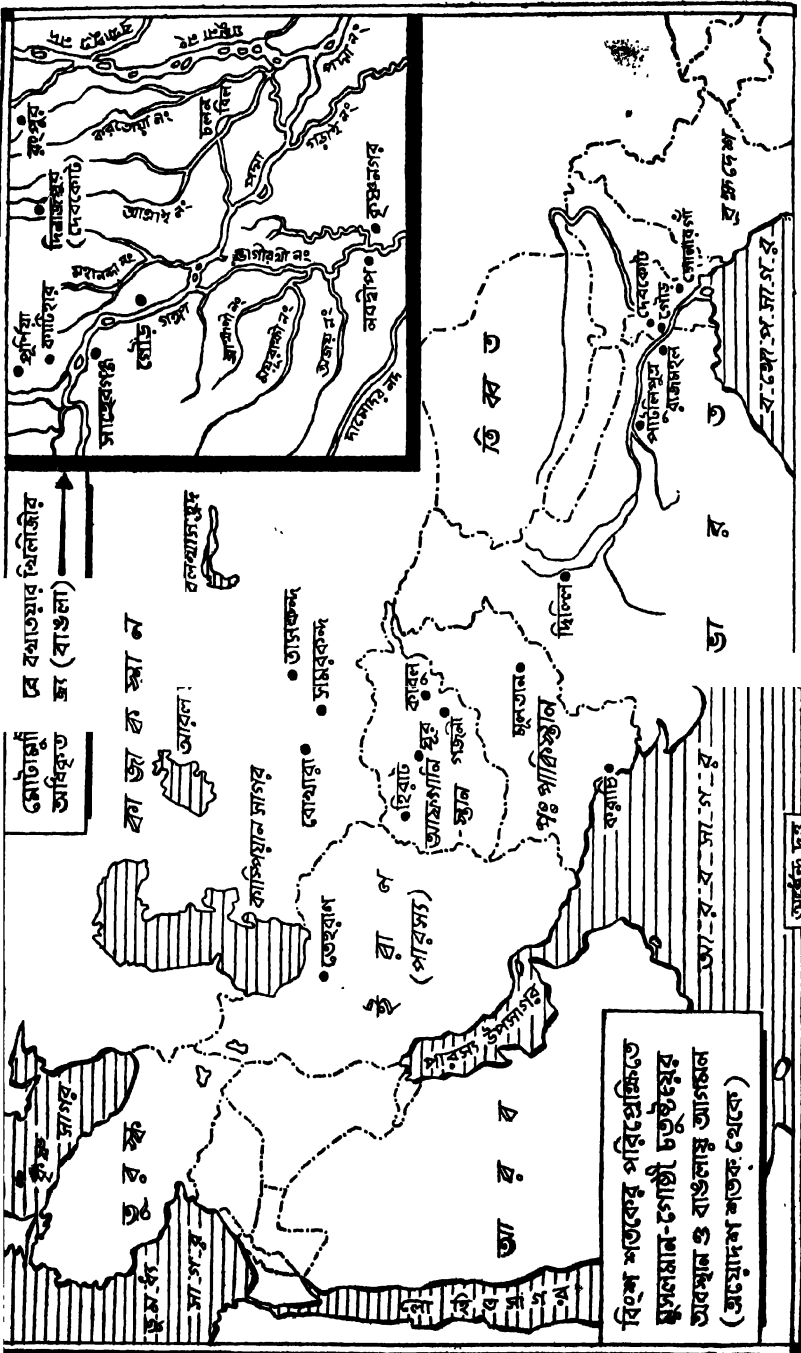
বিংশ শতকের পরিপ্রেক্ষিতে
মুসলমান-গোষ্ঠী চতুষ্টয়ের
অবস্থান ও বাঙলায় আগমন
(ত্রয়োদশ শতক থেকে)
মোটামুটি অধিকৃত
বখ্‌তিয়ার খিলিজীর
(বাঙলা)
কৃষ্ণ সাগর
তুরস্ক
ভূমধ্য সাগর
কাজাকস্থান
আরল
বলখাস হ্রদ
কাস্পিয়ান সাগর
তাসকন্দ
বোখারা
সমরকন্দ
তেহরাণ
ইরাণ
(পারস্য)
হিরাট
ঘুর
কাবুল
আফগানিস্তান
গজনী
আরব
পারস্য উপসাগর
মূলতান
পঃ পাকিস্তান
দিল্লি
করাচি
আরব সাগর
তিব্বত
পাটলিপুত্র
রাজমহল
দেবকোট
গৌড়
সোনারগাঁ
ভারত
ব্রহ্মদেশ
বঙ্গোপসাগর
পূর্ণিয়া
কাটিহার
দিনাজপুর
(দেবকোট)
রংপুর
সাহেবগঞ্জ
গৌড়
গঙ্গা
চলন বিল
পদ্মা
ময়ূরাক্ষী নং
অজয় নং
দামোদর নদ
নবদ্বীপ
কৃষ্ণনগর
অর্দ্ধেন্দু দত্ত

বাঙলা পুরাণের কাল

(ত্রয়োদশ শতক)

[চার]

(১২০০-১৩০০)

উত্তরবঙ্গ, রাঢ়, পূর্ববঙ্গ

লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৬)

বিশ্বরূপ সেন (১২০৬-১২২০)

কেশব সেন (১২২৫ ১২২৮)

উত্তর বঙ্গে

বখ্‌তিয়ার খিলজী (১২০৪-১২০৬)

গীয়াসুদ্দীন (১২১২-১২২৭)

তুগরল খাঁ (১২৭৮-১২৮২)

রুকনুদ্দীন কাইকাউস ১২৯১-১৩০১)

পূর্ববঙ্গে দেববংশ

কুমিল্লায় পট্টিকেরা

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতেই বাঙলার রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তন হল; সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল সামাজিক পরিবর্তনও। একাদশ শতকের বৌদ্ধ ও দ্বাদশ শতকের হিন্দু, এই দুই ধারার সঙ্গে মিশল এসে তৃতীয় একটি ধারা—সেটি ইসলামী।

বহির্বাণিজ্যের অধোগতির পরে বাঙলার নিম্নকোটি সমাজের মুষ্টিমেয় শিল্পকর্মী ছাড়া আর সবই ছিল কৃষিজীবী; অর্থাৎ বাঙালী সেকালে প্রায় পুরোপুরি গ্রাম-কেন্দ্রিক, কৃষি-নির্ভর জাতি। পরিবারের গণ্ডিই ছিল মানুষের প্রধান কর্মক্ষেত্র। তাই স্বভাবতই এর ফলে যৌথ পরিবারের প্রথা গড়ে উঠেছিল; এ প্রথাটির মূলকথা হল এই যে পরিবারের সম্পত্তিতে কারো কোনো বিশেষ দাবি নেই; এর উপস্বত্ব থেকে পরিবারের সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করতে হবে।

কিন্তু ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা অন্যরূপ অর্থাৎ এই তৃতীয় ধারাটির সঙ্গে অন্য তুটি ধারার মিল অপেক্ষা মৌলিক অমিল বেশী। এর উত্তরাধিকারের সূত্র বিভিন্ন, বিশেষত বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে জটিল। পরিবার সম্পর্কে ধারণাও অন্য রকমের।

মিল ছিল শুধু তুটি বিষয়ে। এক, সর্বক্ষেত্রেই মেয়ের চেয়ে ছেলেকেই বেশী অধিকার দেওয়া এবং ছেলের মধ্যে বড়টির। তুই, পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও কর্তব্যবোধ। সাধারণভাবে এসব রীতি ইসলামী সর্বগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই খাটে।

বাঙলায় এই মুসলমান জাতির অন্যতম গোষ্ঠী তুর্কী এসে কায়েম হয়ে বসল। এরা বাঙলায় নবাগত হলেও, ভারতবর্ষে মোটেই নবাগত নয়। বাঙালীর সমাজের উপর এদের প্রভাবের হিসাব করার আগে মুসলমান জাতি সম্পর্কে একটু সাধারণ ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে পরপর চারটি মুসলিম গোষ্ঠী হামলাদার এসেছে— সবই অবশ্য দেশের উত্তর-পশ্চিম তুয়ার দিয়ে। প্রথম আসে আরব গোষ্ঠী, কিন্তু তাদের দৌড় ছিল সিন্ধুদেশ ও পঞ্জাবের কিছু অংশ পর্যন্ত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইরানী-তুর্কী ও আফগান—প্রায় সমকালেই। চতুর্থ মোগল; কিন্তু প্রথম পর্বে মোগলরা মুসলমান ছিল না— ভারতবর্ষে এসে মুসলমান হয়। দ্বিতীয় পর্বের মোগলের সারথি বাবরের পদার্পণ হল ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে।

মুসলমান ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আমাদের আলোচনার প্রয়োজন নেই। শুধু হামলাদার হিসাবে সেই মধ্যযুগের রীতি অনুসারে এদের গোষ্ঠীগত হিংস্রতা ও লুণ্ঠন-প্রবৃত্তির মধ্যে যে তারতম্য বিশেষ কিছু ছিল না, সে কথাই বলব। কারণ, এসব নৃশংসতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া অত্যাচারিত মানুষের সমাজ-মানসে গভীর দাগ কেটে যায়; সে দাগ তদানীন্তন সামাজিক ব্যবস্থার গতি ও প্রকৃতিতে তো নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছেই, এমনকি পরবর্তী কালেরও।

এবার এই গোষ্ঠী-চতুষ্টয়ের ইতিহাসও একটু স্মরণ করে নেওয়া যাক। আরবীয়েরা সপ্তম শতকের শুরুতেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। উমায়েদরা যখন খলিফা, অর্থাৎ একাধারে ধর্মনেতা ও নৃপতি, তখন মুসলমান রাজ্য অধুনাতন রাশিয়ায় অন্তর্গত কাজাকস্তানের আরল সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সময়েই, সপ্তম শতকের শেষাশেষি, তুর্কীরা ইসলামে দীক্ষিত হয়। এরা ছিল পার্বত্য, যাযাবর গোষ্ঠী ; এরা পূর্বে নানাপ্রকার ভূত প্রেত ও পার্বত্য বৃক্ষ পূজা করত। ক্রমে এরা এক দুর্ধর্ষ জাতিতে পরিণত হ'য়ে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আধুনিক আফগানিস্তানেব মানচিত্রের যে রূপ, তার পত্তন হয়েছে মাত্র অষ্টাদশ শতকে ; এর পূর্বে দেশটি ছিল নানা খণ্ডে বিভক্ত। তারই একটির নাম গজনী ও অন্যটির ঘুর। দুটি খণ্ডেই ইরানীয়-তুর্কীর দলই রাজত্ব করত। কেউ কেউ বলেন, ঘুরের সুলতান ছিলেন আফগান। সে যা হোক, বাঙলা দেশের খাঁটি আফগান বা পাঠানদের প্রথম শাসক শেরশাহ, শেষ দাউদ করবাণী ; এঁরা রাজত্ব করেন সাঁইত্রিশ বছর এবং তা শেষ হয় ষোড়শ শতকের চতুর্থ পাদের শুরুতেই। এই গজনীর সুলতান মামুদই একাদশ শতক থেকে ভারতবর্ষে আক্রমণ চালিয়ে যান এবং কালক্রমে তাঁর রাজ্য বহুবিস্তৃত হয়ে পড়ে—আরল সাগর থেকে ভারতবর্ষের গঙ্গা নদী পর্যন্ত। ঘুরের সুলতান ছিলেন তাঁর তাঁবেদার।

গজনীর সুলতান মামুদের মৃত্যুর পরে, ঘুরের সুলতান (তিনিও মামুদ গীয়াসুদ্দীন) শুধু বিদ্রোহই করলেন না, দ্বাদশ শতকের তৃতীয় পাদের শেষাশেষি গজনীর গদি দখল করে বসলেন। তারপর সে শতকেরই চতুর্থ পাদ থেকে চলল তাঁর ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে সমরাভিযান। বঙ্গস্থান জয় করে তিনি ফিরে গেলেন স্বদেশে ; ভারতবর্ষের জমিদারির ভার রেখে গেলেন তাঁর সেবক কুতুবুদ্দীন আইবেকের হাতে। এই কুতুবুদ্দীনই দিল্লী জয় করেন ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর চলে তাঁর গঙ্গা ও যমুনা নদীর কোল-ঘেষা সব রাজ্যজয়ের

প্রচেষ্টা। এরই অনুচর বক্‌তিয়ার খিলজী পূর্বাঞ্চল দখল করতে করতে নদীয়ায় লক্ষ্মণ সেনের দুয়ারে হানা দেয়। খানদানী তুর্কীরা খিলজীদের আফগান বলে গণ্য করত, কারণ বহুদিন সেদেশে বাস করে তারা কিছু কিছু আফগানী সামাজিক রীতিনীতি রপ্ত করেছিল। তুর্কীর চোখে আফগানীরা ছিল কিছু হেয়।

মোঙ্গল বা মোগল কথাটির উদ্ভব হয়েছে 'মং' শব্দ থেকে; মং শব্দের অর্থ নির্ভীক। বিশেষণটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য; আদি তুকীর মত এরাও একটি পার্বত্য গোষ্ঠী, কিন্তু আদি তুর্কীর চেয়েও এরা অনেক বেশী দুর্ধর্ষ ও হিংস্র। ইতিহাসবিশ্রুত চেংগিস খাঁর নেতৃত্বে এরা তুর্কী সাম্রাজ্য তো লণ্ডভণ্ড করেই দিল, এমন কি চীন, এশিয়ার মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। এরা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল দরজায় প্রথম হানা দিল ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদে।

সেকালের বিখ্যাত কবি আমির খসরু একবার এদের হাতে পড়ে বন্দী হন। তিনি এদের রীতিনীতি ও চেহারার যে বিবরণ দিয়েছেন তার সঙ্গে আমাদের কল্পনার 'রাক্ষস-খোক্কসের' মিল রয়েছে। অভিব্যক্তিবাদের কথা স্মরণ করলে এদের আদিম মানুষ প্রজাতি থেকে বেশী দূরের প্রাণী বলে মনে হবে না। এদের দৌরাত্ম্যে অস্থির ও ভীত হয়ে দলে দলে খানদানী তুর্কীরা সমরখণ্ড বোখরা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে এসে দিল্লী ও গৌড়-বঙ্গের পৌণ্ড্রবর্ধনে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে ভিড় করল।

আদি পর্বের মোগলেরা সিন্ধুদেশ ও পশ্চিম পঞ্জাব থেকেই বিদায় নিয়েছে, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি। তারপরে ক্রমাগত তুর্কী বাদশা তাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছেন, এমনকি যুদ্ধে জিতে অনেক মোগলকে বন্দী করে দিল্লীও এনেছেন। এরা পরে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হয়ে দিল্লীতে স্থায়িভাবে বাস করেছে। সেকালে এদের বলা হত 'নয়া মুসলমান'।

দ্বিতীয় পর্বের মোগলেরা এসেছে ষোড়শ শতকে, বাবরের

নায়কত্বে। বাবর তাঁর মাতৃকুলের দিক্ থেকে চেংগিসের বংশধর, মাত্র কয়েক পুরুষের মুসলমান।

এখন এই হামলাদারদের হিংস্রতার একটু পরিচয় দিচ্ছি ইতিহাসের পাতা থেকে।

প্রথম আরবীয়দের কথা। কাহিনী দশম শতকের চতুর্থ পাদের। স্থান দেবল—অধুনাতন করাচি। কাহিনীটি এই : প্রকাণ্ড দেবায়তনটি (বোধহয় বৌদ্ধ-বিহার) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে সেখানে একটি মসজিদ তৈরি করা হ'ল ; তিনদিনব্যাপী চলল সে নগরে অবাধ নির্বিচার হত্যালীলা। সহস্র সহস্র মানুষকে করা হল বন্দী ; লুণ্ঠিত বিত্ত অর্থ করা হ'ল জড়। একজন সদ্যোধর্মান্তরিত ভারতবাসীর হাতে শাসনভার অর্পণ ক'রে, তাকে নিকটস্থ একজন আরবী ভূপালের তাঁবেদার করে দেওয়া হ'ল। দেবলের নিকটস্থ 'নৈরূন' নগর বিনাশর্তে অধীনতা মেনে নিলেও, সেখানকার মন্দির ও দেবমূর্তি চূর্ণবিচূর্ণ হল ; তৈরি হল তার জায়গায় একটি মসজিদ। 'আলর' নগরে নির্বিচার নরহত্যা হল না বটে, কিন্তু বাসিন্দাদের উপর চাপানো হল বিরাট করভার। সেখানকার মন্দির ও বৌদ্ধ-বিহারগুলি চূর্ণ হল না বটে, তবে সেগুলি খ্রীষ্টানদের চার্চ ও ইহুদীদের 'সায়নাগগ' বা দেব-সভাগৃহের তুল্য বলে ধরা হ'ল। কিন্তু এ অনুকম্পার যে বিশেষ কোনো অর্থ ছিল তা নয় ; খ্রীষ্টান ও ইহুদী দেবায়তনের মত এতেও ঘণ্টাধ্বনি করা হল নিষিদ্ধ, আর নিষিদ্ধ হল দেবায়তন বৃদ্ধি করা। সদা-সর্বদা মুসলমানদের এগুলির মধ্যে প্রবেশ করতে দিতে হবে বলে আদেশ হ'ল জারি, আর মাঝে মাঝে এগুলিকে আস্তাবল ও গোয়ালেও পরিণত করা হ'ত। মুলতানে বৃদ্ধ ও শিশু ছাড়া আর সবাইকেই হত্যা করা হ'ল, মন্দিরের (বোধ-হয় বিখ্যাত সূর্যমন্দিরের) ছ' হাজার পুরোহিতকে করা হল বন্দী ; এ ছাড়াও বন্দী হল নগরের সমস্ত স্ত্রীলোক ও শিশু। নগরে তৈরি হল একটি বিরাট্ মসজিদ।

মুলতানের বিখ্যাত সূর্যমন্দিরটি কি কারণে যে রেহাই পেল বলা যায় না ; হয়ত পরবর্তী কালে ঔরংজেবের সুকীর্তি বৃদ্ধির জন্য ! ঔরংজেবই সেটিকে ধ্বংস করেন।

অবাধ ও নির্বিচার হত্যালীলা বলতে যে অমূর্ত ভাবের সৃষ্টি হয়, তাকে মূর্ত ও স্ফুটতর করার জন্য ত্রয়োদশ শতকেরই চতুর্থ পাদের বাঙলার একটি কাহিনী তুলে ধরছি। বাঙলার নবাব তুগরল খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। দিল্লীর মসনদে তখন তুর্কী সুলতান বলবন। বলবন তাঁকে শায়েস্তা করার জন্য এলেন বিরাট্ সৈন্যদল নিয়ে। ভয়ে তুগরল গৌড় ছেড়ে পালিয়ে গেলেন সোনার গাঁ। সেখানে তিনি দুর্গ তৈরি করেছিলেন—'কিল্লা-ই-তুগরল'। কিন্তু সেখানেও তিনি বলবনের ক্রোধ থেকে রেহাই পেলেন না। বলবন সোনার গাঁ পর্যন্ত ধাওয়া করে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করে ফিরে এলেন গৌড়ে। এটি হল প্রথম দৃশ্য ; কিন্তু দ্বিতীয় দৃশ্যটিই কিছু অসাধারণ। গৌড়ে এসে তুগরল খাঁকে যারা সাহায্য করেছেন বলে বলবনের সন্দেহ হল, তাদের তো বটেই, তাদের আত্মীয়-স্বজন, আণ্ডাবাচ্চা, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করে নগরের দু'মাইল লম্বা বাজারটির দু'ধারে খুঁটা পুঁতে প্রত্যেক খুঁটায় এক-একটি শবদেহ লটকে রাখলেন ; উদ্দেশ্য, সে দৃশ্য দেখে পরবর্তী কালে কেউ যেন দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কল্পনাও না করে। সেকালে হাতির পায়ের নিচে ফেলে পিষে মারাটাই ছিল দস্তুর।

তৃতীয় পর্বে, এলেন আলাউদ্দিন খিলজী। খিলজীদের আফগান বলেই গণ্য করা হত ; অন্তত তুর্কী মান্যগণ্য সমাজে তাঁদের স্থান ছিল না। তখন দিল্লীতে 'নয়া মুসলমান'দের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু মুসলমান বনেও না পাচ্ছে তারা কোনো সুখ-সুবিধা, না পাচ্ছে রাজদরবারে কোনো উচ্চ পদ। অথচ, মুসলমান-সমাজ যে রাজনৈতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তার মূলকথা এই যে, পৃথিবীতে মাত্র দুটি সমাজ বিদ্যমান : একটি মুসলমান, অন্যটি

মুসলমান ছাড়া অন্যান্য জাতি। এই অন্য জাতিগুলি আবার দু'ভাগে বিভক্ত: এক, খ্রীষ্টান ও ইহুদি অর্থাৎ বাইবেল-পন্থী, দুই, মূর্তিপূজকের দল। প্রথম সমাজকে বরং সহ্য করা চলে, করের বিনিময়ে; কিন্তু দ্বিতীয়টিকে কোনোক্রমেই বরদাস্ত করা যায় না। 'নয়া মুসলমান'দের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রয়োগের কথা কেউ চিন্তাও করল না। ফলে, তাদের মধ্যে শুরু হল নানা আন্দোলন।

এদিকে এদের পূর্বতন গোষ্ঠী, অর্থাৎ আদি অমুসলমান মোগলেরা মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দুয়ারে হানা দিতে শুরু করল। তাই খিলজী সাহেব দিল্লীর ও অন্য সব জায়গার সমস্ত 'নয়া মুসলমান'দের একেবারে নির্মূল করে দিলেন অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ হাজার মুসলমানকে জবাই করলেন। তাঁর আর জাবাবদিহি চাইবে কে? কে বলে কাকের মাংস কাকে খায় না?

চতুর্থ পর্বে মোগলদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাদশা ঔরংজেবের কথা। সে কথা সর্বজনবিদিত।

তাই বলে কি সব বাদশা নবাবই মুসলমান-সমাজের রাজনৈতিক ভিত্তির মূলকথাকে অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় বলে মেনে নিয়েছিলেন? তা নয়। এঁদেরই, অর্থাৎ এই ব্যতিক্রান্ত মনীষীদের সহনশীলতার ফলেই তৃতীয় ধারাটির, অর্থাৎ ইসলামী ধারার সৃষ্টি ও পুষ্টি ঘটেছে।

বাঙালীর সমাজে এই তৃতীয় ধারাটির প্রভাব ভারতীয় অন্যান্য সমাজের চেয়ে অনেক বেশী। কেন তা হয়েছে সে কথার বিচারে এই পূর্বপটটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

এবার বখতিয়ার খিলজীর কথায় ফিরে আসা যাক; কারণ তাঁর কাল থেকেই বাঙলায় এ ধারাটির সৃষ্টি হয়েছে।

নদীয়া জয় করে খিলজী সাহেব আর বঙ্গের দিকে এগোলেন না, কারণ বঙ্গে যেতে হ'লে তাঁকে জলপথ পার হ'তে হ'বে, অথচ সে ব্যবস্থা কিছু ছিল না। এদিকে সেনদের ছিল নৌবাহিনী। তাই তিনি ফিরে এলেন অরক্ষিত গৌড়ে। পরে তাঁর কর্মকেন্দ্র তুলে নিলেন

দিনাজপুরের সন্নিকটে দেবকোটে, যার অধুনাতন নাম গঙ্গানগর। যে রাজ্য তিনি জয় করলেন তার মোটামুটি সীমানা হ'ল--উত্তরে দেবকোট পূর্বেও দক্ষিণ-পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে গঙ্গানদীর প্রধান ধারাটি, পশ্চিমে বিহারের যে অংশটি তাঁর দখলে এসেছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে আরো আড়াই শ' বছর ইসলামী প্রভাব ছিল এ রাজ্য-টুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কারণ নৌবাহিনী সংগঠনের অভাব ছিল। অবশ্য তুগরল খাঁ সোনার গাঁ পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলেন এবং উত্তর ও দক্ষিণে রাঢ়ের অর্থাৎ অধুনাতন মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া ও হুগলীর অনেকাংশ অধিকারও করেছিলেন। কিন্তু তুগরলের মৃত্যুর পরে সে রাজ্য স্থায়ী হয়েছিল কিনা সন্দেহ।

ইসলামী সংগঠন-সূত্রের নির্দেশ অনুসারে খিলজী সাহেব কাজ শুরু করলেন; বলা বাহুল্য, তখন তাঁর একহাতে তলোয়ার, অন্য-হাতে দানসজ্জা। মুখে মুসলমানের জন্য অভয় বাণী।

লখনৌতিতে তৈরি হল কতগুলি মসজিদ ও মাদ্রাসা; আর সুফীদের জন্য খানকা বা আশ্রম। কিছু কিছু মসজিদ তৈরি হল সুফীদের কবরের পাশে যাতে সে দরগাগুলির মানমর্যাদা আরো বাড়ে। মসজিদ প্রভৃতি তৈরির মালমসলা সবই প্রায় সংগ্রহ হল মন্দিরগুলি ভেঙ্গে। মাদ্রাসা হল আধুনিক যুগের স্কুল ও কলেজের মত; সেখানে শুধু ইসলাম ধর্মই হল পাঠ্য বিষয়।

সুফী ও মৌলবীদের জন্য ছিল অকৃপণ দান। তাঁরা পেতেন বৃত্তি, অন্যান্য অর্থসাহায্য, পোশাক ও খাদ্য। তাঁদের আসা-যাওয়ার জন্য ছিল সরকারী ব্যবস্থা; তাঁদের বাসস্থানের কাছে তৈরি হত পুকুর। দেবায়তন তৈরি করার জন্য জমি তো সরকারই দিতেন। খিলজী সাহেব থেকে শুরু করে সকল শাসকই তাঁদের এসব সুবিধা দিয়েছেন।

বাঙলার মুসলমান-সমাজও প্রথম থেকেই হল দ্বিধাবিভক্ত। এর একদিকে রইলেন বিজয়ী খানদানী তুর্কীরা, যাঁদের বহুলাংশ এলেন

স্বদেশ থেকে চেংগিস খাঁর অত্যাচারে ; কেউ কেউ বা এলেন দিল্লী থেকে বিতাড়িত হয়ে।

অন্য দিকে পড়ল ধর্মান্তরিত বাঙালী—এঁদের বেশির ভাগই ছিলেন মহাযানী, সহজিয়াপন্থী বৌদ্ধ ও নাথপন্থী। প্রথম দলের সামাজিক ব্যবস্থাটা পেল বিদেশাগত সর্বভারতীয় রূপ, আর দ্বিতীয় দলের মধ্যে প্রাধান্য পেল তার ধর্মান্তরের পূর্বে জাত সংস্কার। ফলে, সে দল আঁকড়িয়ে রইল বাঙলার চিরন্তন রীতিনীতি আর বিশ্বাস, এমনকি রামায়ণ-মহাভারতের প্রতি অশেষ অনুরাগও। ইসলামী সংগঠনের মূলসূত্র সে দল কোনোদিনই মানে নি ; শুধু মেনে নিয়েছে মুসলমানী ধর্মমত ও তার বিধিনিষেধ।

তুর্কীর পরবর্তী কালেও যাঁরা গদি পেয়েছেন সবাই পড়েছেন প্রথম দলে। বাঙালী মুসলমান-সমাজের সঙ্গে তাঁদের সত্যিকার মিলন ঘটে নি—এই সহজাত বিভেদের ফলে।

এ প্রভেদ যে চিরন্তন তার প্রমাণ রয়েছে বহু। চৈতন্যভাগবতে দেখা যায়, মহাপ্রভুর শিষ্য যবন হরিদাসকে লক্ষ্য করে বাঙলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বলছেন :

"কতভাগ্যে দেখ তুমি হঞাছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশ জাত॥
... ...
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা উচ্চার॥"

এটি ষোড়শ শতকের প্রথম পাদের কথা।

এমনকি আজও কালী শেক বা শেখ, কালাচাঁদ শেখ, ব্রজ শেখ, গোপাল মণ্ডলের সঙ্গে প্রায়ই মোলাকাত হয়। এখনো রজনী শেখকে রিয়াজুদ্দিনে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। যদু পটুয়া এখনো

আধা মুসলমান আধা হিন্দু। মুসলমান মহিলারা এখনো শাঁখা ছাড়ে নি, কেউ কেউ সিঁদুরও পরেন।

এই দ্বিতীয় দল থেকে কি কেউ কখনো প্রথম দলে যেতে চেষ্টা করেনি? করেছে বটে, তবে সে চেষ্টা সাধারণত ফলপ্রসূ হয়নি। সে চেষ্টা হিন্দুর খ্রীষ্টান হয়ে সাদা চামড়ার দলে ভিড়বার মতই হয়ে রয়েছে হাস্যকর।

এ সম্পর্কে যে হাসির ছড়াটি প্রবাদ-বাক্যরূপে সারা বাঙলায় প্রচলিত, এখানে তাই উদ্ধৃত করছি :

"আগে থাকে উল্লা তুল্লা শেষে হয় উদ্দীন
তলের মামুদ উপরে যায় কপাল ফেরে যদ্দিন।"

অর্থাৎ মেহের উল্লা থেকে 'মৌলবী মহম্মদ মেহের উদ্দীন আহম্মদ' হতে ধাপগুলি এই :

মেহের উল্লা → মেহের উদ্দীন → মেহের উদ্দীন মহম্মদ → মহম্মদ মেহের উদ্দীন → মৌলবী মহম্মদ মেহের উদ্দীন আহম্মদ।

তলোয়ার ও মৌলবী তো উত্তর ভারতের সর্বত্রই মুসলমান প্রধানদের সাথী হয়েই ছিল, তবে বাঙলায় সে সব অঞ্চলের চেয়ে এত বেশী লোক ধর্মান্তরিত হল কেন? এ নিয়ে গবেষণা প্রচুর হয়েছে। এর প্রধানতম কারণ যে সুফীদের প্রচেষ্টা, সে সম্পর্কে মতদ্বৈধ হয়নি। সুফীদের বাঙলায় বলত 'পীর'। পীরের অর্থ প্রাচীন। এই পীরের দরগাগুলির স্থান বাঙলার সর্বত্রই হল সুনির্বাচিত—সবই ছিল তান্ত্রিক সাধুদের আস্তানা। সেখানে তান্ত্রিক সাধুরা তাদের কেরামতি দেখিয়ে সাধারণ লোককে তাক লাগিয়ে দিত। তাদের জন্য তৈরি করত মাদুলি, কবচ, করত যজ্ঞ, স্বস্ত্যয়ন, ষট্‌কর্ম। তান্ত্রিক সাধুর দল তাড়া খেয়ে কেউ পালালো, কেউ মারা গেল; তাদের স্থলে বসল এসে পীরেরা। তারা হিন্দু ও বৌদ্ধ কাহিনী থেকে বেছে বেছে এসব তুকতাকের কথার গল্প শিখে নিল, আর তুলে ধরল সে সব সরল-বিশ্বাসী মানুষের কাছে যার যার বিভূতির কাহিনী।

তাতে ফল হল অসাধারণ ; ধর্মান্তরের প্রথম ধাপ তৈরি হল সহজ-ভাবে।

তারপর খানকায় অর্থাৎ আশ্রমে সর্বপ্রকার আশ্রয়হীন মানুষকে দেওয়া হত আশ্রয় ও খাদ্য। ত্রয়োদশ শতকের বাঙলা তখন পূর্বাপেক্ষা অনেক দরিদ্র হয়ে পড়েছে ; দরিদ্র দেশে খানকায়ের আকর্ষণ বেড়ে চলল।

শেক শুভোদয়া বাঙলায় পীরের প্রথম বন্দনা গান। ইনি তাব্রিজের প্রখ্যাত সুফী জালালউদ্দীন তো ননই, কোনো ঐতিহাসিক মানুষই নন বলে বিদ্বজ্জনের বিশ্বাস। কারো কারো মতে এটি একটি জাল দলিল মাত্র—ষোড়শ শতকের শেষপাদে সম্রাট্ আকবরের প্রতিনিধি টোডরমলকে ধোঁকা দিয়ে 'বাইশ হাজরী' মসজিদ যে জমিটির উপর তৈরী, সেটি নিষ্কর করার চেষ্টা মাত্র। কিন্তু তবুও এর মাঝ থেকে কিছু মালমসলা সংগ্রহ হবে।

প্রথম, পীরদের কেরামতির কথা ; যে গল্প শুনে সাধারণ মানুষের তাক লেগে যেত, যেমন, শেক শুভোদয়ার নায়ক শেক সাহেব এলেন জলের উপর দিয়ে হেঁটে। পীরদের হাতে সাধারণত থাকত ভিক্ষাপাত্র ও 'আসা'লগুড় ; এঁর একহাতে ছিল করবাল অন্য হাতে 'আসা'। পীরেরা যে সত্যি করবালেরও ব্যবহার করতেন তার পরিচয় পরে পাওয়া যাবে। 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'তে পরে 'আসা'লগুড় গুঁজে দেওয়া হয়েছে।

জনসাধারণের মনে যে আত্মবিশ্বাস কতখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছিল তা বলা হয়েছে হলায়ুধের মুখে :

"যদ্যপি যাবনিকং কর্তুং সমায়াতঃ তদা রক্ষিতুং কোঽপি শক্তঃ"

যদি সত্যি পীর সাহেব ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এসে থাকেন, তবে তা থেকে আর কে আমাদের বাঁচাবে ?

পীর সাহেব বাঘের সঙ্গে জঙ্গলে বাস করেছেন, 'নাকচিয়ারী' প্রথায় চিকিৎসা করে নাক থেকে পোকা বের করে ব্যথা সারিয়ে

দিতেন, অন্ধতা সারিয়ে দিতেন, গোময়কে স্বর্ণে পরিণত করতে পারতেন, আরো কত কি !

পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধে পীর সাহেবের ভাগ্যেও জুটতে লাগল এক অঞ্জলি জল। তিনি বিধান দিলেন এতে লাগে মোট দশ অঞ্জলি তার চারটি পরমপুরুষের--যিনি মহাসাগরের মধ্যে পীরদের আস্তানার অনেক উপরে বাস করেন। একটি পীরের, পঞ্চমটি হিমালয়ের উপরে দেবতাদের, ষষ্ঠটি পূর্বপুরুষের, সপ্তম জনসাধারণের, অষ্টম রাজার, নবম নয়া মুসলমানদের, দশমটি দীন দরিদ্রদের। হিন্দু সমাজের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অন্তরে ঢুকবার এটি চতুর দ্বিতীয় পদক্ষেপ। তারপর আসে 'মসীদ' অর্থাৎ মসজিদের কথা, সঙ্গে সঙ্গে আজান।

এসব তোড়জোড় সত্ত্বেও, ইসলাম গ্রহণ করে যে পীরের প্রথম শিষ্য হল সে একটি ধোপার ছেলে--যে অর্ধকড়ির বিনিময়ে পীর সাহেবের এঁটো কাচতে রাজী হয়েছিল।

এরপরে শোনা যাক পীর সাহেবের প্রতি পরমপুরুষের আদেশ :

"তুমি পূর্বদেশে চলে যাও। সেখানে লক্ষ্মণসেন নামে এক রাজা আছেন ; তিনি মুসলমান দেখলেই হত্যা করেন। কেউ তাঁকে পরাস্ত করতে পারেনি। তুমি সে দেশের ভাষা জানো। তুমি সেখানে মসজিদ তৈরি করে, চতুর্দশ লোক ঘুরে আবার ফিরে এসো।"

শেক শুভোদয়ার ত্রয়োদশ শতকের (চতুর্দশও হতে পারে) বাঙলায় লেখা একটি কবিতা রয়েছে। সেটির একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

"ইক্ষ যুবতী পতিয়ে হীন
গঙ্গা সিনানিবাক জাইয়ে দিন।
দৈব নিয়োজিত হৈল আকাজ
বায়ু না ভাঙ্গ ছোট গাছ
ছাড়ি দেহ কাজু মুয়ি জাউ ঘর
সাগর মধ্যে লোহার গড়।"

বাঙালীর সমাজে এই তৃতীয় ধারাটির পুষ্টির জন্য খাত কেটেছে তিনদল কর্মী—মুসলমান শাসকবর্গ, মৌলবীর গোষ্ঠী আর পীর-দরবেশ অর্থাৎ সুফী-সম্প্রদায়। এই তৃতীয় দলটিই যে সামাজিক তথা রাজনৈতিক পরিবর্তনে সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশি তাতে সন্দেহ নেই। খিলজী সাহেবের পরে প্রায় আড়াইশ' বছর এ ধারাটির প্রবাহ ছিল উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গেই সীমাবদ্ধ; তারপর তা সারা বাঙলায় ছড়িয়ে পড়ে।

এবার বাকি বাঙলাটুকুর হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

গৌড় থেকে বিতাড়িত হয়ে লক্ষ্মণসেন এলেন বঙ্গে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে। তিনি সেখানেও আরো অন্তত তিন-চার বছর রাজত্ব করেন। তারপরে তাঁর ছেলেরাও রাজত্ব করেছেন মোটামুটি ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদের শেষ পর্যন্ত। তারপরে বঙ্গে মাথা তুলেছে দেববংশ, আর বাঙলার পশ্চিম-দক্ষিণে পট্টিকেরা।

একালে রাজার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান অধিষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ তো বটেই, এমন কি উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় থেকে অনেক হিন্দু পূর্ব-বঙ্গে চলে যায়। বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ বিহার ও হিন্দু মন্দিরগুলির ধ্বংসের দিকে তুর্কীদের দৃষ্টি ছিল প্রখর—প্রধানত অর্থলোভে। এতে ক্ষীয়মাণ বৌদ্ধগোষ্ঠীর ক্ষয়ক্ষতি হল অপেক্ষাকৃত বেশি। তারপর, গৃহ্যসূত্রের বিধান মেনে নিয়ে সে গোষ্ঠীর শীর্ষমণি বেণেদের অনেকাংশ ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করল।

'গুভাজু' ও 'দেবভাজু' লড়াই তখনো চলছে বটে, তবে 'গুভাজু'দের শক্তি কমে যাবার ফলে একটি তৃতীয় পক্ষ এসে যখন 'দেবভাজু'দের 'দেউল দেহারা' ভাঙতে শুরু করল তখন তারা হয়ে উঠল উল্লসিত। সে উল্লাসের প্রকাশ রয়েছে রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণে' 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'য়। সে রুষ্মার ফলটুকু উদ্ধৃত করছি।

নিরঞ্জনের এ রুষ্মার কারণ কি? কারণ 'দেবভাজুরা'।

"বলিষ্ঠ হইল বড় দসবিস হয়্যা জড়
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাস।"

তাই ঃ

"নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেত দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার॥
ব্রহ্মা হৈল মহাম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল স্থলপানি।
গণেশ হইআ গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইল্যা জত মুনি॥"

তারপর ?

... ...

"জতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা কিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল॥"

রামাই পণ্ডিত ও 'শূন্যপুরাণে'র কাল নিয়ে মতদ্বৈধ রয়েছে। কেউ পণ্ডিতজীকে দশম-একাদশ শতকের বলে বলেছেন, কেউ বলেছেন ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের। এ নিয়ে বাদানুবাদের প্রয়োজন আমাদের নেই। এই জাজপুর উড়িষ্যার না হুগলী জেলার তা নিয়ে গবেষণাও আমাদের এখতিয়ারের বাইরে। আমাদের কথা সমাজের।

রামাই নিজেকে 'দ্বিজ রামাই' বলেছেন; তাঁর 'তাম্রদীক্ষা' হয়েছিল। এ দীক্ষা ব্রাহ্মণের উপনয়নের মত। তাম্রদীক্ষা হলে

ধর্মপূজার পূজক হতে পারা যায়। অবহেলিত হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ডোম যে ব্রাহ্মণতুল্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

'ধর্ম্মপূজা বিধানে' রামাই বলেছেন,

"বাড়ি মোর বল্লুকায়
পূজি শ্রীনৈরাকার
সুন্য মূর্ত্তি ধ্যান করি
সাকার মূর্ত্তি ভজি।"

হয়ত রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজা বৌদ্ধ ও শাক্তমতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টা মাত্র, নইলে ধর্মপূজায় ছাগবলি-দানের সঙ্গে 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মের' কি করে মিলন ঘটল? ধর্মপূজা বিধানে 'ছাগবলি-দানের' মন্ত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি।

"ছাগং খড়্গেন ছিন্ধি ছিন্ধি কিলি কিলি চিকি চিকি পিব পিব রুধিরং স্কেঁ ৗ স্কেঁ ৗ কিরি কিরি কালিকায়ৈ নমঃ।"

"ওঁ নমো নিরঞ্জন ওঁকার মূর্ত্তয়ে সপ্রদীপং পশুমস্তকং শ্রী অমুক গোত্র, শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা।"

সমাজের দিক্ থেকে ধর্মপূজার গুরুত্ব রয়েছে কারণ প্রধানতঃ দক্ষিণ রাঢ়ের অবহেলিত হিন্দু সমাজে এ পূজা বহুদিন যাবৎ প্রচলিত; শুধু তা-ই নয় সে সমাজে 'ধর্ম ঠাকুর' এখনো জাগ্রত দেবতা। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই তাঁর একটা ঠাঁই রয়েছে, মন্দিরেই হোক বা গাছের নীচেই হোক।

শূন্যপুরাণের কালের বাঙলা পুরোপুরি কৃষিনির্ভর। ফসলের মধ্যে ধানই প্রধান: সঙ্গে রয়েছে 'তিল, সরিসা, কাপাস, মুগ, বাটলা, ইখু ও কলা,' প্রধানত চিনিচাঁপা। ধান বহুপ্রকারের—বাঁসমতী, গোপালভোগ, বাঁকুসাল, মইপাল ইত্যাদি। শূন্যপুরাণের ভাষায় 'ঘরে ধান্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব'। চাষীরও ইজ্জৎ ছিল; সে ভাবত, 'সুনার জে লাঙ্গল কৈল রূপার সে ফাল।'

কিন্তু কেবল ইজ্জৎ থাকলে কি হবে, তার দারিদ্র্য কোনো

শতকেই ঘোচেনি। তার ফসলের একটা বড় অংশ যেত রাজকরে; তারপর ছিল একটা বাঁধাধরা নিয়মে তার খেতখামারে সাহায্যকারীদের ভাগ আর গৃহপালিত পশু অর্থাৎ গরুবলদের খোরাক। বাকি যা থাকত তা দিয়েই চলত তার সংসার। আজও যেমন, সেদিনেও তেমনি মাঠে খাটত তার স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা। তার পরে ছিল গুরু, পুরোহিত ও দেবভোগের দাবি। ঐ সব মিটিয়ে আজকের মতই তার দু'বেলা পেটভরে আহার জুটত না।

চাষীর সঙ্গে বিত্তশালীদের জীবনযাত্রার মানের সেদিনও কোনো তুলনা চলত না, আজও যেমন চলে না। শাসকবর্গও যেন এই আকাশ-পাতাল প্রভেদটি বজায় রাখতেই চেষ্টা করতেন।

এবার এল উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের কথা। পুরাণগুলিতে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান জুড়ে দেওয়া শুরু হয় সপ্তম শতকে বা তারো কিছু আগে। তাই সবগুলি পুরাণেই নানাপ্রকার বিষয়ের সমাবেশ। এ সবই অবশ্য ব্রাহ্মণ্য প্রচারের চেষ্টা; সে চেষ্টায় স্মার্ত পণ্ডিতেরা ছিলেন অগ্রণী। তবে ব্রাহ্মণ্যকে চিরদিনই বৈদিক ধর্মের নীচেই স্থান দেওয়া হত।

'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ', 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ' ও 'বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণের' যে সব পুঁথি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে সবই বাঙলা অক্ষরে লেখা, নাগরী অক্ষরে নয়। নানা কারণ অনুমিত হয়, এ তিনখানি পুরাণই বাঙালী স্মার্ত পণ্ডিতদেরই কীর্তি এবং ত্রয়োদশ শতকে লেখা। 'বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ' চতুর্দশ শতকের হতে পারে।

যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে,

'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ' অষ্টম শতকে লেখা হয়েছিল। দশম শতক থেকে এর মধ্যে বাঙালী স্মার্ত পণ্ডিতদের হাতের ছাপ পড়ে, আর এখন যে রূপে এটি বর্তমান, তার কাজ শেষ হয়েছে মাত্র ষোড়শ শতকে। তবে অষ্টম শতকের রচনাও এ সর্বশেষ রূপে রয়ে গেছে।

বাঙলার চাতুর্বর্ণ্য সমাজের মোটামুটি ছবি পাওয়া যায় শুধু এ

তিনখানা পুরাণেই ; অন্যান্য দিক্ থেকে পুরোপুরি ঐতিহাসিক তথ্যের কোনো সন্ধান এখনো মেলেনি। সেদিক্ থেকে ত্রয়োদশ শতক এক ঘোর তমিস্রার কাল।

পুরাণ সম্পর্কে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সব পুরাণেই গার্হস্থ্য ধর্মকে অতি উচ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে, সন্ন্যাসকে নয়। সন্ন্যাসীকে স্মৃতির বিধান দেওয়া বৃথা।

আমরা এ তিনখানা পুরাণের কোনোখানারই বিস্তৃত বিবরণ দেব না ; সামাজিক ইতিহাসের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই দেব।

প্রথমে দেখা যাক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ। চাতুর্বর্ণ্য সমাজের ভক্ষ্যাভক্ষ্যের কথা ; এ বিধি-নিষেধের অধিকাংশই এখনো ব্যাপকভাবে মান্য।

হরিবাসর (একাদশী), শ্রীরাম নবমী, শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমীতে ব্রাহ্মণ আহার করলে তিনি বিষ্ঠামূত্র আহার করেন। দ্বিপক্ক অন্ন বা চিপিটক ব্রাহ্মণের প্রশস্ত খাদ্য নয়। যতি অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও বিধবার পান চিবানো গোমাংস-ভক্ষণতুল্য। গোমাংস-ভক্ষণতুল্য আর কি কি ? তামার বাসনে বা নুন দিয়ে দুধ খাওয়া, আর এঁটো পাতে ঘি খাওয়া। মদ খাওয়ার তুল্য কি কি ? কাঁসার বাসনে নারিকেলের জল আর তামার বাসনে মধু ও আকের রস খাওয়া। কার্তিক মাসে বেগুন ও মাঘ মাসে মুলা খাবে না। ব্রাহ্মণের পক্ষে অভক্ষ্য কি কি ? সাদা তাল, মসুর ডাল ও মাছ। মাছ খেলে তার প্রায়শ্চিত্ত হয় ত্রিরাত্র উপবাস। পূর্ণিমা ছাড়া অন্য তিথিতে ব্রাহ্মণ মাংস খেতে পারে, তবে শুধু দেবোদ্দেশ্যে প্রদত্ত মাংস। বাঙালী ব্রাহ্মণ এ নিষেধ মানে নি ; মাছের ছাড়পত্র দিয়েছেন দ্বাদশ শতকের ভবদেব ভট্ট ও জীমূতবাহন ; মসুর ডালের স্বপক্ষে পাঁতি দিয়েছেন রঘুনন্দন, ষোড়শ শতকে। সাদা তাল এখন বোধহয় কদাচিৎ মেলে ; হয়ত সেকালে তা ছিল পর্যাপ্ত। কোনো প্রকার তাল খাওয়াকেই 'রোগমূলক' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থীতে

মুলা, ষষ্ঠীতে নিম ও চতুর্দশীতে মাসকলাই নিষিদ্ধ। আর কি কি নিষিদ্ধ?—রাত্রে দধিভোজন; এবং সুদখোর, অগ্রদানী ও চিকিৎসক ব্রাহ্মণের অন্ন।

পুরাণটির 'শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে' দেখা যায়ঃ পাপক্ষয় হয় তুলসী পাতা, সাদা ফুল, সাদা ধান, দধি, ঘি ও মধু দর্শনে। পুণ্য হয় অক্ষত চাউলযুক্ত দূর্বা, পক্কান্ন ও পরমান্ন বা পায়স দর্শনে। আট বছরের কুমারী কন্যার বিবাহ দিলে গৌরীদানের ফল লাভ হয়—এ বিয়ে দেখলে এককোটি স্বর্ণদানের ফল লাভ হয়; শালগ্রাম-শিলারূপী কৃষ্ণ বা নারায়ণের পূজা করলে ও তাম্বুলদানের ফলে ঘটে শতবর্ষ স্বর্গভোগ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের একটি অধ্যায়ে রয়েছে স্বপ্নদর্শন পর্ব অর্থাৎ মানুষের পক্ষে কোন্ স্বপ্নদর্শন শুভ, কোন্‌টি অশুভ তার বিচার। এ দপ্তরে পাওয়া যাবে বহুপ্রকার স্বপ্নের ফলাফল। গণক ঠাকুরদের ছিল এ নিয়ে কারবার; পুরোহিতেরাও এই পুরাণটিকে সম্বল করে স্বপ্নফল বিচার করতেন। দুঃস্বপ্ন-দর্শনে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের বিধান দেওয়া হত; এখন তার মাত্র 'দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দ'-টুকুই বজায় রয়েছে। কিন্তু ত্রয়োদশ শতক থেকে বহুকাল পর্যন্ত এ সম্পর্কে জনসাধারণের কৌতূহল ও বিশ্বাস ছিল অপরিসীম, কারণ দ্বাদশ শতক থেকেই মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস কমে গিয়ে দৈবের প্রতি নির্ভরতা বেড়ে চলেছিল। তারা স্বপ্নদর্শনের পরেই দৈবজ্ঞ বা পুরোহিতের দুয়ারে ধরনা দিত।

এ সব ফলাফলের পেছনে যে কোনো সুবিন্যস্ত মতবাদ বা চিন্তাধারা ছিল তা নয়; ব্যাপারটার পত্তন হয়েছিল, হয় ভূয়োদর্শন অথবা নিতান্তই লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে। কিন্তু এটিই এখন পাশ্চাত্ত্যের বিখ্যাত মনোবিদ্যাবিশারদ ফ্রয়েডের মনঃ-সমীক্ষণের পরম সহায়ক ও দিগ্দর্শক হয়ে উঠেছে। সে হিসাবে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের এই পর্বটির মূল্য রয়েছে।

এখানে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উল্লিখিত দু'টি স্বপ্নফলের কথা উদ্ধৃত করছি ঃ

মানুষ পাখির মাংস অথবা মানুষেরই মাংস খাচ্ছে এরূপ স্বপ্ন দেখলে প্রচুর অর্থ, অভিপ্রেত ফল ও শুভসংবাদ পাবে।

স্বপ্নে সাদা বা হলদে রঙের শাড়ি ও নানা অলঙ্কার-পরা নারী যাঁর প্রতি সদয় হন, তিনি কবি ও পণ্ডিত হন, যাঁকে বই দেন, তিনি হন পণ্ডিতপ্রধান, কবিশ্রেষ্ঠ ও বিশ্ববিখ্যাত; যাকে শিক্ষাদান করেন, তিনি হন সরস্বতীর বরপুত্র।

এ থেকেই হয়ত সরস্বতী পূজার দিন মেয়েরা হলদে রঙের শাড়ি পরে; সরস্বতীর অঙ্গেও সে রঙের শাড়ি ওঠে।

সামাজিক দিক্ থেকে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ড বা দশম অধ্যায়টির মূল্য সমধিক। এতে হিন্দুর জাতি-বিভাগের কথা রয়েছে। কিন্তু জাতিটা যে কর্মগত, ধর্মগত নয় সে কথাও বোঝা যায় সুস্পষ্ট-ভাবে। জাতিভেদকে বোঝানো হয়েছে রূপকের ছলে। যেমন, বিশ্বকর্মার ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে হল আটটি পুত্র; এরা যথাক্রমে, মালাকার, কর্মকার, কাংস্যকার অর্থাৎ কাঁসারী, শঙ্খকার অর্থাৎ শাঁখারী, কুবিন্দক অর্থাৎ তাঁতী, সূত্রধর বা ছুতার, স্বর্ণকার বা সেকরা আর চিত্রকার বা যারা ছবি বা নকশা আঁকে।

এবার এসব শিল্পকর্মীদের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক।

বাঙলার প্রধান চালানী কারবার ছিল দু'টি জিনিসের—কাপড় ও গুড় বা চিনি। এর সঙ্গে থাকত কিছু পিতলের বাসন-কোসন, কাগজ ও শাঁখের তৈরি অলঙ্কার প্রভৃতি। প্রধান দু'টি জিনিসের ক্ষেত্রে কর্মীরা যে শুধু পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই কাজ করত তা নয়, কয়েকজনে মিলেমিশে সমবায়ও গড়ত; তাতে গড়ে উঠত ছোটোখাটো কারখানা, পরবর্তী কালে বিদেশীদের 'ফ্যাক্টরি'র শিশু-সংস্করণ।

কাপড় তৈরি হত তিন শ্রেণীর—সুতী, পশম ও রেশম।

গুজরাটও কাপড় তৈরি করে চালানী কারবার করত। অনেক বিদেশী বলেছেন, বাঙলায় যত প্রকার ও যে-পরিমাণ কাপড় তৈরি হয় পৃথিবীর আর কোথাও তা হয় না। কাপড়ের নামগুলি ছিল অদ্ভুত ; বৈরাম, নামোনি, লিজাতি, কেইনটার, ডাউজার, সিনাবাফ। এর মধ্যে 'সিনাবাফ' পরে পারশ্য ও আরবের সওদাগরদের নেকনজরে পড়ে, পাগড়ি হয়ে উঠল তাদের মাথায়, আর সার্ট হয়ে ঢাকল তাদের দেহ। আরো পরবর্তী কালে ইউরোপের নারীরা একে মাথায় তুলে নিলেন। কিন্তু এ সব কাপড়ের মধ্যে প্রভেদটুকু যে কি এবং কি দিয়ে সব তৈরি তা জানার কোনো উপায় নেই।

চিনি, মিছরি, ও গুড় তৈরি হত আখ থেকে। আখকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে তা পেষণ করে বের করা হত রস। তারপর বড় বড় লোহার পাত্রে জাল দেওয়া হত। প্রথম তৈরি হত গুড়ের খণ্ড : আখের রসকে পরিশুদ্ধ করে নিলে হত চিনি ; আরো পরিশুদ্ধ করলে হত খণ্ড খণ্ড মিছরি। কি দিয়ে যে পরিশুদ্ধ করা হত তা বলা যাবে না। তবে তিনটি জিনিসই চামড়ার ব্যাগে পুরে দেশ-বিদেশে পাঠান হত।

চর্মকারেরা শুধু এই ব্যাগই তৈরি করত না। তৈরি করত ঘোড়ার জিন ও লাগাম, তলোয়ারের খাপ, বইএর মলাট, জুতা ইত্যাদি।

কাগজও তৈরি হত প্রচুর। সাধারণের ধারণা কাগজ তৈরির কায়দাটা প্রথম শিখে চীনারা, তারপর তাদের শিক্ষানবিসি করে তা আয়ত্ত করে মুসলমানেরা। ধারণাটা অমূলক, কারণ বহুপূর্ব থেকে চীনারাও বাঙলার সাদা কাগজের উল্লেখ করে গেছে : সে কাগজ ছিল হরিণের চামড়ার মত চকচকে ও মসৃণ। এ কাগজ তৈরি হত গাছের বাকল থেকে। নেকড়া থেকে কাগজ তৈরির কায়দাটা সম্ভবত প্রথম বের করে সমরখণ্ডের কাগজীরা।

পিতলের জিনিসের মধ্যে বেশির ভাগ তৈরি হত ঘটি, বাটি, থালা, পানের ডাবর, রাঁধাবাড়ার সরঞ্জাম, পিলসুজ ও মুচি।

চাষীদের চেয়ে সম্ভবত এসব কর্মীদের আর্থিক অবস্থা কিছু ভাল ছিল।

সিল্কের 'আঁতুড় ঘর' কি চীন না বাঙলা, তা নিয়ে তর্কবিতর্ক রয়েছে। রোমান সাম্রাজ্য ভাগাভাগি হয়ে যাবার পরে ভারতবর্ষের সঙ্গে তার সরল যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু সিল্কের কদর তখন ইউরোপে প্রবল। তার সুযোগ নিয়ে পারশ্য ভারতবর্ষের সিল্ক খুবই চড়া দামে বিক্রি করতে শুরু করল চতুর্থ শতকের রোমান রাজা কনস্টেনটাইনের কাছে। কনস্টেনটাইনের ইচ্ছা হল সিল্ক তৈরির কায়দাটা আয়ত্ত করার। তিনি ভারতবর্ষে দু'জন পাদরী পাঠিয়ে দিলেন। তারা সিল্কের পোকা থেকে সুতা কি করে তৈরি হয় ও সে সুতায় কি করে কাপড় বোনে তা শিখে, পরে গেল চীনে। চীন থেকে আসার সময়, তারা নিয়ে এল কিছু সিল্কের পোকা বাঁশের চুঙ্গিতে ভরে ; তারপর তারা সোজা দেশে দিল পাড়ি। এর ফলে, ভূমধ্যসাগরের কোনো কোন দ্বীপে ছোটখাটো সিল্কের কারখানা গড়ে ওঠেছিল বটে, তবে মোটামুটি এ উদ্যম সফল হয়নি।

এবার বাঙলার শিল্পকর্মীদের কথায় ফিরে যাওয়া যাক।

বিশ্বকর্মা শিল্পপিতা ; তার গোষ্ঠীগোত্রের আটটি বিভাগ বা শ্রেণী (যাকে guild বলতে পারা যায়) ; এর সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কি ? কাজেই এদের ভিন্ন জাতি না বলে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মী বলা সঙ্গত। এই সুসঙ্গত শ্রেণীবিভাগকে অসঙ্গত ধর্মবিভাগের দ্বারা চিহ্নিত ক'রে বাঙলার সমাজকে দুর্বল ক'রে ফেলেছে কিছু সংকীর্ণচেতা মানুষ। কোনো কোনো শ্রেণীকে পতিত বলে বর্ণনা করে তার চুলচেরা বিভাগ করেছে নানা অর্থহীন কারণে। সে কারণের মূলকথা—তারা সঙ্কর জাতি। বর্ণসঙ্কর বিবাহ যে সেকালে বহু হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। দ্বাদশ শতকে এই যথেচ্ছ যৌনাচারের তালিম দেওয়া হয়েছে নানাভাবে। 'শেক শুভোদয়া'র ভাষায়—

"যত্র রাজা চ মন্ত্রী চ দ্বৌ অপি পরদারিকৌ
তস্য রাষ্ট্রবিনাশঃ স্যাৎ সংশয়ো নাত্র বিদ্যতে।"

অর্থাৎ রাজা লক্ষ্মণসেনকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, যে রাষ্ট্রের রাজা ও মন্ত্রী উভয়ই পরের পত্নীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত সে রাষ্ট্রের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

এ রাজ্যের ভ্রষ্ট সমাজকে আর কে রক্ষা করবে? দ্বাদশের কৃত পাপের ফল ফলেছে ত্রয়োদশে-চতুর্দশে। এই সাংকর্য-দোষেই হিন্দু সমাজের মধ্যে হয়েছে নানা শ্রেণীর উদ্ভব, এবং পঙ্কিল জলাশয়ের মত সেখান থেকে বিষবাষ্প ওঠেছে প্রচুর।

রূপকে দেখা যায়, দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে ব্যভিচারে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মেছে চিকিৎসা-শাস্ত্রব্যবসায়ী (বৈদ্য ?), জ্যোতিঃশাস্ত্রী গণক, লোভী অগ্রদানী আর ভাট। ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জন্মেছে চণ্ডাল। এই দীর্ঘ তালিকায় আমাদের প্রয়োজন নেই।

তবে ত্রয়োদশে যে দ্বাদশের বিষফল আরো সরস হয়েছে তার প্রমাণ রয়েছে ঐ পুরাণখানির মধ্যে উপপতি ও উপপত্নীর সমাজগত সম্বন্ধ স্বীকারে। সেখানে উপপতিকে বলা হয়েছে স্বামীতুল্য, উপপত্নীকে গৃহিনীতুল্য! যদিও সঙ্গে সঙ্গেই বলা হয়েছে এই সম্বন্ধটা সর্ববাদিসম্মত নয়—দেশ-বিশেষে প্রচলিত। এটি বিশ্বামিত্র-বিরচিত, কিন্তু বেদবিহিত নয় বলে নিন্দিত।

এবার বৃহদ্ধর্মপুরাণের কথা।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত মতের একটা সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা হয়েছে ; এটিকে দুর্গোৎসবে পঠনীয় ও এই তিন গোষ্ঠীরই শাস্ত্র ব'লে বলা হয়েছে।

যে স্মার্ত পণ্ডিতেরা এ পুরাণটি রচনা করেছেন, তাঁরা সবাই যেন দুর্গাপূজা-প্রচারে ব্রতী বলে মনে হয়। এ পুরাণের মতে, যে মন্দমতি বার্ষিক দুর্গাপূজা না করে অন্য সকল দেবতা পূজা করে তার সমস্ত পূজাই বিফলে যায়। দুর্গাপ্রতিমার সঙ্গে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ শিবলিঙ্গও

পূজা করতে বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, দেবী ভগবতী স্বয়ং ভগলিঙ্গরসের প্রিয়; তাঁর পূজার দিনে ভগলিঙ্গাদি শব্দ উচ্চারণ করতে পারবে। পুরাণটি এ তথ্য বন্য শবরদের প্রথা থেকে গ্রহণ করেছে, যথাস্থানে তা বলা যাবে। তবে এসব সত্ত্বেও বাঙলায় দুর্গাপূজার প্রচলন ষোড়শ শতকের পূর্বে ঘটেনি।

দ্বাদশ শতক থেকে যে বাঙালী পুরুষকারের কথা ভুলে শুধু দৈবেরই শরণ নিয়েছে তার চিহ্ন রয়েছে এ পুরাণটিতে। "ন চ দৈবাৎ পরং বলম্" এ কালের আদর্শ। দৈব কি? প্রাক্তন কর্ম বা ঈশ্বরেচ্ছাই দৈব।

এটি যে বৈষ্ণব, শৈব ও শক্তি-পূজকদের সমন্বয়ের চেষ্টা তা বোঝা যায় এর তুলসীপত্র-প্রশস্তিতে। "তুলসীপ্রীতয়ে বিষ্ণোঃ শিবায়াশ্চ শিবস্য চ" অর্থাৎ তুলসীপত্র বিষ্ণু, শিব ও শক্তির (দুর্গার) প্রীতি-সম্পাদক। পরবর্তী কালে শুধু বিষ্ণুপূজায়ই ব্যবহৃত হয়েছে তুলসীপত্র। এ পুরাণটি এই তিনটি গোষ্ঠীকেই একত্র ডাক দিয়ে বলেছে, কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণব কেউ নারীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করবে না, বা অন্য কোনো প্রকারে কষ্টও দেবে না।

পুরাণটি যে চাতুর্বর্ণ্য ধর্ম-স্থাপনের পরম প্রয়াস তার প্রমাণ রয়েছে এর ব্রাহ্মণ-প্রশস্তিতে। "নিবসন্তি দ্বিজা যত্র তীর্থং তৎ ক্ষিতিমণ্ডলম্" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের আবাসই তীর্থক্ষেত্র। ব্রাহ্মণের পক্ষে গব্যবিরহিত ভোজন অনুচিত। অন্ত্যজ জাতিস্পর্শে স্নান বিধেয়।

হবিষ্যান্ন কাকে বলে? হিঞ্চেশাক, কালশাক, কেমুক ভিন্ন মূল, সৈন্ধব ও সামুদ্র লবণ, গব্যদধি ও ঘৃত, আম, হরীতকী, পিপ্পলী, জীরক, নাগরঙ্গ, চিন্তিড়ী, কদলী, লবনী, ধাত্রীফল, গুড় (এ ছাড়া আখের রস থেকে তৈরি অন্য বস্তু নিষিদ্ধ), তৈল ছাড়া অন্য পক্ব দ্রব্য।

ব্রহ্মচারীর পক্ষে মসুর ডাল, আমিষ, তৈল, তাম্বুল গ্রহণ নিষিদ্ধ; খাটের উপরও সে শয়ন করতে পারবে না।

ব্রাহ্মণের নামের অন্তে থাকবে দেব ও শর্মা; তার কাজ হবে

যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের নামের শেষে থাকবে রায় ও বর্মা ; তার কাজ হবে ব্রাহ্মণপূজা, প্রজা-রক্ষা, দান, যুদ্ধ ও করগ্রহণ। বৈশ্যের নামের শেষে থাকবে ধন ; তার কাজ হবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সেবা, ধনসঞ্চয়, বাণিজ্য ও দান। শূদ্রের নামের শেষে থাকবে দাস ; তার কাজ হবে সেবা।

স্ত্রী ও শূদ্রের বেদে অধিকার নেই।

বাঙলার সমাজ আগাগোড়াই যে মাতৃকেন্দ্রিক তারও চিহ্ন রয়েছে একটি অনুশাসনে ; পুত্র একসাথে বাপ-মাকে দেখতে পেলে আগে মাকে প্রণাম করে পরে বাপকে প্রণাম করবে।

সমাজে যে সংগীতচর্চা সেকালে ব্যাপক ছিল তার প্রমাণ রয়েছে চতুর্দশ অধ্যায়ে। সেখানে ছয়টি মূল রাগের কথার উল্লেখ রয়েছে ঃ কামোক, বসন্ত, মল্লার, বিভাষ বা বিভাষক, গান্ধার ও দীপক। এদের প্রত্যেকেরই ছয়টি করে পত্নী বা রাগিণী আবার দাসদাসীও রয়েছে কারো কারো ; সব মিলে রাগ-রাগিণীদের সংসার বিরাট্‌ ও জমজমাট।

সেকালের ফুল, ফল ও গাছপালারও একটি তালিকা রয়েছে। তার মধ্যে পাওয়া যাবে মালতী, মল্লিকা, যূথিকা, টগর, কুন্দ, শেফালিকা, ধুতুরা, মুচুকুন্দ, কদম্ব, কাঁঠাল, আম, আম্রাতক বা আমড়া, অশ্বত্থ, বট, নিম, চন্দন, লাঙ্গলী বা নারিকেল গাছ, তাল, গুবাক বা সুপারি, বেত, বাঁশ, খেজুর ও হিন্তাল বা তালজাতীয় গাছ।

উৎসবেরও একটি তালিকা দেখা যায়—অক্ষয়তৃতীয়া, আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী, মনসাপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, শ্রীপঞ্চমী (অর্থাৎ লক্ষ্মী, মহাকালী ও সরস্বতী পূজা), শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, শারদীয়া দুর্গাপূজা। একালের তালিকায় এদের প্রায় সব কয়টিই বর্তমান।

যাত্রাকালে যা শুভলক্ষণ বলা হয়েছে তা এখনও হিন্দুসমাজ মেনে চলে ঃ যেমন, বাছুর-সহ গাই, দই, সাদা ফুল, সুন্দরী স্ত্রী, হাতি, ঘোড়া, দূর্বা, সাদা ধান, জলভরা ঘট, শেয়াল, ব্রাহ্মণ, সাদা চিল, খঞ্জন পাখি, সৎলোক।

ত্রয়োদশে হিন্দুসমাজ অপেক্ষাকৃত সহনশীল ছিল, বিশেষ করে যৌনব্যাপারে। তাই নানাপ্রকার পুত্রের স্থান হত সমাজে; ঔরসজাত ছাড়া এদের মধ্যে ছিল ক্ষেত্রজ অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর গর্ভে কিন্তু স্বামীর সম্মতিক্রমে পরপুরুষ-জাত, দত্ত, কৃত্রিম বা পরপুত্রকে নিজপুত্র বলে কল্পনা, গূঢ়সম্ভব অর্থাৎ নিজগৃহে অজ্ঞাতজন্মা, কানীন —অর্থাৎ পিতৃগৃহে অনূঢ়া কন্যার পুত্র।

পুরাণকার যুগধর্ম এড়াতে পারেননি। একালে অবশ্য ভগবতীর ভগলিঙ্গপ্রিয়তার কথা শুধু অশোভন নয়, ন্যক্কারজনক বলে মনে হয়, কিন্তু ত্রয়োদশের যৌনধর্মী জনসাধারণের কাছে এসব অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। তবুও পুরাণকার ম্লেচ্ছ ও যবননারীগমনে জাতিপাতের ভয় দেখিয়েছেন।

বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণের কোনো হদিস এখনো পাওয়া যায়নি— পাওয়া গেছে বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত দুর্গাপূজাপদ্ধতি। পূজার পদ্ধতিতে গণেশপূজা, চণ্ডীপূজা ও বিল্ববৃক্ষপূজার কথা রয়েছে। এ দুর্গা মার্কণ্ডেয় পুরাণ-বর্ণিত চণ্ডীই বটে, তবে হয়ত বাঙালীর হাতে পড়ে দেবী হয়েছেন হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রী, লক্ষ্মী হয়েছেন ধান্যাধিষ্ঠাত্রী ইত্যাদি; অর্থাৎ পূজ্যা দেবীদের সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে বাঙলার ফসলের। বাঙলার দুর্গাপূজার পদ্ধতির মূলে যে বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ ও কালিকা পুরাণের সংযোগ রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাঙলায় দুর্গাপূজার প্রচলন ঘটেছে অনেক পরে, সম্ভবত ষোড়শ শতকে। যথাকালে সে কথায় আসা যাবে।

এবার সেকালের শিক্ষাপদ্ধতির কথা একটু বলা যাক।

দেশে ইসলামের দৌরাত্ম্যে একে একে বৌদ্ধবিহারগুলি ধ্বংস হয়ে গেল। গেল অবশ্য বহু মন্দিরও, কিন্তু মন্দিরের সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থার সংযোগ ছিল না, ছিল বৌদ্ধবিহারের সঙ্গে। বৌদ্ধবিহারে পালি, সংস্কৃত ও ধর্মশাস্ত্রের পাঠ চলত।

এদিকে হিন্দুরাজারাও একে একে বিলুপ্ত হতে শুরু করল, আবার

সুলতানদের রাজকোষ থেকে শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য কোনো সাহায্যও মিলত না। ফলে শিক্ষা-ব্যবস্থার সমস্তটা ভার এসে পড়ল আঞ্চলিক সমাজের স্কন্ধে। যতদূর দেখা যায়, সাধারণ শিক্ষা হত পাঠশালায়, উচ্চতর শিক্ষা হত টোলে। পাঠশালার জন্য সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট ঘর ছিল না ; গ্রামের কোনো বিত্তশালী লোক তাঁর বৈঠকখানার পাশে পড়ুয়া ও পণ্ডিতমশাই-এর মাথা গোঁজবার মত একটু স্থান করে দিতেন। চেয়ার, বেঞ্চি, টুল বা ব্ল্যাকবোর্ডের প্রচলন সেকালে ছিল না। পড়ুয়াই তার বসার জন্য আসন নিয়ে আসত ; পণ্ডিত-মশাই সাধারণত পড়ুয়াদের কাছে বেতনের হিসাবে পেতেন সিধা। ভিন গাঁয়ের লোক হলে তাঁর শোবার ব্যবস্থা হত সেই বিত্তশালী ভদ্রলোকের বৈঠকখানায়ই। রসুইখানারও একটা ব্যবস্থা হত। এর উপর বিত্তশালী ব্যক্তিটি তাঁকে হয়ত মাসহারা বাবত সামান্য কিছু অর্থ দিতেন। পাঠশালায় সাধারণত পড়ান হত বর্ণপরিচয় ও সাধারণ অঙ্ক—যার প্রয়োজন পড়ত প্রাত্যহিক জীবনে।

টোলে দেওয়া হত উচ্চাঙ্গের পাঠ—সংস্কৃতে, প্রাকৃতে, বাঙলায় ও পালিতে। পণ্ডিতমশাইয়ের বাসগৃহেই থাকত টোলের পড়ুয়া ; অধ্যয়নের জন্য কোনো বেতন দিতে হত না। সাধারণত পণ্ডিতেরা ছিলেন স্মার্ত, কেউ বা সঙ্গে সঙ্গে ফলিত জ্যোতিষের চর্চা করতেন, করতেন যজন, যাজন, দিতেন পাঁতি। এসব করেই তাঁদের জীবিকা-নির্বাহ হত ; হয়ত বা আঞ্চলিক বিত্তশালী ব্যক্তিরা তাঁকে একটা মাসিক বৃত্তিও দিতেন।

বিদ্যারম্ভ হত হাতে খড়ি অর্থাৎ খড়িমাটি (সংস্কৃত খটিকা বা খটী) দিয়ে। তখনও শ্লেট, পেনসিল-এর প্রবর্তন হয়নি ; তা হয়েছে মাত্র অষ্টাদশ শতকে। শুষ্ক মাটির উপরই হয়ত চক বা খড়িমাটি দিয়ে পড়ুয়াদের গুরুর লেখার উপর মক্শ করতে দেওয়া হত। কোথাও কোথাও কঞ্চি বা কুটা দিয়েও ধূলা বা বালির উপর লেখা হত। মস্যাধারে থাকত কালি ; সে কালি তৈরী হত প্রদীপের ভুসায় অথবা

হরীতকী ও বহেড়া বা বয়ড়া প্রভৃতি দিয়ে। দোয়াত আরবী শব্দ ; সেটি এসেছে কিছু পরে। কলম শব্দটিও মূলত আরবী। খাগড়া (খাগ বা খাক) কেটে তৈরি হত কলম : কালি-কলমে লেখা হত কলাপাতায়, তালপাতায় ও ভূর্জপত্রে (বাকলে)। পাখির পালক কেটেও কলম তৈরি হত। তুলট কাগজের অভাব ছিল না। বাঙলায় বহু পুরনো কাল থেকেই প্রচুর কাগজ তৈরি হত,—তা বলে গেছেন হিউয়েন সাং ও ইৎসিং সপ্তম শতকে। কাগজ শব্দটি ফারসী : সংস্কৃতে একে বলা হত পত্র। বিক্রমপুরের 'কাগজী' সম্প্রদায় বহুকাল থেকেই এ ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল ; এদের তৈরী কাগজ ছিল ঈষৎ হরিদ্রাভ, মাপে আধহাত চওড়া ও দেড়হাত দিঘল। বাংলার কাগজ বলে এটিও ছিল বিখ্যাত, তবে পুরনো 'বাঙলার সাদা কাগজে'র কথা পূর্বে বলা হয়েছে ; তার মর্যাদা ও সুনাম ছিল এর চেয়ে অনেক বেশি। চীনারাই প্রথম কাগজ তৈরি করে এ কথাটা সত্য না হবারই সম্ভাবনা। মস্যাধার, লেখনী, পুঁথি ইত্যাদি সেকালে একটি ছোট ঝাঁপিতে রাখা হত ; তার নাম ছিল 'খুঙ্গী'। তালপত্রে বা ভূর্জপত্রে লেখা পুঁথিগুলিও পাতলা কাঠের আবরণে রক্ষা করা হত ; সে আবরণকেও বলা হত 'খুঙ্গী'।

কোনো কোনো টোলের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পণ্ডিতমশাইরা মাঝে মাঝে দিগ্বিজয়ে বের হতেন ; যেতেন বিশেষ করে নানা বিখ্যাত শিক্ষা-কেন্দ্রে। তার মধ্যে কাশী বা বারাণসী অন্যতম ; বাঙলার বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। বৈদিক যুগ থেকেই পণ্ডিতের সভায় বিচার-বিতর্ক করে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করার রীতি ছিল।

বাঙলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা ছিল বহুকাল পর্যন্ত। কাজেই বৌদ্ধ যুগের মত ছেলেমেয়েদের পাঠ দেওয়া হত একই রূপে। পাঠশালায়ও তারা একত্রে পড়ত ; পৌরাণিক ধর্মের প্রবর্তনের ফলে অর্থাৎ সেন রাজাদের আমলেও, সে রীতির পরিবর্তন হয়নি।

মুসলমানী আমলে হয়ত ক্রমে ক্রমে তা ব্যাহত হয়েছিল, কারণ পর্দা-মানা ক্রমশ আভিজাত্যের লক্ষণ বলে গণ্য হয়েছিল।

শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে যে শরীর-চর্চারও স্থান ছিল তার প্রমাণ রয়েছে। মেয়েদের শিক্ষায় গান, বাজনা ও নাচ এ তিনটিই ছিল অন্তর্ভুক্ত। রঞ্জনবিদ্যা ও চিত্রবিদ্যায়ও এদের দক্ষতাকে অত্যন্ত গৌরবজনক বলে মনে করা হত।

বাঙলায় শকাব্দের প্রচলন ঘটে সেন রাজাদের কালে -দ্বাদশ শতকে। তুর্কীরা তাদের অধিকৃত এলাকায় 'হিজরা' সাল চালু করার চেষ্টা করল। তা চালুও হল অফিস আদালতের ব্যাপারে, আর মুসলমানী পার্বণে। কিন্তু অন্যত্র শকাব্দই চলতে লাগল; তারপর হিন্দুর 'তিথি'র রাজত্বে কোনো ভাঙ্গন ধরল না। হিজরা নিরেট চান্দ্র অব্দ—হজরত মহম্মদের মদিনা যাত্রার দিন থেকে এর গণনা শুরু। সম্ভবত খলিফা ওমর এই অব্দের প্রবর্তক এবং এর জন্মক্ষণ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যা।

'মানুষ ভাগ্যের ক্রীড়নক মাত্র'—এ ধারণা বাঙালী সমাজে যত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে লাগল, তত বাড়তে লাগল তিথি-মাহাত্ম্য, কোষ্ঠী-বিচার ও শাকুন-শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের প্রভাব। সেক সাহেবেরা আপন স্বার্থে এ ধারণাকে প্রবলতর করতেই সচেষ্ট হলেন। স্বার্থটা কি? স্বার্থ ধর্মান্তরকরণ। সেক-শুভোদয়ার পীর সাহেব হলায়ুধের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন ঃ

"যদ্যপি যাবনিকং কর্তুং সমায়াতঃ তদা রক্ষিতুং কোঽপি শক্তঃ।"

"দৈবেন ক্রিয়তে যত্তু নান্যথেতি কদাচন।"

—অর্থাৎ যদি সত্যই সেক সাহেব আমাদের ইসলামে দীক্ষা দিতে এসে থাকেন, তবে আমাদের রক্ষা করার অর্থাৎ হিন্দুধর্মে ধরে রাখার সাধ্য কার? ভাগ্যে যা রয়েছে তা ঘটবেই।

সূর্যের গতির তুলনায় চন্দ্রের গতি অনিয়ন্ত্রিত, অনির্দিষ্ট; কাজেই সৌর দিন ও চান্দ্র দিনে অর্থাৎ তিথিতে প্রভেদ। তাই তিথি সম্পর্কে

নানা তর্কবিতর্ক থাকবেই। এই সূত্রে 'পঞ্চাঙ্গ' বা পঞ্জিকা বা পঞ্জিকা তৈরি হল অনেক; এদের মতভেদ তিথি নিয়ে। এই পঞ্চাঙ্গ কি কি? অর্থাৎ পঞ্জিকার মধ্যে ফলিত জ্যোতিষের কাজে লাগতে পারে এমন কি কি জিনিস পাওয়া যায়? এগুলি হল তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ ও করণ। তিথি, বার, নক্ষত্র সবারই পরিচিত জিনিস; যোগ হল গণিত জ্যোতিষের মতে কালের একটা বিশিষ্ট অংশ, আর করণ হল দিনের একটি অংশ। দিন এগারোটি ভাগে বিভক্ত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাল

(চতুর্দশ শতক)

[পাঁচ]

শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২)

ফখরুদ্দীন (১৩৩৮-১৩৫০)

ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮/৫৯)

সিকন্দর শাহ (১৩৫৮-১৩৯১)

আজাম শাহ (১৩৯১-১৪১০)

প্রথমে চতুর্দশ শতকের বাঙলার রাজনৈতিক পটভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। ত্রয়োদশের শেষপাদে বুগরাখান ও তাঁর দ্বিতীয় ছেলে রুকনুদ্দীন কাইকাউস বাঙলার স্বাধীন সুলতান হিসাবে রাজ্য চালান। তারপর তাঁদেরই এক অনুচর শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ শক্তিশালী হয়ে তক্ত দখল করেন। তিনি শুধু তক্তেই বসলেন না, রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমে লখনৌতি বা গৌড়ে ও পুবে সোনারগাঁয় শক্ত ঘাঁটি বাঁধলেন, আর তাদের যোগসূত্র হিসাবে মধ্যপথে সপ্তগ্রামে বা সাতগাঁয় প্রতিষ্ঠা করলেন তৃতীয় ঘাঁটি। সোনারগাঁয় তো বন্দর ছিলই, তখন থেকে সাতগাঁয়ও বন্দরের প্রতিষ্ঠা হল। এই শামসুদ্দীনের কালেই মুসলমান শ্রীহট্ট দখল করে পীর-দরবেশদের সাহায্যে। সে কথায় পরে আসা যাবে।

শামসুদ্দীনের মৃত্যুর পরে তার তিন ছেলের মধ্যে শুরু হল লড়াই। গীয়াসুদ্দীন তোগলক তখন দিল্লীর তক্তে; এসব গোলযোগের ফয়সালা করতে তিনি প্রচুর সৈন্য নিয়ে এলেন বাঙলায়। তিনি শামসুদ্দীনের এক ছেলে নাসিরউদ্দীনকে লখনৌতির তক্তে বসিয়ে পূর্ববাঙলা খাসদখলে নিয়ে এলেন। শাসক করলেন বাহ্‌রাম খানকে। বাহ্‌রাম খানের মৃত্যুর পরে তাঁরই এক অনুচর

ফখরুদ্দীন গদি দখল করলেন ; এঁরই কালে ইবন বতুতা এসেছিলেন বাঙলায়। তাঁর কথাও পরে বলা যাবে।

এসব গোলমালের ফলে বাঙলা দিল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, আর ইলিয়াস শাহ এসে দখল করল লখনৌতি, সোনারগাঁও ও সাতগাঁ। ইলিয়াস শাহ প্রায় অজ্ঞাতকুলশীল মানুষ কিন্তু তাঁর প্রতাপ ছিল অসাধারণ। দিল্লীর মসনদে তখন গীয়াসুদ্দীন তোগলকের ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজ ; তিনি এলেন বাঙলার জমিদারী দখল করতে। এলেন বটে বহু তোড়জোড় করে, কিন্তু পারলেন না কিছু করতে। ইলিয়াস আশ্রয় নিলেন একডালার দুর্ভেদ্য দুর্গে। তাঁর সহায় হল বাঙালী পদাতিক সৈন্য ; সে দুর্ধর্ষ সৈন্যের বূ্যহ ভেদ করা দিল্লীর সেনার পক্ষে হল অসম্ভব। বাঙালীর বীরত্ব অক্ষয় হয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেল। কে বলেছে সামরিক জগৎ বাঙালীর কাছে অগম্য, ভয়াবহ ?

এই বিখ্যাত একডালা দুর্গটি কোথায় ছিল তা নিয়ে মতদ্বৈধ রয়েছে ; কেউ বলেন, এটি ছিল আধুনিক দিনাজপুর জেলায়, কেউ বলেন, গৌড়ের লাগাও। কিংবদন্তী এটিকে পূর্ববঙ্গে গঙ্গা (পদ্মা) ও যমুনার সঙ্গমস্থলে, অধুনাতন গোয়ালন্দের অনতিদূরে ঠেলে দিয়েছে। বলা বাহুল্য, সেটি বহুদিন আগেই জলমগ্ন হয়েছে।

যাই হোক, ফিরোজকে হটে যেতে হল। কিন্তু আবার এলেন প্রায় ছ বছর পরে, পূর্ববঙ্গের গদিচ্যুত নবাব ফখরুদ্দীনের জামাতার অনুরোধে। তখন গৌড়-বঙ্গের গদিতে ইলিয়াসের ছেলে সিকন্দর। এবারও বাপের মতই সিকন্দর আশ্রয় নিলেন একডালায়, বাঙালী সৈন্যের হেপাজতে। ফলও একই রকম ফলল। কিন্তু সিকন্দরের কি মনে হল, হয়ত চিরবিদ্রোহের অস্থিরতার চেয়ে পছন্দ করলেন স্বস্তি। তিনি সোনারগাঁ ফিরিয়ে দিতে রাজী হলেন, কিন্তু ফখরুদ্দীনের জামাতা দিল্লীর সুখসুবিধা ছেড়ে শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের জল-জংগল ও রোগাকীর্ণ অঞ্চল, যাকে বলা হত 'ডোজাকপুর নিয়ামত'

বা নানা আশীর্বাদপূত নরক, সেখানে আর আসতে চাইলেন না। ফলে, ফিরোজ গৌড়-বঙ্গকে সিকন্দরের হাতেই তুলে দিয়ে, বার্ষিক কিছু ভেটের প্রত্যাশা নিয়েই দিল্লী ফিরে গেলেন। হয়ত মন দিলেন উদ্যান-রচনায়, কারণ তিনি দিল্লীর চারিদিকে বারোশ' বাগ-বাগিচা তৈরি করেছিলেন। কাজটা অবশ্য নূতন কিছু নয়; ভারতবর্ষের সর্বত্র ফুলের চাষ হত বহু পূর্বকাল থেকে।

তারপর বাঙলার নবাব প্রায় দু'শ' বছর দিল্লীর নামমাত্র তাঁবেদার হয়ে রইলেন।

সামাজিক বিচারে চতুর্দশ শতক মূলত ত্রয়োদশেরই অনুকৃতি; এ কালের চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' দ্বাদশের জয়দেবের গীত-গোবিন্দেরই সার্থক অনুসরণ। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশের বাঙালী সমাজ নিছক কামচর্চায় মোহগ্রস্ত, দুর্বল। সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চতুর্দশের প্রথম পাদে রচিত এবং হয়ত এ'খানিই প্রাচীনতম বাঙলা হরফের পুঁথি। ভাষার দিক্ থেকে পুঁথিখানির ভাষা হয়ত চর্যাপদেরই পরিণতি, মাঝে রয়েছে শূন্যপুরাণের ভাষা। চণ্ডীদাস এক বা বহু, আদি চণ্ডীদাসের বাড়ি বাঁকুড়া না বীরভূম, এসব তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই। তিনি বাঙালী এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে সেকালের বাঙালী-মানসের প্রতিচ্ছবি সে তথ্যটিই শুধু আমাদের বিষয়ান্তর্গত।

আমরা গীতগোবিন্দের ক্ষেত্রে যে-কথা করযোড়ে বলেছি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ক্ষেত্রেও সে-কথারই পুনরুক্তি করব। আমাদের বিচার সাহিত্য বা ভাষাগত নয়, সামাজিক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূলকথা 'ভাগিনা সুরতি মাগে দানের ছলে'। পরদার বলে রাধা রেহাই পেতে পারেন না কারণ,

> "নিজ পরনারী দোষ নাহিক সংসারে
> যত সতীপণ সব মিছা জাণ তারে॥
> পরদারে পাপ নাহিঁ বোলন্ত কাহ্ণাঞিঁ।"

এ কামলালসা সহজযানের 'স্বসংবেদ্য সুখে'র পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ; 'স্বসংবেদ্য সুখ' অর্থাৎ যে সুখ শুধু নিজেই বোঝা যায়, অপরকে বোঝানো যায় না। সে সুখ কি ?

"সুন্দর যুবক সমে যে হএ শৃঙ্গার
সকল সংসার মানে সেই সুখসার।"

শুধু সহজযান নয়, তন্ত্রের ষট্‌কর্মেরও প্রভাব রয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ;

"স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষণে
উছাটিন (উচাটন) বাণে লঅ রাধার পরাণে।"

এ ছাড়াও

"ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধি
মন পবন তাত কৈল বন্দী।"

এ সব যে নিছক নির্লজ্জ যৌন অনাচার তার চিহ্ন :

"সহজেঁ সুরতী ভুঞ্জ দেব গদাধর
নিশাস এড়িতেঁ মোকে দেহ অবসর।"

সামাজিক বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চতুর্দশ শতকের পূতিগন্ধময় সমাজদেহের নগ্ন মূর্তি। অন্ধ ভক্তির পূত চন্দনেও সে দুর্গন্ধ দূর করা যায় না।

ক্রমবর্ধমান অন্ধ ভক্তিবাদ একদিকে বাঙালী সমাজকে করে তুলল দুর্বল, যৌন অনাচার প্রবল হয়ে মানুষ হয়ে রইল মোহগ্রস্ত—আত্মরক্ষায় অসমর্থ ও বিমুখ ; তারপর গোড়া থেকেই তো ছিল দ্বিধাবিভক্ত সমাজ। নইলে গৌড়-বঙ্গে তুর্কী সৈন্যের প্রবেশও এত সহজ হত না। বাঙালীর মধ্যে যে শৌর্যবীর্যের অভাব ছিল তা নয়, তার প্রমাণ একডালায় বাঙালী পদাতিকের বীরত্ব—যার ফলে দিল্লী বহুকাল বাঙলা দেশে ঘেঁষতে আর সাহস পায়নি। কিন্তু বাঙালী শাসকের চরিত্রহীনতার ফলে যে সংহত শক্তি বাঙলার হতে পারত তা অনায়াসে দখল করে বসল তুর্কী শাসক, আর

পীর-দরবেশের কেরামতির ফলে বাঙালী সমাজের একটি বিশিষ্ট অংশ ইসলামী উত্তরীয় গায়ে দিয়ে নূতন এক ধর্মসাধনায় মত্ত হল। এই পরিণতি ঘটল বিশেষ করে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে।

এখনো শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আসর শেষ হয়নি। কীর্তনে সেকালের সামাজিক ইতিহাসের চিত্র কিছু কিছু রয়েছে। নানারূপ খোঁপা বাঁধা ছিল মেয়েদের সাজসজ্জার অঙ্গ ; তার মধ্যে 'ঘোড়াচুলা' হয়ত ছিল শ্রেষ্ঠ। 'খোঁপাত উপর তোর বউল মাল দেখী'—খোঁপার উপর বকুল মালা শোভা পেত। আর অলঙ্কার ছিল :

"সাতেসরী হার, কানের কুণ্ডল, মুকুটমাথার, হাথের বলয়, বাহুটী, আ-আর আঙ্গুঠী, কঙ্কণ, নূপুর ও কেয়ূর। পায়ে মগর খাড়ু, হাথে বলয়া।"

তারপর

"পাট পরিধান তোর নেতের আঁচল ল
মাণিকেঁ খঞ্চিল দুঈ পাশে"

ওড়নারও প্রচলন ছিল। পাটের শাড়ি ছিল মেয়েদের প্রিয় বস্তু, আর নেতবাস ও ময়ূরকণ্ঠী—দুই-ই বাঙলার প্রসিদ্ধ রেশমী কাপড়। তারপর "সীমন্তে সুরঙ্গ (হিঙ্গুলজাত উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট সিন্দূর), কাজলে উজল, কণ্ঠদেশে শঙ্খমালা, কর্পূরবাসিত তাম্বুল।"

শ্রীকৃষ্ণের বরবেশের রূপ দেখা যাক।

"ময়ূর পুছেঁ বান্ধিআঁ চুড়া
তাত কুসুমের মালা।
চন্দন তিলকে শোভিত ললাট
বেহ্ন চাঁদ ষোলকলা॥
নেত ধড়ী পরিধানে
হাথে কনকের বাঁশী।"

বৃন্দাবন খণ্ডে সেকালের ফলের একটি তালিকা পাওয়া যায়। তাতে রয়েছে :

"ছোলঙ্গ (টাবা), নারঙ্গ (কমলালেবু), কামরঙ্গ, আমু, লেম্বু, ডালিম্ব, জাম্বু, জাম্বীর, আম্বরা, 'চেরু বেরু অফেরু' (অজ্ঞাত), জলপায়ি, চালিতা, তেন্তুলি, সতকড়া (কমলাজাতীয়), গুআ, নারিকেল, কণ্ঠোআল (কাঁঠাল), তাল, কদলক, শ্রীফল, খরমুজা, বাঙ্গী।"

যাত্রাকালে 'হাছি জিঠী' অর্থাৎ হাঁচি, টিকটিকি ছিল প্রবল বাধা, পায়ে আঘাত পাওয়াও তদ্রূপ। তারপর আরো অশুভ লক্ষণ রয়েছে ঃ

"কথো দূরপথে মোঁ দেখিলো সুগণী (ব্যাধ)।
হাথে খাপর (খর্পর=নরকপাল) ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী ॥
কান্ধে কুরুয়া লআঁ তেলী আগে জাএ।
সুখান ডালেতে বসি কাক কাঢ়ে রাএ ॥"

দূতী পাঠাতে সঙ্গে দেওয়া হত পান-গুআ, বিভিন্ন জিনিসের উপর পণ্যশুল্কের ছিল প্রভেদ, কুতঘাট বা শুল্ক আদায়ের নির্দিষ্ট স্থান ছিল আর ছিল দানী বা শুল্ক-সংগ্রাহক। বাটোয়ার বা পথ-রক্ষকেরও খবর মেলে।

করতাল ও মৃদঙ্গেরও উদ্দেশ মেলে ; সহজিয়া বৌদ্ধদের মত কৃষ্ণমন্ত্রী হিন্দুরাও একালে সংকীর্তনে মত্ত হয়েছিল।

'নষ্টচন্দ্র' দেখলে যে মানুষের অপকলঙ্ক অনিবার্য সে প্রবাদের শুরু হয়েছে হয়ত একালেই বা তারও আগে।

"হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্রমাসে।
হাথ ভরিলোঁ কিবা পুরিণ কলসে ॥
ভূমিত আখর কিবা লিখিলোঁ জলে
মিছা দোষে বন্ধন আম্বার তার ফলে ॥"

এর সবগুলিই এখনো সারা বাঙলার হিন্দু সমাজ মেনে চলে ; কিছু কিছু মুসলমানেরাও। এর মধ্যে রয়েছে নষ্টচন্দ্র বা ভাদ্রের

শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ দেখা, পূর্ণ-কলসীতে হাত পোরা, মাটির উপর জলের আঁক দেওয়া।

মেয়েরা পসরা সাজিয়ে হাটে যেত : রাধাও যেত।

"ঘৃত, দধি, দুধ, ঘোলেঁ সাজিআঁ পসার
নেত বসন দিয়া উপরে তাহার ॥
আনুমতী লআঁ রাধা সাসুড়ীর থানে"—

রাধা হাটের পথে পা বাড়াত।

বাঙলার প্রবাদ 'গুপ্ত বৃন্দাবন' বা গোপনে দুশ্চরিত্রতা-সূচক কাজের সম্পর্কে শ্লেষ একালেরই উৎপত্তি বলে মনে হয়। চর্যাপদের 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রূপ পেয়েছে 'আপণ গাএর মাঁসে হরিণি বিকলী'।

পিঙ্গল কথাটি যদিও অতি প্রাচীন তবুও বিদ্বজ্জনের মতে 'প্রাকৃত-পিঙ্গল' চতুর্দশ শতকের পূর্বে অধুনাতন আকারে গ্রথিত হয়নি। অনেক শ্লোকে বিখ্যাত রাজস্থানী রাজা 'হামিরের' উল্লেখ রয়েছে। হামির ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রায় চৌষট্টি বছর রাজত্ব করেন। কিছু কিছু শ্লোকে 'খোরাসান', 'উল্লা' প্রভৃতি মুসলমান-গন্ধী শব্দেরও সন্ধান মেলে। প্রাকৃত-পিঙ্গলে রয়েছে অবহট্‌ঠ বা অপভ্রংশ ভাষায় রচিত নানা শ্লোকের সমষ্টি : সেকালে প্রচলিত নানা কবির রকমারি ছন্দের সংগ্রহ। ছন্দের স্থান প্রাচীন ভারতে ছিল উচ্চে; ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে এটি অন্যতম।

এই ছন্দোমালার মধ্যে কোনো কোনটিতে সেকালের বাঙলার রীতিনীতির কিছু কিছু উদ্দেশ পাওয়া যায়। প্রাকৃত-পিঙ্গল নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে—হয়ত কালক্রমে তা থেকে আরো অনেক তথ্য পাওয়া যাবে।

স্থূলদৃষ্টিতে এখন যেটুকু তথ্য মেলে তা-ই উদ্ধৃত করছি। এরই চম্পকমালায় পাওয়া যায়ঃ

"ওগ্গর ভত্তা রংভঅ পত্তা
গাইক ঘিত্তা দুধ্ধ সজুত্তা
মোহণি মচ্ছা লালিচ গচ্ছা
দিজুহ কংতা খা পুণবংতা।"

অর্থাৎ কলাপাতে গরম ভাত— সঙ্গে গাওয়া ঘি, দুধ, মাছ ও নালিতা বা পাটশাক স্ত্রী পরিবেশন করছেন আর খাচ্ছেন তার পুণ্যবন্ত স্বামী।

এটি যে বাঙালী গৃহের চিত্র তাতে সন্দেহ নেই, কারণ গব্যঘৃতের সাথে তপ্ত অন্ন (কাঁচালঙ্কা সহযোগে কি ?) অন্যান্য প্রদেশবাসীরও রুচিকর হতে পারে, কিন্তু নালিতা ও মাছ বাঙলার নিজস্ব। টীকাকার বলেছেন, ভক্তং উদ্গলিতমণ্ডং, 'ঔগর' ধান্যবিশেষ, মোহণি মচ্ছা মদ্গুর মৎস্য, পাঠান্তরে মোদিনী মৎস্যা বা মনোজ্ঞ মৎস্য, নালীচো গৌড়দেশে 'অনেনৈব নাম্না প্রসিদ্ধঃ' শাকবৃক্ষবিশেষঃ।

আরো একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাক। এতে রয়েছে তন্ত্রের পঞ্চ 'ম'-কার সাধনার স্থূল ও নির্লজ্জ চিহ্ন।

"মংতং ণ তংতং ণহু কিংপি জাণে
ভাণং চ ণো কিংপি গুরুপ্পসাও।
মজ্জং পিবামো মহিলং রমামো
মোক্খং বজামো কুলমগ্গলগ্গা॥"

অর্থাৎ, মন্ত্রং ন তন্ত্রং ন হি কিমপি জানে ধ্যানংচ ন কিমপি গুরু-প্রসাদাৎ। মদ্যং পিবামো মহিলাং রমাম (মহে) মোক্ষং চ যামঃ কুলমার্গলগ্নাঃ।

মন্ত্র, তন্ত্র, ধ্যান কিছুই জানি না। শুধু গুরুপ্রসাদে কুলমার্গের পথ অনুসরণ করে, মদ-খেয়ে ও কামচর্চায় মোক্ষ লাভ করব।

সহজিয়া বৌদ্ধ ও নাথপন্থীদের সামাজিক বিভিন্নতা বিশেষ কিছু ছিল না, তারপর তান্ত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতার সেতু বেয়ে সহজিয়া বৌদ্ধ ও সাধারণ পৌরাণিক হিন্দুসমাজ অনেক কাছাকাছি এসে পড়ল। এর

ফলে গোঁড়া চাতুর্বর্ণ্য সমাজ এদের থেকে আরো দূরে সরে দাঁড়াল ; এই গোঁড়া দলের স্তম্ভস্বরূপ ছিল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও করণ বা কায়স্থ সম্প্রদায়। এদের সামাজিক ব্যবস্থা চলল স্মৃতিকারদের নির্দেশে।

শামসুদ্দীনের আমলেও গৌড়-বঙ্গ পুরোপুরি তুর্কীদের হাতে আসেনি। এদের দখলে ছিল উত্তর বঙ্গ বা গৌড়-লখোতি, উত্তর রাঢ়ের কিছু অংশ ও পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গের কিছু। গোঁড়া পৌরাণিক সমাজের বহুলাংশ এদেশ থেকে সরে এসেছিল হিন্দু রাজার এলাকায়। তুর্কী এলাকায় রইল সব সহজিয়া বৌদ্ধ, নাথপন্থী আর কিছু হিন্দু। এদিকে চতুর্দশ শতক থেকেই একের পর এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর আস্তানা দখল করতে লাগল পীর-দরবেশরা, তৈরি হতে লাগল একের পর এক মসজিদ, দরগা ও খানকা। এই পীর-দরবেশদের সাধারণ নাম সুফী ; এদের কথা পরে বলা যাবে। তুর্কী শাসকদের যতটা মন না ছিল রাজ্যস্থাপনে, তার চেয়ে বেশী নজর ছিল রাজকোষে অর্থবৃদ্ধির দিকে। তুর্কী গৌড়-বঙ্গ তখন দিল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বাধীন ; কিন্তু দিল্লী আবার ছোঁ মারতে কতক্ষণ ? তাই তুর্কী নিজেদের শক্তিরক্ষার জন্যই হিন্দু-প্রধানদের প্রাধান্য রাখত অব্যাহত, কিন্তু সাধারণজনের উপর করভার বেড়ে উঠল। দেশের দারিদ্র্য বেড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের লোভে খানকাগুলিতে অতিথির সংখ্যাও ক্রমশ বেড়ে চলল। তুর্কী শাসকদেরও কেউই দরগা, মসজিদ ও খানকা-স্থাপনে কার্পণ্য করেন নি। এর ফলেও এই সুফীদের চেষ্টায় তুর্কী-অধিকৃত অঞ্চলে ইসলামী ধর্মের প্রসার ঘটতে লাগল। যে-সব প্রখ্যাত সুফী চতুর্দশ শতকেই আস্তানা গেড়ে বসলেন তাদের মধ্যে গৌড়-পাণ্ডুয়ার সিরাজ-অল-দীন ওসমান, মহাস্থানগড়ের (বগুড়া) শাহ সুলতান, সাজাদপুরের (পাবনা) শাহদোলা শাহীদ, মঙ্গলকোটের (বর্ধমান) রাজাপীর, শ্রীহট্টের শাহ জালাল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সেক-শুভোদয়ার পীর সাহেব ঐতিহাসিক মানুষ বলে প্রমাণিত হন নি।

ক্রমে ক্রমে তুর্কী রাজ্যও বেড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠল সুফীদের আস্তানা : একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে গৌড়-বঙ্গে একদা এমন একটি শহর বা গ্রামও ছিল না যেখানে পীরদের আস্তানা গড়ে ওঠেনি। ফলে সারা দেশে ইসলাম ধর্ম হল ব্যাপক।

তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে দেশে লোকগণনা শুরু হয়নি; তবে অভিজ্ঞদের অভিমত, শামসুদ্দীনের কালে সারা গৌড়-বঙ্গে হাজার ত্রিশেকের বেশী মুসলমান ছিল না এবং গৌড়ের জনসংখ্যা ছিল দু'লক্ষ।

সুফীদের সম্পর্কে আমাদের জনসাধারণের একটা ভুল ধারণা রয়েছে; এঁদের সাধারণত স্বধর্মনিষ্ঠ, কিন্তু পরধর্ম-সহিষ্ণু নিরীহ, উদার, সাধক সম্প্রদায় বলে গণ্য করা হয়। অনেকে মনে করেন, এঁরা প্রায় বেদান্তপন্থী। কেন, সে কথা পরে বলা যাবে। দৃষ্টত এঁরা গোঁড়া নন, কারণ সংগীত যদিও ইসলামে বর্জিত, এঁরা বলেন, সংগীতের পথে পরমাত্মার সঙ্গলাভের আনন্দ ঘটে, এমনকি সিন্ধু প্রদেশে শাহ লতিফ সম্প্রদায়ের সুফীরা 'ওঁ' মন্ত্রটিকেও গ্রহণ করেছে।

কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে এঁরা শুধু শাস্ত্র নিয়েই কারবার করতেন না, দরকার মত শস্ত্রপাণিও হতেন। এঁরা ইসলাম ধর্মমতের ভিত্তিতে জিহাদ চালাতেন অমুসলমান রাজাদের বিরুদ্ধে, কখনো নিজেরাই, কখনো ইসলামী শাসকদের সহযোগে। এর অজস্র নজির বর্তমান রয়েছে।

এখানে শুধু একটির কথাই উদ্ধৃত করছি—শ্রীহট্ট দখলের কথা, প্রখ্যাত আরবী পর্যটক ইবন বতুতার দপ্তর থেকে।

শ্রীহট্ট দখল হয় ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে শামসুদ্দীনের কালে। ইবন বতুতা এই জিহাদের পরিচালক সুফীপ্রধান শাহ জালালের সঙ্গে মোলাকাত করেন ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরের বছরেই জালাল লোকান্তরিত হন।

কিংবদন্তী, তখন বুরহানুদ্দীন নামে শ্রীহট্টে একজন-মাত্র মুসলমান বাস করত। দেশের রাজা হিন্দু, নাম গৌড় গোবিন্দ। বুরহানুদ্দীন গরু জবাই করে; ফলে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দণ্ডবিধান করেন। বুরহানুদ্দীন লখনৌতির সুলতান শামসুদ্দীনের কাছে তার নালিশ পেশ করল। শামসুদ্দীন শ্রীহট্ট জয়ের জন্য পাঠালেন সৈন্যদল, সঙ্গে জুটল সশস্ত্র সুফী নেতা শাহ জালাল, তাঁর তিন শ'-ষাটজন সমরকুশলী সুফী সৈন্যদল নিয়ে। এঁরা সবই জুটলেন সাতগাঁর লাগাও ত্রিবেণী থেকে। তারপর? শ্রীহট্ট-বিজয় সমাপ্ত হল; শাহ জালাল একটি টিলার উপরে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর আস্তানা দখল করে বসে ধর্মপ্রচারে মন দিলেন; সেখানে গড়ে উঠল মসজিদ, দরগা ও খানকা। অধ্যায়টির পরিসমাপ্তি ঘটল; দেশের মানুষের ক্ষাত্রশক্তি ও কর্মশক্তি ভক্তিবাদ, কামচর্চা ও দৈবানুরক্তির ফলে নিঃশেষিতপ্রায়। তারা দিন কয়েকের মধ্যেই সমস্ত ভুলে গিয়ে শাহ জালালের পদাশ্রয় গ্রহণ করতে লাগল। এই পরিবর্তনই ঘটতে লাগল শহরের পর শহরে, গ্রামের পর গ্রামে।

গরু কোরবানির কিংবদন্তীটি সত্য না-ও হতে পারে, কিন্তু ইবন বতুতা শাহ জালাল সম্পর্কে যা লিখেছেন তার সত্যতার আরো ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে।

শ্রীহট্ট দখল করা তুর্কীদের পক্ষে তখন ছিল পরম প্রয়োজন, কারণ সমুদ্রগামী ও অন্যান্য ধরনের নৌকা তৈরির জন্য সকল রকম কাঠই পাওয়া যেত শ্রীহট্টে। শ্রীহট্ট থেকে নদীপথে সোনারগাঁয় সে কাঠ নিয়ে আসা সহজ। আর তাম্রলিপ্তের বিলয়ের পরে সাঁতগাঁ ও সোনারগাঁ দুই-ই প্রসিদ্ধ বন্দর হয়ে ওঠেছিল। সব রকম নৌকাই তৈরি হত সোনারগাঁয়। এই সব নৌকার সাহায্যেই কিছুকাল পরে ফখরুদ্দীন এক বিরাট্ নৌবাহিনী গড়ে তুলে বর্ষাকালে সোনারগাঁ ও চাটগাঁ থেকে লখনৌতি দখল করতে যেতেন, লখনৌতির সুলতান আলী শাহ শীতকালে অশ্বারোহী সেনা নিয়ে সাঁতগাঁ ও সোনারগাঁ

আক্রমণ করতেন। এই অবিরত বিসংবাদের ফলে দেশে শান্তি ছিল না।

এই যে সুফীর দল, যাদের প্রভাবে সারা বাঙালী সমাজে একটা বিরাট্ পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল, তারা ভারতবর্ষে জন্মায় নি; সবাই এসেছিল প্রায় তুর্কীদের স্বদেশ থেকে। তাদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরো একটু বেশি হওয়া প্রয়োজন।

ইসলামে সুফীপন্থার উৎপত্তি সম্পর্কে বিদ্বজ্জনের চারটি সিদ্ধান্ত রয়েছে। প্রথম, এ পন্থাটি পয়গম্বরেরই গূঢ় তত্ত্ব-বাণী, অবশ্যই সাধারণের জন্য নয়; দ্বিতীয়, এটি সেমিটিক ধর্ম, ইসলামের প্রতি আর্য মনের বিদ্রোহের প্রতীক, ভারতের অদ্বৈত বেদান্তবাদের দ্বারা বহুল প্রভাবিত; তৃতীয়, এটি ইসলামের উপর নিও-প্ল্যাটোনিস্টদের প্রভাবে গঠিত; চতুর্থ, এটির মূল কোনো কিছুর সহিতই যুক্ত নয়, এটি স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছে। এ সিদ্ধান্ত-চতুষ্টয়ের সঙ্গে সম্প্রতি আরো একটি যুক্ত হয়েছে; সেটি এই যে, এ পন্থাটি পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা থেকে গৃহীত। শেষের চারটি সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা তর্কবিতর্ক, অনেক বাদানুবাদ; কাজেই, প্রথমটিকেই আমরা মেনে নেব।

বড় বড় সুফীদের মতে সুফীপন্থা মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সংকল্পকে পরিশুদ্ধ করার উপায়। এটি ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিলুপ্তি-সাধনের পথ। এ পথের পথিকের বা তালিবের পক্ষে একজন গুরু বা মুর্শীদ অপরিহার্য। সুফী-পন্থীদের মধ্যে মোটামুটি চারটি দল রয়েছে—সব দলেরই অবশ্য লক্ষ্য একই, কিন্তু পথ বিভিন্ন। তালিবের মুর্শীদ যে-দলের, তালিবকে সে-দলেরই পথিক হতে হয়। চারিটি দলের মধ্যে প্রধানত দুটি দলই, চিস্তিয়া ও সুরাবর্দীয়া, বাঙলা দেশে দেখা যায়। এ পথে মোটামুটি আটটি ধাপ; প্রথম, সেবা; দ্বিতীয়, প্রেম; তৃতীয়, নির্জনবাস; চতুর্থ, জ্ঞানলাভ; পঞ্চম, সমাধির আনন্দ; ষষ্ঠ, সত্য-দর্শন; সপ্তম, ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ; অষ্টম, নির্বাণ।

সুফীদের দর্শনবাদ নিয়ে আরো আলোচনার প্রয়োজন আমাদের নেই, কিন্তু এটা বলা প্রয়োজন যে সুফী হতে হলে সন্ন্যাস নেবার কথা ওঠে না। পীর-দরবেশদেরও পক্ষে বিবাহ অপরিহার্য, কারণ পয়গম্বরের আদেশে কোনো মুসলমানই অকৃতদার থাকতে পারে না।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দুটি বড় বিভাগ: শিয়া ও সুন্নী। উভয় দলের মধ্যেই সুফীপন্থার প্রচলন রয়েছে।

শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে মতভেদ মোটামুটি পয়গম্বরের উত্তরাধিকারীর প্রশ্ন নিয়ে। শিয়াদের মতে পয়গম্বরের উত্তরাধিকারী হবেন তাঁরই মত ঈশ্বর-নির্বাচিত, নিষ্পাপ ও কলঙ্কলেশশূন্য। সে-পদের যোগ্য একমাত্র তাঁরই জামাতা আলী এবং তারপর তাঁরই পুত্রদ্বয়, হাসান ও হোসেন। সুন্নীদের মতে, পয়গম্বরের পরে আবু-বেকরই যোগ্য খলিফা, তারপর ওমর ও ওসমান, পরে আলী অর্থাৎ আলী দ্বিতীয় নয়, চতুর্থ খলিফা। এ ছাড়াও কোরানের ব্যাখ্যা সম্পর্কে এ দু' দলের মধ্যে মূলগত কিছু প্রভেদ রয়েছে—তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই।

ইবন বতুতার দপ্তর থেকে চতুর্দশ শতকের বাঙলা সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়: আমরা এবার তা-ই অনুসরণ করব।

ইবন বতুতাকে অনেকে আরব পর্যটক বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু বস্তুত তিনি ট্যানজিয়ারের অর্থাৎ আফ্রিকার মরক্কোর অধিবাসী। ট্যানজিয়ার ছেড়েছেন তিনি একুশ বছর বয়সে, ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে, আর স্বদেশে ফিরে গিয়েছেন ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। বহুদেশ ঘুরে দিল্লী এলেন এবং তুর্কী সুলতানের নেকনজরে পড়ে সেখানে তাঁর কাজী হয়ে কয়েক বছর রয়ে গেলেন। তারপর তাঁকে চীনে পাঠানো হল —দূত হিসাবে। চীন যাবার পথে, মলডাইভ হয়ে এলেন চাঁটগাঁ; সেখান থেকে পরে গেলেন সোনারগাঁয় ও শ্রীহট্টে। তখন ফখরুদ্দীন সুলতানের আমল। নদীপথে সোনারগাঁ থেকে শ্রীহট্টে যেতে মোটামুটি দিন পনের সময় লাগত। শ্রীহট্টে যাবার উদ্দেশ্য দরবেশ শাহ জালালের সঙ্গে দেখা করা।

তাঁর সফরনামা কেতাব থেকে সেকালের বাঙলা সম্বন্ধে তিনি যা মন্তব্য করেছেন, আমরা সেটুকুই উল্লেখ করছি :

"বাঙলা দেশের পরিধি সুবিস্তীর্ণ ; এখানে ধান ফলে প্রচুর। পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রকার পণ্যসম্ভার এত সস্তা আমি আর কোথাও দেখিনি।"

এখানে বলে রাখা ভাল যে ফখরুদ্দীন সোনারগাঁ টাঁকশালে মোটামুটি তিন রকম মুদ্রা তৈরি করতেন। এদের সর্বনিম্ন স্তরে দিরহাম, হয়ত নানারূপ মিশ্রিত ধাতুতে গড়া। তার উপরেই রুপার টাকা—যার নাম দিনার ; আটটি দিরহামে হত একটি দিনার। দিনারের ওজন ছিল একশ' বাযট্টি থেকে একশ' আটষট্টি গ্রেণ ; আজকালের টাকার ওজন একশ' পঁচাত্তর গ্রেণ, তার মধ্যে খাঁটী রুপা একশ যাট গ্রেণ, বাকিটা নানা মিশ্রিত ধাতু। তারপর সোনার দিনার ; এক একটি দশটি রুপার দিনারের সমান।

অর্থাৎ সেকালে সোনা ছিল রুপার চেয়ে দশগুণ মূল্যবান্। আজকাল কত ? সত্তর-আশি গুণ ? অর্থাৎ রুপা সেকালে একাল থেকে অন্তত সাত-আটগুণ মূল্যবান্ ছিল, তাই রুপার অলঙ্কারেরও ছিল কদর।

এবার সেকালের দ্রব্যমূল্যের একটি তালিকা দেওয়া যাক।

একটি রুপার দিনারে (অর্থাৎ মোটামুটি আজকালের এক টাকায়) আটটি বড় মুরগী, তিনটি রুপার দিনারে একটি ভাল দুধালো গাই, একটি দিরহামে পনেরটি কবুতর, একটি রুপার দিনারে আট-নয় মণ চাল, আটাশ সের ঘি বা চিনি ও ছাপ্পান্ন সের তিল তেল।

তিল তেল প্রায় সব কাজেই ব্যবহৃত হত, মেয়েদের প্রসাধনেও। প্রসাধনের জন্য এক রকম মাটিরও ব্যবহার ছিল, যাকে এখন বলা হয়, Fuller's-earth বা সাজিমাটি। সব রকম তেলই তৈরি হত ঘানিতে ; সে ঘানির চেহারা আজও যা সেকালেও তা-ই ছিল।

বাঙলা দেশে সেকালে মানুষও বিক্রি হত। একটি সুন্দরী

মেয়ের দাম ছিল সত্তর টাকার মত, একটি ছেলের দাম একশ' চল্লিশ। ইবন বতুতা নিজে বাঙলা থেকে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে কিনে নেন।

ইবন বতুতা ফখরুদ্দীনের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। তিনি বিদেশী পর্যটক ও পীর-দরবেশদের বড় ভক্ত ছিলেন।

আমাদের মনে হয়, শাসক হিসাবে তিনি যে উদার ও দক্ষ ছিলেন তা বলা চলে না, কারণ তাঁর কালে অমুসলমান প্রজাদের কর ছিল মুসলমান প্রজাদের চেয়ে অনেক বেশি ; তাদের কাছ থেকে ফসলের অর্ধেকই কর হিসাবে নেওয়া হত—তার উপরেও চাপান হত আরো কিছু খাজনা। এত কর দেওয়া সত্ত্বেও যে ফসল ভাল হত তার কারণ ভূমি ছিল উর্বর, আর, চাষী ছিল কর্মঠ। তবে তারা ক্রমে ক্রমে দরিদ্র হয়ে আসছিল।

ইবন বতুতা লিখেছেন, সোনারগাঁর বন্দরে (গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে) ছিল অসংখ্য নৌকার সারি—এর মধ্যে সাগরগামী নৌকাও ছিল প্রচুর। দেশের ভিতরে চলাচলের জন্য প্রধান যান ছিল নৌকা ; আর নৌকা চড়েই ফখরুদ্দীন সসৈন্যে লখনৌতি আক্রমণ করতে যেতেন। নৌকা বেয়েই সোনারগাঁ থেকে যাওয়া যেত কামরূপ (কামাখ্যা) ; সেটা মাসখানেকের পথ। কামরূপে পাওয়া যেত মৃগনাভি হরিণ। সেদেশের লোক ছিল জাদুবিদ্যায় পরম পারদর্শী।

সোনারগাঁ থেকে হবিগঞ্জ ও শ্রীহট্ট যেতে হয় মেঘনা নদী বেয়ে। নদীর দুধারের দৃশ্য অপূর্ব ; শস্যশ্যামল ক্ষেত, সুশোভন বাগ-বাগিচা, নানারূপ ঘটীযন্ত্র (জলতোলার জন্য), গ্রামের সারি—এর শোভা তুলনীয় একমাত্র মিশরের নীল নদের তীরের সঙ্গে। এসব গ্রামে বাস করে বিধর্মীরা অর্থাৎ হিন্দুরা বা জিম্মিরা অর্থাৎ যারা মুসলমানদের জিম্মায় বা হেপাজতে রয়েছে।

পথে দেখা যাবে অসংখ্য নৌকা—প্রতিটি নৌকায় রয়েছে এক-

একটি ঢাক ; হু'টি নৌকার দেখা হলে হু'টি থেকেই ঢাক বাজিয়ে একটি অন্যটিকে শুভেচ্ছা ও প্রীতি জ্ঞাপন করে।

সাধারণত তুর্কী সুলতানের সঙ্গে এ সকল গ্রামের অধিবাসী জিম্মি প্রজাদের কোনো সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল না ; তাঁদের সংযোগ ছিল গ্রাম্য মাতব্বরদের সঙ্গে, হিন্দু কর্মচারীদের মারফত। প্রতিটি শহরেরই একজন কাজী বা বিচারক থাকতেন। কাজীর দরবারে নালিশ করতে তখন কোনো বকীল বা উকীল দিতে হত না, কোনো অর্থব্যয়ও করতে হত না। সুলতানের বিরুদ্ধে কোনো নালিশ হলে, তাঁকেও কাজীর দরবারে হাজির হতে হত।

ফকির, কাজী, সুফী বা শেখদের ছিল পরম সম্মান। এঁদের পবিত্রতার প্রতিমূর্তি বলে গণ্য করা হত, আর এঁরা সবাই ছিলেন রাজপোষ্য অর্থাৎ কোনো রাজকার্য না করলেও তাঁরা যথাযোগ্য অর্থ-সাহায্য পেতেন।

পর্দা-মানা ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ। অভিজাত স্ত্রী ও পুরুষ সবাই দোলায় চড়ে যেতেন ; মেয়েদের দোলায় সিল্কের পর্দা থাকত। ইবন বতুতা পর্দার আভিজাত্যের কথা বললেও কথাটা সত্য নয়। বাঙলায় পর্দা-মানা শুরু হয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকেই, অর্থাৎ মুসলমানের অত্যাচারের ভয়ে। অনেকে একে ভারতবর্ষে চির-প্রচলিত 'অবগুণ্ঠনের'ই রকমফের বলে ব্যাখ্যা করেছেন, মুসলমানের সাফাই গাইতে। পর্দাটা ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গ।

পান বিতরণ ছিল সভ্য সমাজের আচরণের অঙ্গ। পান-দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই এতে আপ্যায়িত হতেন। যদি সুলতান নিজে কোনো পান বিতরণ করতেন, তবে তার মূল্য সোনা বা সম্মানসূচক পোশাক বিতরণের চেয়েও গৌরবজনক বলে মনে করা হত।

সুলতানদের ডাকবাহী অশ্বারোহী ও পদাতিক কর্মী হুই-ই ছিল। আর ছিল গোয়েন্দা বিভাগ। যোগী বা তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের কেউ-কেউ তখনো তুকতাক করতেন, দুরারোগ্য রোগে কবচ, তাবিজ

দিতেন, কারণ সাধারণ মানুষের এ সবের প্রতি বিশ্বাস ছিল অপরিসীম।

বাজনার তালে তালে সুসজ্জিত ঘোড়ার নাচ ছিল সেকালে পরম উপভোগ্য, দর্শকদের তৃপ্তিকর অনুষ্ঠান। দিল্লীর প্রাসাদেও এ তামাসা দেখানো হত; সুমাত্রা দ্বীপেও এর প্রচলন হয়েছিল। বিদেশীরা এসে ভারতবর্ষে যে টাকাটা রোজগার করত, তা তারা এদেশেই ব্যয় করে যেত, কারণ কি করে যে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল যে ভারতবর্ষ থেকে যে বিদেশে অর্থ নিয়ে যেতে চাইবে, তার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

হিন্দুরা কি কি কাজ করত? তাদের মধ্যে কেউ ছিল চিকিৎসক, কেউ গণক, কেউ চাষী, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ শ্রেষ্ঠী বা শেঠ, কেউ উত্তমর্ণ বা মহাজন, কেউ রত্নব্যবসায়ী, কেউ ঠিকাদার, কেউ হিসাব-রক্ষক, কেউ করণিক বা কেরানী, কেউ রাজস্ব বিভাগের কর্মী, কেউ সৈনিক, কেউ করবাল-কুশলী। মুসলমানদের কাছে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও জিম্মিদের নিরস্ত্র করা হয়নি; তাই তাদের শস্ত্রচর্চা ছিল অব্যাহত এবং তাদের মধ্যে অনেকে খড়্গ ব্যবহারে ছিল অতিশয় দক্ষ।

হিন্দুদের মধ্যে নিজ ধর্মের প্রতি আস্থা যথেষ্ট। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা মাংস খায় না; তারা সাধারণত ভাত, সবজি ও তিল তেল খেয়ে থাকে। [এ মন্তব্যটি বোধহয় সত্য নয়—ইবন বতুতার শোনা কথা।] হিন্দুরা মুসলমানের ছোঁয়া জিনিস খায় না, কিন্তু মুসলমানদের কাছে হিন্দুর দেওয়া জিনিস অভক্ষ্য নয়। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানে ধর্মগত কলহ কোথাও নেই অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বিরোধ কোথাও ছিল না। হিন্দুদের নৈতিক ও মানবিক আদর্শ অতি উচ্চ; কোনোও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তিও যদি মালিকহীন অবস্থায় থাকে তবু তারা তা স্পর্শও করে না। তারা দানশীল; রাজপথের ধারে ধারে তারা জনসাধারণের জন্য আস্তানা তৈরি করে—সঙ্গে সঙ্গে

তৈরি করে বাগিচা। এত বদান্য তারা যে নিজের প্রাণ দিয়েও তারা মুসলমানকে রক্ষা করে।

বাঙলা দেশে ফলের মধ্যে বেশি পাওয়া যায় আম, জাম, পান, কমলালেবু, আঙ্গুর, ডালিম ও নারিকেল।

সামাজিক ব্যাপারে পান বিতরণ সোনা রুপা দেয়ার তুল্য। পান খেতে প্রথমে সুপারি মুখে দিতে হয়, তারপর পান, তারপরে চুন ; সব একসাথে মুখে পুরতে হয় না। পান চিবালে পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি পায়। এতে মনটা উৎফুল্ল হয় আর সঙ্গমশক্তি বেড়ে যায়। মধ্যরাত্রে পান চিবুলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়।

ভারতীয় চাপাটি, পরটা ও শিককাবাব খেতে সুস্বাদু।

সমুদ্রগামী বাণিজ্য জাহাজ চালানো বা তৈরি কোনটাই সুলতানদের একচেটিয়া কারবার ছিল না ; বহু বণিক্‌ও ব্যক্তিগতভাবে এ কাজে লিপ্ত ছিলেন।

সতীদাহ ছিল বটে, কিন্তু জোর করে কেউ বিধবাদেব পুড়িয়ে মারত না। যারা সতী না হত তারা মোটা কাপড় পরে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বসবাস করত, তবে এতে হয়ত তাদের মর্যাদার কিছু লাঘব হত। এখানে ভারতবর্ষের অখ্যাতি-বিস্তারের অন্যতম সহায়ক অস্ত্র সতীদাহপ্রথা সম্পর্কে কিছু আলোচনা অবান্তর হবে না ; কারণ, এ প্রথাটির স্পর্শ বাঙালী সমাজের সর্বস্তরেই লেগেছিল, যদিও তথাকথিত অন্ত্যজ দলে এর প্রভাব বেশি ছিল না। ইবন বতুতা অবশ্য বাঙলায় সতীদাহের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা নন, তবে অন্যত্র তা তিনি দেখেছেন।

'সতী' হয় সহমরণ, নয় অনুমরণ বরণ করতেন। সহমরণ বা সহগমন—মৃত স্বামীর শবের সঙ্গে নিজেকে দগ্ধ করা ; অনুমরণ বা অনুগমন—তার লোকান্তরের খবর পেয়ে নিজেকে চিতায় সমর্পণ করা। অনুমরণ হত স্বামীর যুদ্ধক্ষেত্রে বা বিদেশে মৃত্যু হলে অথবা

সে সময়ে নিজে অন্তর্বত্নী থাকলে। অনুমরণে তাই ছিল 'সতী'র সাহস, ধৈর্য ও মনোবলের চরম পরীক্ষা।

এ প্রথাটি যে মূলত আর্য বা দ্রাবিড় কুলধর্ম ছিল না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। খুব সম্ভবত এটি পরবর্তী কালে গৃহীত হয়েছিল ভারতবর্ষের কোনো আদিবাসী-দলের কৌলিক প্রথা থেকে। কিন্তু শতকের পর শতক যে ভারতবর্ষে এটি চলেছে তার কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে। প্রথমত, হিন্দু পরিবারে ও সমাজে বিধবাদের ক্রমবর্ধিত অবমাননাকর ব্যবহার ও লাঞ্ছনা। দ্বিতীয়ত, লোকাচারের, বিশেষ করে অর্থলোভী পুরোহিতদের স্বরচিত শাস্ত্রব্যাখ্যার প্ররোচনা। তৃতীয়ত, স্ত্রীলোকের উপর আর্থিক চাপ—পঞ্চদশ শতকের বিদেশী পর্যটক বলেছেন, বিবাহের সময়েই বধূকে অঙ্গীকার করতে হত হয় তিনি সতী হবেন, নয় তাঁকে তখনই তাঁর যৌতুকের সবটাই তাঁর নিজের সন্তানদের বঞ্চিত করে স্বামীর পুরুষ আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।

যোড়শ শতকে আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল 'সতী' সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর মতে 'সতী' পাঁচ রকমের হলেও মূলত তিন রকমের। প্রথম, আত্মীয় জনমত ও পুরোহিতদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে যাঁরা একে কুলধর্ম ভেবে সতী হতেন; দ্বিতীয়, যাঁরা সত্যই স্বামীর বিরহ অসহ্য মনে করে পরলোকেও তাঁর সহগমন করতে চাইতেন; তৃতীয়, যাঁরা নিজের মতের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে 'সতী' হতে বাধ্য হতেন। এঁদের সংখ্যা অবশ্য অনেক কম।

সংগৃহীত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে অনুমান হয়, উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে বাঙলায় সতীদাহ অপেক্ষাকৃত ব্যাপক হয়েছিল; যথাস্থানে তা বলা যাবে।

ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই এ প্রথার প্রচলন ছিল বেশি; এরই পরিবর্ধিত সংস্করণ 'জহর' ব্রত।

ইবন বতুতা সহমরণ ও অনুমরণ দুই-এরই প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা।

অনুমরণে সতীর অসাধারণ মনোবলের পরিচয় তাঁকে অভিভূত করেছিল ; এরূপ ঘটনা যে ঘটতে পারে তা ছিল তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর। তাঁর বর্ণনার অনুলেখ এখানে তুলে দিচ্ছি।

এ বর্ণনার সতীটি শুনলেন যে বহু দূরে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর স্বামীর প্রাণনাশ হয়েছে। শুনে, প্রথমত তিনি স্নান করলেন, তারপর তাঁর সর্বাপেক্ষা মহার্ঘ শাড়ি পরে একে একে বাছাই করা অলঙ্কারগুলিও পরলেন। তারপর ঘোড়ায় চড়ে, ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়দের সঙ্গে নিয়ে, মিছিল করে চললেন তাঁর আত্মাহুতির স্থানে। একহাতে একটি নারকেল, অন্যহাতে একখানি দর্পণ। সঙ্গে সঙ্গে চলল বাজনাদারেরা।

চিতা সজ্জিত হয়েছিল একটি ছায়াময় কুঞ্জবনে। এর একপাশে একটি মন্দির (সম্ভবত মহাদেবের), অন্যদিকে একটি জলাশয়। চিতাটি অগণিত প্রত্যক্ষদ্রষ্টাদের দৃষ্টির বাইরে, পর্দা দিয়ে ঘেরা। অগ্নিশিখা লেলিহান ছিল তিল তেলের সহযোগে।

'সতী' সেই জলাশয়ে আবার স্নান করলেন ; তারপর, তাঁর পরিহিত কাপড় ও অলঙ্কার সবই বিলিয়ে দিয়ে, পরলেন একখানা মোটা শাড়ি। তারপর অচঞ্চল পদে, স্থির চিত্তে, অগ্রসর হলেন পর্দা-ঘেরা চিতাশয্যার দিকে। কতক্ষণ ধরে করলেন প্রার্থনা ; প্রার্থনা শেষে অগ্নিদেবকে প্রণাম করে সহসা চিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যকারীরা তাঁর দেহের উপর চাপিয়ে দিল বড় বড় গাছের ভারী ভারী টুকরা যেন তিনি আর তাঁর শেষশয্যা থেকে উঠে আসতে না পারেন।

[এ সময় ইবন বতুতা অজ্ঞান হয়ে যান, কাজেই এর পরে কি হল তা আর লেখা হয়নি।]

ইবন বতুতা বাঙলা দেশ ছেড়ে যাবার আগে এখান থেকে কিছু কাপড় (হয়ত মসলিন) কিনে নিয়ে যান, পথে রাজরাজড়াদের ভেট দেবেন বলে।

শ্রীহট্ট থেকে সোনারগাঁ ফিরে এসে তিনি জাভা (সুমাত্রা) রওনা হয়ে যান একখানা সাগরগামী নৌকায়। সোনারগাঁ থেকে জাভায় নৌকা তখন যাতায়াত করত প্রতিনিয়ত। জাভা ছিল চল্লিশ দিনের পথ।

ইবন বতুতার পরে আমরা যে আর-একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য পেশ করব তিনি একজন চীনা দোভাষী, নাম মহৌন। তিনি বাংলায় এসেছিলেন ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে। সূক্ষ্ম বিচারে তাঁর স্থান পঞ্চদশ শতকে কিন্তু তাঁকে চতুর্দশ শতকের কাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন না করাই ভাল। তিনি লিখেছেন, বাঙলা একটি বিস্তীর্ণ দেশ; এ অঞ্চলে নানারূপ ফসলও অজস্র, লোকসংখ্যাও অগণিত। মূলত এরা ব্যবসায়ীর জাত—নানা দেশের সঙ্গে এদের বহির্বাণিজ্য।

বাঙালীর মধ্যে অসিত বর্ণের মুসলমানও দেখা যায়। বলা-বাহুল্য, এরা নয়া বাঙালী মুসলমান। বাঙালীদের মাথা চাঁচা এবং মাথায় সাদা পাগড়ি। পরনে আলখাল্লা, মাজায় একটি চওড়া রঙিন রুমাল বাঁধা। পায়ে চোখা চামড়ার জুতা। তাঁর মতে, এ পোশাকটি মনোজ্ঞ, পরিপাটি।

বাঙলায় যে সব জিনিস তৈরি হত তার মধ্যে মহৌনের সবচেয়ে ভাল লেগেছিল নানাধরনের সূক্ষ্ম বস্ত্র। এদের মধ্যে 'পি-চি' সর্বোৎকৃষ্ট—পাশে এটি তিন ফুট, লম্বায় ছাপান্ন বা সাতান্ন ফুট।

এদেশের সিল্কের ব্যবসাও ছিল খুব সমৃদ্ধ, কারণ তুঁতের গাছ ও সিল্কের পোকা এ অঞ্চলেই জন্মে। সিল্কের কাপড়, রুমাল, টুপি ইত্যাদি ছাড়াও এদেশে তৈরি হত নানা রঙিন বাসনকোসন, রকমারি পাত্র, ইস্পাত, বন্দুক, ছুরি ও কাঁচি। কাগজ তৈরি হত গাছের বাকলে—সে কাগজ ছিল হরিণের চামড়ার মত মসৃণ ও চকচকে।

বাঙলায় নানারূপ ফসলের প্রাচুর্য; এর মধ্যে প্রধান চাউল, গম, তিল, সর্বপ্রকার ডাল, যব, আদা, সরিষা, পিঁয়াজ, শণ, বেগুন, ও নানাবিধ তরিতরকারি। ফলের মধ্যে প্রধান ছিল কলা, কাঁঠাল,

আম, ডালিম ও আখ। আখের রস থেকে তৈরি হত চিনি ও মিশ্রি। এ ছাড়াও বিক্রি হত রকমারি শুষ্ক ও রক্ষিত (চিনির রসে ?) ফল। অভ্যাগতকে পানসুপারি দিয়ে অভ্যর্থনা করা হত।

দেশের লোকও আমোদ-আহ্লাদ-প্রিয় ছিল। এ সব ব্যাপারে ভোজের ব্যবস্থা থাকত প্রচুর আর ভোজের সঙ্গে তাল রেখে চলত বাজনা ও নাচ। এ সব ভোজের আসরে গান ও বাজনা যারা পরিবেশন করত তাদের পরনে নানা রঙিন পোশাক, গলায় রঙিন পাথরের মালা, হাতেও তা-ই। দেশে ছিল বাজিকরের ছড়াছড়ি— তাদের রকমারি বাজির মধ্যে একটিই তাঁর মনে দাগ কেটেছিল। সেটি বাঘের খেলা।

স্বামী ও স্ত্রী এবং একটি বাঘ নিয়ে সেই বাজিকরের দল। বাঘটি লোহার শিকলে বাঁধা। খেলা শুরু হলে, বাঘটিকে ছেড়ে দেওয়া হল। বাজিকর নিজে কাপড়-চোপড় ছেড়ে বাঘের সামনে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করল। তারপর বাঘটিকে লাথি, ঘুষি দিতে দিতে তাকে রাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে লাগল। ক্রমে বাঘটিও তেতে ওঠে বাজিকরের দেহে পড়ল ঝাঁপিয়ে। তারপর বাজিকর ও বাঘের মধ্যে চলল প্রবল লড়াই—মরণপণে ধস্তাধস্তি। দর্শকরা নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে পশু ও মানুষের এই অদ্ভুত লড়াই দেখল ; একসময় মনে হল এই ক্রুদ্ধ পশুদানবের হাত থেকে বাজিকরের অব্যাহতি নেই। কিন্তু না, পশুটি হেরে গেল। শুধু তা-ই নয়, শেষদৃশ্যে যখন বাজিকর তার মুণ্ডটি বাঘের মুখে ঢুকিয়ে দিল, তখনও তার কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। বাজিকর শুধু বিজয়ী নয়, একেবারে অক্ষত রইল। তারপর, বাঘটিকে আবার জিঞ্জির পরিয়ে বাজিকর আর তার স্ত্রী তাদের পরিক্রমণ শুরু করল।

বাঙালী সম্পর্কে মহৌন কখনো কখনো যে দু'একটি মন্তব্য করেছেন তাতে মনে হয় তাঁর মতে বাঙালীরা খোলামেলা, সরল প্রকৃতির মানুষ, তাদের মধ্যে ঘোরপেঁচ মোটেই ছিল না।

বাঙলায় তিথি-মাহাত্ম্য বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবে সে মাহাত্ম্য শুধু বাঙলায় নয়, কমবেশি ভারতবর্ষের সর্বত্রই বর্তমান ছিল। তারপর তিথি-বিচারে সর্বত্রই চৈত্র মাসকে বছরের প্রথম মাস হিসাবে গণনা করা হত; এ রীতিও বহুকাল থেকে ভারতবর্ষের সর্বত্র ছিল প্রবর্তিত। কিন্তু সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের সঙ্গে বর্ষারম্ভের কাল মিলল না; সে জ্যোতিষের মতে বছরের প্রথম মাস বৈশাখ। কাজেই একটা সামঞ্জস্য-বিধানের প্রয়োজন ঘটল। তাই তিথি-বিচারে চৈত্রই রইল বর্ষশীর্ষে আর শকাব্দের সঙ্গে অর্থাৎ বর্ষ-মাস-দিন গণনায় বৈশাখ হল কায়েম। তামিলনাদ কিন্তু দু' ব্যাপারেই চৈত্রকেই বজায় রাখল।

বাঙালী সমাজ গ্রহণ করল তিনটিকেই। হিজরার মতে হত সকল রকম রাজকার্য ও ইসলামী পার্বণ; শকাব্দের মতে স্থির হত বর্ষ, মাস ও দিন; আর হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন পার্বণগুলি রইল তিথি-ভিত্তিক। পরে এর মধ্যে হল কিছু অদলবদল, সৃষ্টি হল বর্ণসংকর বঙ্গাব্দের। সে কথা যথাসময়ে বলা যাবে।

এবার চতুর্দশ শতকের বাঙালী সমাজের কথায় ফিরে আসা যাক। ইবন বতুতা ও মহোনের লেখায় আমরা বাঙালী, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের বাঙালীর, সাধারণ জীবন-যাত্রার একটি মোটামুটি চিত্র পাই। ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী যে সর্বত্র পাওয়া যেত তাতে সন্দেহ নেই—দেশের খাদ্যদ্রব্য এত সুলভ হওয়া সত্ত্বেও। এটা যে কেবল সাধারণজনের আর্থিক অনটনের পরিচায়ক তা নয়, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে সমাজবন্ধনের শিথিলতা ও দেশব্যাপী মানুষের চরিত্রদোষ। এর কারণ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি।

মোটের উপর যে পঙ্কিল জলস্রোতের জন্ম হয়েছিল দ্বাদশে তা সমগ্র ত্রয়োদশকে প্লাবিত করে চতুর্দশেও এসে দেখা দিয়েছিল; তার চিহ্ন রয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। সে পুঁথি উত্তর রাঢ় বা দক্ষিণ

রাঢ় যেখানেই লেখা হয়ে থাক না কেন, তা যে সমগ্র বাঙালী সমাজেরই চিত্র, তাতে সন্দেহ কি ?

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কালকে পীর-দরবেশের কাল বললে অত্যুক্তি হয় না। কারণ তুর্কীদের রাজ্যের পরিধি যত বাড়তে লাগল তত বাড়তে লাগল মসজিদ, দরগা ও খানকার সংখ্যা আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগল পীর-দরবেশদের প্রভাব। পরবর্তী কালে দক্ষিণাপথে রোমান ক্যাথলিক পাদরীরা যেমন 'রোমান ব্রাহ্মণ' সেজে, সংস্কৃত শ্লোক আওড়িয়ে, সাধারণজনকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিত, তেমনি এ যুগে পীর-দরবেশেরা হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্র থেকে নানা তুকতাক ও গল্প শিখে নিয়ে, তাদের কেরামতি দেখিয়ে, ধাপে ধাপে ইসলামী বহির্বাসখানা সাধারণজনের স্কন্ধে চাপিয়ে দিল। সমাজবন্ধন ছিল শিথিল, তারপর তুর্কী-অধিকৃত অঞ্চলে মোটামুটি 'জিম্মি' হয়েই বসবাস করতে হত। কাজেই এ ক্রমপরিবর্তনে কে আর বাধা দেবে ?

ক্রমে অবস্থাটা এমন হয়ে দাঁড়াল যে মুষ্টিমেয় একদল স্মৃতি-প্রভাবান্বিত ব্রাহ্মণ, করণ ও অম্বষ্ঠ ছাড়া আর সমস্ত দেশটাই যেন যে-কোন মুহূর্তে সেই ইসলামী উত্তরীয়খানি গ্রহণ করে বসতে পারে। সমগ্র বাঙালী সমাজের যখন এমন সংকটময় অবস্থা তখন তার দেহে ও মনে শক্তিসঞ্চার করলেন দেবী কালী। এই দেবী কালিকার বার্তা নিয়ে এল শিবতন্ত্র-প্রভাবিত কালিকা পুরাণ।

শক্তিপূজা বেদ-বহির্ভূত, যদিও বেদবিরোধী নয়। কিন্তু তাই বলে দেবী ভগবতী ও কালী ভারতবর্ষের মানুষের কাছে অপরিচিত ছিলেন না। উভয় দেবীই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত বিখ্যাত গ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আদ্যাশক্তি রূপে পূজিত। উভয়েই শিব ও বিষ্ণুর মূলশক্তি। শিবপূজা সাদাসিধে লৌকিক পূজা, কিন্তু বিষ্ণুপূজার আভিজাত্য রয়েছে। শিবপূজায় স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সকলেরই অধিকার এবং তাঁকে পূজা করা চলে সর্বত্র—ঘাটে, মাঠে, গাছতলায়,

শ্মশানে ও মন্দিরে, কিন্তু বিষ্ণুপূজা না চলে সর্বত্র, না চলে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের দ্বারা ; শুধু ব্রাহ্মণেরই তাতে অধিকার। অন্যান্য বর্ণ শুধু ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে বিষ্ণুপূজা করাতে পারেন। শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ মাটি দিয়ে তৈরি করা চলে, বিষ্ণুর প্রতীক শালগ্রাম শিলা আসে নেপালের গণ্ডকী নদীর গর্ভ থেকে। দেবী কালিকাও সর্বজনীন লৌকিক দেবী—সর্বত্র তাঁর পূজা চলে। শিবের মত শিবশক্তি দেবী কালিকাও মূলত বাঙালী সমাজের তথাকথিত বন্য অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের (শবর, পুলিন্দ, কোল প্রভৃতি) আদি দেবতা ; পৌরাণিক অভিজাত সমাজে তাঁর স্থান হয়েছে তান্ত্রিক সেতুর সংযোগে। দেবী ভগবতী, কালিকার ভিন্নরূপ হয়েও, এই তান্ত্রিক-বাদের সূত্রেই স্থান পেয়েছেন অভিজাত সম্প্রদায়ের বাৎসরিক পূজা-মণ্ডপে।

চতুর্দশ শতকে কালিকা পুরাণের বহুল প্রচারের ফলে বাঙলার সর্বত্র বাঙালীর জন্মগত সংস্কার প্রবল হয়ে উঠল, মাতৃকেন্দ্রিক বাঙালী তার হারানো মাকে যেন খুঁজে পেল, তান্ত্রিকবাদের মূল নীতি অনুসারে দৈনন্দিন সর্বকর্মকে শক্তিপূজারই অঙ্গবিশেষ বলে মনে করল। সামাজিক দিক্ থেকে মূলত দ্বিধা-বিভক্ত সমাজের মধ্যে একটা সহজ যোগসূত্র রচনা করে দেবী কালিকা বাঙালীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় দেবতা ও আপন হয়ে উঠলেন এবং বাঙালীর এই পতনোন্মুখ সমাজকে একটা অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা করলেন। সংস্কারগত সূত্রে তাই বাঙালী মুসলমানও হল কালীভক্ত। বাঙালীর সমাজ-সংস্থায় তাই কালীর ভূমিকা অসাধারণ। প্রথমত দ্রাবিড়ের কালী, অর্থাৎ মাড়ীআম্মা এবং বাঙালীর কালীর কল্পনায় বিশেষ কোনও প্রভেদ ছিল না। কিন্তু বাঙালীর কালী পরবর্তী কালে তাঁর অধুনাতন রূপ পেলেন ; দ্রাবিড়ের কালী আদিম রূপেই প্রধানত অন্ত্যজদের পূজা পেতে লাগলেন, সাধারণত গ্রামের বাইরে গাছের তলায়।

বাঙলায় তো বটেই, এমনকি বাঙালী বাঙলা ছেড়ে যখন বিদেশে

গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছেন তার পরম প্রিয় দেবী ও রক্ষাকর্ত্রী কালী। এখনো বাঙালী সমাজ সুযোগ পেলেই প্রথমেই একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করে।

বাঙালীর এমন যে পরম আপন দেবী কালী তাঁর জন্মকাহিনী ও রূপের কথা শ্রীশ্রীচণ্ডী ও কালিকা পুরাণ থেকে উদ্ধৃত করছি।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যে দেখা যায়, দৈত্যরাজ শুম্ভ যখন মহাসুর চণ্ড ও মুণ্ডকে সসৈন্যে দেবী ভগবতীকে যুদ্ধে পরাজিত করে ধরে নিতে পাঠাল, তখন তাদের দেখে ক্রোধে দেবীর মুখমণ্ডল হল কালীবর্ণ আর ঃ

"ভ্রূকুটিকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতম্
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা।"

অর্থাৎ দেবী ভগবতীর কপাল হল ভ্রূকুটি-সঙ্কুচিত—আর সে কপাল থেকে বেরিয়ে আসলেন দেবী কালী। দেবীর মুখ ভয়ঙ্কর, হাতে তরবারি ও পাশ অর্থাৎ ফাঁস বা বন্ধনাস্ত্র আর খট্বাঙ্গ বা মুগুর যার আগা মড়ার মাথার খুলি দিয়ে গড়া। তাঁর গলায় নরমুণ্ডের মালা, পরনে চিতাবাঘের ছাল, শরীরের মাংস শুষ্ক তাই রূপ তাঁর অতি ভয়ঙ্কর। মুখ তাঁর অতি বিস্তৃত, জিহ্বা লকলকে, চক্ষু রক্তবর্ণ ও কোটরগত। তাঁর চিৎকারে চারিদিক্ কম্পমান।

ইনিই চামুণ্ডা; এঁরই বন্দনা হয় অর্গলা স্তোত্রে। শান্তি স্বস্ত্যয়নে, শারদীয়া দুর্গাপূজার পূর্বে বাঙলার সম্পন্ন গৃহীদের চণ্ডীমণ্ডপে ধ্বনিত হয়

"জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা নমোঽস্তু তে॥"

তারপর,

"নিশুম্ভশুম্ভনির্ণাশি ত্রৈলোক্যশুভদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥"

মাগো, তুমি শুম্ভ-নিশুম্ভ-বিনাশিনী এবং স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের মঙ্গলদায়িনী—তুমি আমাকে রূপ, জয় ও যশ দাও, আমার শত্রু নাশ কর।

এবার কালিকা পুরাণের কথা। এ পর্যন্ত দু'খানা কালিকা পুরাণের সন্ধান মিলেছে : একখানা তন্ত্র-প্রভাবিত, অন্যখানা তা নয়। বল্লালসেন তাঁর দানসাগর গ্রন্থে যে কালিকা পুরাণের উল্লেখ করেছেন তা তন্ত্র-প্রভাবিত নয়। সেখানার উদ্দেশ আর মেলেনি। দ্বিতীয় খানা লেখা হয়েছে দশম বা একাদশ শতকে, হয় কামরূপে, নয় বাঙলার ময়মনসিংহ জেলার উত্তর সীমান্তে। এতে কামরূপ মাহাত্ম্যের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই মনে হয়, এটি সম্ভবত লেখা হয়েছিল কামরূপেই।

দশম বা একাদশ শতকে লেখা হলেও, বাঙলায় এর প্রকাশ ও প্রচার ঘটেছে অনেক পরে—চতুর্দশ শতকে ; এ তথ্যের প্রমাণও বর্তমান।

সে যা-ই হোক, এই তন্ত্র-প্রভাবিত কালিকা পুরাণে দেখা যায়, শিবের পত্নী দক্ষকন্যা সতী মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় জন্মে জন্মগ্রহণ করলেন কালীরূপে। সে কালী কিন্তু চামুণ্ডা নয় ; তাঁর রূপ সেকালের মাপকাঠিতে অনিন্দ্যসুন্দর। তাঁর আভা বিকশিত নীলপদ্মের ন্যায়, পূর্ণচন্দ্রের মত মুখকান্তি। কেশ নীল, কম্বু গ্রীবা, আয়ত লোচন। কান উজ্জ্বল, মনোহর, দুটি হাত মৃণালের মত, স্তনদ্বয় পদ্মকুঁড়ির মত ঘন ও স্থূল। হাতের তালু রক্তবর্ণ, পা দু'টি স্থলপদ্মের মত মনোহর, কোমর সরু, কিন্তু জঙ্ঘাদ্বয় (অর্থাৎ হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত) স্থূল ও ঘন, ঠোঁট পাকা তেলাকুচার মত।

এঁরই সঙ্গে শিবের পুনর্বিবাহ হল বৈশাখ মাসে, শুক্লপক্ষে, পঞ্চমী তিথিতে, বৃহস্পতিবারে, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত চন্দ্র এবং ভরণী

নক্ষত্র-স্থিত সূর্যের অবস্থান সময়ে। বিবাহের দিন হিসাবে বাঙালী সমাজ এ দিনক্ষণকে মান্য করে চলে।

কালী তপস্যার বলে শিবকে প্রসন্ন করেছিলেন; ফলে তিনি হলেন গৌরাঙ্গী ও বিদ্যুৎ-সদৃশী। ইনিই পরে গৌরী বলে খ্যাত হলেন।

প্রাকৃত-পিঙ্গলে কালীর আটটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'লোহংগিনি, হংসীআ, রেহা, তালংকি, কংপি গংভীরা, কালী, কলরুদ্দাণী, উক্কচ্ছা অট্ঠ ণামাই।' অর্থাৎ, লোহাংগিন, হংসী, রেখা, তালংকিণী, গম্ভীরা, কালী, কলরুদ্রাণী, উল্কচ্ছায়া অষ্ট নামানি।' এসব নাম যে বাঙলা দেশেই প্রচলিত ছিল তাতে সন্দেহ কি?

দশম, একাদশে নরবলির আইনগত বিশেষ কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল বলে মনে হয় না, থাকলেও তান্ত্রিক সমাজে সে বলির প্রচলন ছিল। চতুর্দশেও নরবলি লোপ পায়নি বলেই মনে হয়। কালিকা পুরাণের মতে দেবী কালিকার প্রমোদজনক বলি হল পাখি, কাছিম, কুমীর, নয় প্রকার হরিণজাতীয় পশু (যথা, শূয়র, ছাগল, মহিষ, গোধা বা গোসাপ, শশক, কাক, চমর, কৃষ্ণসার, শশ), সিংহ ও মাছ। আর, নিজের গায়ের রক্ত।

বলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছেঃ বলি, মহাবলি ও অতিবলি। শরভ-বলি মহাবলি, আর অতিবলি নরবলি। বাদ-বাকি বলি মাত্র। শরভ বলতে বোঝা যায় তিন রকমের প্রাণী— এক, হাতির বাচ্চা; দুই, উট; তিন, একপ্রকার কল্পিত পশু যার আটটি পা এবং যে সিংহের চেয়েও বলবান্। শেষের দুটির মধ্যে একটির বাস শুধু কল্পনালোকে, অন্যটি বাঙলায় দুষ্প্রাপ্য। কাজেই বাকি হাতির বাচ্চা। হাতি যে বলির মধ্যে গণ্য ছিল তার অন্য প্রমাণও রয়েছে।

দেবীপূজায় নরবলি যে প্রশস্ত ছিল তা স্পষ্ট করেই লেখা রয়েছে। বলা হয়েছে, যথাবিধি প্রদত্ত একটি নরবলিতে দেবী হাজার বছর তৃপ্তিলাভ করেন, তিনটিতে লক্ষ বছর।

তারপর রয়েছে নরবলির সুলক্ষণ অলক্ষণের কথা। কাণ, বিগতাক্ষ, অতিবৃদ্ধ, রোগী, গলদ্‌ব্রণ, ক্লীব, অঙ্গহীন, বদ্ধলিঙ্গ, গুল্‌ফ-শূন্য, হ্রস্বকায়, মহাপাতকী, বারো বছর থেকে ছোট বালক বা মৃতাশৌচযুক্ত নর ছাড়া আর সবই বলির যোগ্য। স্ত্রীপশু, পক্ষিণী বা নারী কখনও বলি দেওয়া চলে না।

কালিকা পুরাণের বলির মন্ত্রের সঙ্গে ধর্মপূজার বলির মন্ত্রের সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। এই বলির মন্ত্র

"খড়্‌গেন ছিন্দি ছিন্দীতি ততশ্চিল কিলেতি বৈ
ততঃ চিকিচিকীত্যেবং ততঃ পিবপিবেতি চ॥"

পূজা যজ্ঞে পশুবধ হিংসার মধ্যে গণ্য হত না।

যদিও কালীপূজা, বলিদান ইত্যাদির সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের সম্পর্ক নিয়ে নানা তর্কবিতর্ক উঠতে পারে, তবু সামাজিক দিক্ থেকে এ রাজসিকতা যে সেকালের বাঙালীর বৈষ্ণবী তামসিকতার বিকারের পরম মূল্যবান্ প্রতিষেধক হয়ে এসেছিল তাতে মতদ্বৈধ হবার কথা নয়। একদিকে আড়াইশ' বছরের নিরবচ্ছিন্ন শক্তিক্ষয়ী কামচর্চা সমগ্র সমাজকে করে তুলেছিল ক্রমশ দুর্বল হতে দুর্বলতর, অন্যদিকে সমাজের বিচ্ছিন্ন দুটি দলের একটিতে অর্থাৎ অধঃস্তরের দলটির মধ্যে রাজধর্মের ছোঁয়াচ লেগে ভাঙ্গন ধরে উঠেছিল। দেবী কালিকার শক্তিমন্ত্র শুধু যে বাঙালীকে এ দু'টি মহা বিপদ থেকে মুক্ত করল তা-ই নয়, বিচ্ছিন্ন দুটি দলের মধ্যে সেতুবন্ধনটি আরো একটু দৃঢ় করে তুলল; সে সেতুটির ভিত্তি গড়ে উঠেছিল তান্ত্রিকবাদের মধ্য দিয়ে।

ফলে, বাঙালী সমাজ পেল পুনর্জীবন; বাঙালী যেন কিছুটা আত্মস্থ হল এবং পরবর্তী শতকে সে আত্মস্থতা আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হল কৃত্তিবাসের রামায়ণ গানে।

কৃত্তিবাসের কাল

(পঞ্চদশ শতক)

[ছয়]

গীয়াসুদ্দীন আজমশাহ (১৩৯১-১৪১০)

রাজা গণেশ (দনুজমর্দন দেব) (১৪১৪-১৪১৫)

গণেশ-নন্দন যদু (জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ) (১৪১৫-১৪১৬ ; ১৪১৮-১৪৩৩)

নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৩৭-১৪৫৫)

বারবক শাহ (১৪৫৫-১৪৭৬)

হাবশী সুলতান (১৪৮৭-১৪৯৪)

চতুর্দশ শতকে সমগ্র বাঙালী সমাজ কিছুটা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে পঞ্চদশে এসে বসল রামায়ণ গানের আসরে। এই রামায়ণই বাঙালীর প্রথম জাতীয় কাব্য; রচয়িতা কৃত্তিবাস ওঝার জন্ম হল চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের সন্ধিক্ষণে ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী, অধুনাতন রাণাঘাটের সন্নিকটে ফুলিয়া গ্রামে। বাল্মীকির রামায়ণ ছিল অন্যান্য শাস্ত্রের মত দেবভাষায় রচিত; মাত্র মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ বাঙালীর বোধগম্য। সেই অমৃতের প্রস্রবণকে সারা বাঙলার সর্বস্তরে বহমান করে দিয়ে কৃত্তিবাস বাঙালী সমাজকে শুধু প্রাণবন্তই করলেন না, পবিত্রতরও করলেন। দেবী কালিকার বোধনে যে শুদ্ধিমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল তারই পরিশিষ্ট রচনা করল রামায়ণ গান। সারা বাঙালীর সমাজ সে গানকে মনে প্রাণে গ্রহণ করল; সে গ্রহণে কোনো ফাঁক ছিল না, সমাজের নানা স্তরের লোকের নানা বহির্বাসও তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি।

রামায়ণকে সমাজ শুধু গ্রহণই করল না, তাকে একান্তভাবে ঘরোয়া করে নিতে শুরু করল যুগে যুগে। তাই ক্রমে ক্রমে সে গান হল পরিবর্তিত বাঙালীর দেওয়া পোশাকে এবং ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রথম মুদ্রিত হল তখন তার মৌলিক রূপের

যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। এই অবিরত পরিবর্তনের ফলেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বহমান স্রোতের মতই চিরদিন রয়েছে সাবলীল, সজীব ও সর্বযুগে ও সমাজের সর্বস্তরে সমাদৃত।

বাঙলাদেশে তখনও গণ্যমান্য দেবতা পাঁচজন: বিষ্ণু, শিব, চণ্ডী, মনসা ও ধর্ম। প্রথম তিনজন পৌরাণিক, বাঙলার বাইরেও পূজিত। বাকি দু'জন জানপদ দেবতা, তবে ব্রাহ্মণ্যধর্মেও 'মনসা'র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দ্বাদশ শতকের মধ্যেই; চাঁদ সওদাগর সে প্রতিষ্ঠার্জনের প্রতিষেদ্ধা হয়ে বাঙলা সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে। চাঁদ সওদাগরের গল্পটি কাল্পনিক সন্দেহ নাই, কিন্তু বৌদ্ধ বাঙালীর চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্যই তাকে কোল দিতে চেয়েছে বাঙলার সমস্ত অঞ্চলই, সে অঞ্চল নাব্য বা সমতল যাই হোক না কেন—এমন কি পার্বত্য অঞ্চল দার্জিলিংও। ধর্মঠাকুর বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি বলে অনেকের অভিমত, কিন্তু 'ধর্ম' যে বহু মতের জগাখিচুড়ি সে মতটিই বেশী সমীচীন বলে মনে হয়। কারণ এর মধ্যে নেই কি? এর জগতোৎপত্তির কাহিনী বৈদিক, পূজাপদ্ধতি শাক্ত মতের, যথা, বলিদান; অঙ্গে তান্ত্রিকবাদের চিহ্ন, কারণ মদ্যমাংসে এর প্রীতি। বৌদ্ধ বহির্বাস, কারণ রামাই পণ্ডিত বলেন, 'সুন্য মূর্ত্তি ধ্যান করি—সাকার মূর্ত্তি ভজি'। এর মধ্যে হয়ত মহাযানের প্রাণসত্তা তান্ত্রিক ও পৌরাণিক খোলসে বর্তমান রয়েছে: পূর্ববর্তী সহজযানপন্থীরাই সাধারণত এ ধর্মের ধারক ও বাহক। তাদের আধিপত্য হল প্রধানত দক্ষিণ রাঢ়ে।

দক্ষিণ রাঢ়ে তাম্রলিপ্তি ও সাগরের মধ্যে যে তটভূমি তা ক্রমশ বিস্তৃত হতে বিস্তৃততর হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে বিস্তৃত হতে বিস্তৃততর সুন্দরবন আর বাঙলার প্রখ্যাত ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমীরের আড্ডা। লৌকিক ধর্মেও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন দক্ষিণরায় বাঘবাহনে, কালু রায় কুমীরবাহনে। পরে ইসলামী 'পীর বড় খাঁ' এসেছেন সুন্দরবনের সার্বভৌম সম্রাট্‌রূপে।

বরেন্দ্র বা পৌণ্ড্রবর্ধনে স্থান করে নিয়েছেন 'সত্যপীর' : পাঁচ পীরের দরগা স্থাপিত হয়েছে সোনারগাঁয়ে এবং তার মধ্যে নদীবহুল পূর্ব বাঙলার বাঙালী সমাজ গ্রহণ করেছে 'পীর বদর'কে। তুফানে পড়ে এমন কোন মাঝি আছে যে এখনও 'পাঁচ পীর বদর --বদর বদর' বলে হাঁক দেয় না ? বদরের শিরনি মানে না ? বদরের স্তুতি হল ঃ

"আমরা আছি পোলাপান, (ছেলেমানুষ)
গাজী আছে নিখমান :
শিরে গঙ্গা দরিয়া
পাঁচ পীর বদর বদর বদর।"

বাঙলার প্রবাদ 'বিলের গরু (অর্থাৎ বেওয়ারিস) বদরের শিরনি।'

মনসার সঙ্গে ক্রমে এসে জুটেছেন মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী, বাশুলী প্রভৃতি। এঁরা জনপদের দেবতা--এখনো বাঙালীর ঘরে পূজা পান। এঁদের ঘিরে রচিত হল নানা মঙ্গলকাব্য। সে-সব ঘরোয়া দেবীর স্তুতি সামাজিক দিক্ থেকে ছিল পরম যুগোপযোগী--- বাঙালীর স্বধর্ম-প্রীতির পক্ষে অমোঘ রক্ষাকবচ।

এবার পঞ্চদশ শতকের রাজনৈতিক চিত্রপটের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

গীয়াসুদ্দীন আজম শাহের দৃষ্টি ছিল সুদূর আরবের দিকে-- মক্কা, মদিনায়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পরধর্ম-অসহিষ্ণু। তিনি অযথা বড় বড় রাজকার্য থেকে পরধর্মীদের বিতাড়ন শুরু করলেন।

ফল অবশ্য ভাল হল না। দেশে যে অন্তর্বিপ্লব শুরু হল তার পরিণতি দেখা দিল তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই। বরেন্দ্রের ভাতুরিয়া অঞ্চলের পরাক্রান্ত ভূস্বামী গণেশ তক্ত দখল করে বসলেন ; পাঁচ শতক মুসলমান রাজত্বের কালে গণেশই একমাত্র হিন্দু রাজা। বাঙলার সুফী-দরবেশদের টনক নড়ল---তাঁরা কখনো নিরীহ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন নি, তখনও করলেন না। রাজা

গণেশের বিতাড়নের জন্য তাঁরা জৌনপুরের সুলতানের সাহায্য ভিক্ষা করলেন। সুলতানের সাহায্যে তাঁরা যে বিশেষ কিছু করতে পারতেন তা নয়, কিন্তু গণেশের পুত্র যত্নই হল কাল। হয়ত লোভে পড়ে মুসলমান হয়ে পরে তিনি হলেন বিশ্বাসঘাতক, এবং বাপের বিরুদ্ধে সুলতানের সঙ্গে দিলেন যোগ। রাজা গণেশের সাময়িক পরাজয় হল বটে, কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি তক্ত দখল করে বসলেন দনুজমর্দনদেব রূপে। তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আর তাঁর পিতৃদ্রোহী পুত্র সে গদি দখল করতে পারেনি।

পরে যত্ন এলেন জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ নাম নিয়ে। রাজা গণেশের কাল থেকেই গৌড় বা লখনৌতির শাসিত রাজ্যের প্রসার ঘটেছিল প্রায় বাঙলার সর্ব অঞ্চলেই—বরেন্দ্রে, পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গে। সে সীমানা অব্যাহত রইল যত্নর কালেও।

যত্নর মৃত্যুর প্রায় অব্যবহিত পরেই নাসিরুদ্দীন দখল করলেন গদি। তাঁর বংশপরিচয় ও তক্তদখলের কাহিনী আজও এক অজ্ঞাত রহস্য। তিনিও সুযোগ্য শাসক ছিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্র বারবক শাহ তাঁর চেয়েও বেশী কুশলী। বারবক শাহ নিঃসন্দেহে বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান। ইনি পরধর্মসহিষ্ণু ও গুণগ্রাহী যে ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, কারণ এঁরই কালে মালাধর বসু 'গুণরাজখাঁ' উপাধি পেলেন; জাতীয় কবি কৃত্তিবাস পেলেন এঁরই সংবর্ধনা। ইনি যে ইসলামী হাকিমি চিকিৎসা থেকে বাঙলার কবিরাজী চিকিৎসার বেশী পক্ষপাতী ছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে অনন্ত সেনের রাজবৈদ্য-রূপে নিয়োগে। আজম শাহ করেছিলেন বিধর্মীদের উৎখাত, বারবক আবার তাদের এনে যথাযোগ্য কাজে নিয়োগ করলেন।

কিন্তু হয়ত বাঙলায় ইসলামী শাসন-ব্যবস্থাটা দৃঢ় করার একটা পরিকল্পনা তাঁর মাথায় ঢুকল। তাই ডেকে আনলেন হাজার হাজার হাবশী বা আফ্রিকার আবিসিনিয়ার অধিবাসী মুসলমানকে। তাদের মধ্যে অনেককে বড় বড় কাজও দিলেন; কেউ হল প্রাদেশিক

শাসনকর্তা, কেউ অমাত্য, কেউ মন্ত্রী। কিন্তু তিনি যে খাল কেটে কুমীরই আনলেন তার পরিচয় পেল তাঁর পরবর্তী পুরুষ। এই হাবশীরাই শেষে তাঁদের একজনকে হত্যা করে তক্ত দখল করল।

বারবকের পুত্র য়ুসুফ শাহ হয়ে দাঁড়ালেন কুলদূষণ ; হিন্দুর মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরি করার প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। তাঁরই কালে পাণ্ডুয়ার (হুগলী) সূর্য ও নারায়ণ মন্দিরের মালমশলা দিয়ে তৈরি হল সেখানকার মসজিদ ও মিনার। তাঁর পরে আসরে নামলেন য়ুসুফের খুল্লতাত ফতেহ্ শাহ বা হোসেন শাহ, মাত্র বছর খানেকের জন্য সেই একই ভূমিকা নিয়ে। সে অত্যাচারের কিছু কিছু চিহ্ন রয়েছে বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে' বা 'পদ্মাপুরাণে' আর জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে।' বাঙালী সমাজের সে দুর্দশার কথা যথাসময়ে বলা যাবে। এর পরে হোসেন শাহকে খতম করল একজন হাবশী এবং অল্পকালের মধ্যেই তাকেও খতম করে সুলতান হলেন হাবশীগোষ্ঠীরই ফিরোজশাহ। তাঁকেই বাঙলার প্রথম হাবশী সুলতান বলে ধরা হয়। হোসেন শাহের কালে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয় ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী।

এদিকে বাঙলায় হাবশী আমল চলল প্রায় সাত বছর। তারপর শেষ হাবশী সুলতানকে হত্যা করে তক্তে যিনি বসলেন তাঁর নাম আলাউদ্দীন হোসেন শাহ, ১৪৯৩ বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। হাবশী আমলেও মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মমতের মানুষের পেষণ ও শোষণ রইল অব্যাহত ; দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা হল ব্যাহত।

পঞ্চদশ শতকে কালিকা পুরাণের ব্যাপক প্রসারের ফলে বাঙালীর সমাজে শক্তিমন্ত্রের দীক্ষা বেড়ে চলেছিল, কিন্তু তখনো সমাজে অবাধ কামলীলার মত্ততা সর্বত্র হ্রাস পায়নি। জয়ানন্দ লিখেছেন,

"মা বাপ ছাড়িল পুত্র স্বতন্ত্রা যুবতী
পরদারে রত হৈল লজ্ঘে নিজপতি।
... ...
মংস্য মাংস লোলুপ ব্রাহ্মণ সব যত।"

তারপর, "মৎস্য মাংসে প্রিয় হৈল বিধবা যুবতী।"

সর্বশেষ, "সর্ব্বলোক হৈল শিশ্নোদরপরায়ণ।"

পঞ্চদশে গৃহস্থের তৈজসাদি ও বিলাসদ্রব্যের মধ্যে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে ডাবর, বাটা ও পানের ডিবার দিকে। পান শতকের পর শতকে শুধু বাঙলায় নয়, সারা ভারতবর্ষেই বিলাসের, আতিথেয়তার ও মাঙ্গলিকের একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে রয়েছে। পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় পাদে ভারতবর্ষে এসেছিলেন আরবীয় বণিক আবদুর রেজাক। তিনি লিখেছেন, হিন্দুস্থানের সর্বত্র রয়েছে পানেব কদর, এমনকি আরবে ও হরমুজে অর্থাৎ পারশ্যের বাসোরায়ও এর প্রচলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাঝে মাঝে পানের মধ্যে কর্পূর দেওয়া হয়; পান চিবুতে চিবুতে মাঝে মাঝে পিকও ফেলতে হয়। পান চিবুলে শরীর চাংগা হয়ে ওঠে; মদের মত এতেও কিছু নেশা জন্মে। পানে কিছু ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটে, পরিপাক-শক্তি সঞ্জীবিত হয়, মুখের গন্ধ শোধিত হয়, দাঁতের শক্তি বেড়ে যায়, আর রতিকামনা উদ্দীপিত হয়। ইবন বতুতা আর পূর্ববর্তীরাও এরূপ প্রশংসাপত্রই দিয়েছেন। ত্রয়োদশ শতকে দিল্লীর তুর্কী সুলতান বলবনের পঞ্চাশ-যাটটি পরিচারক তাম্বুল তৈরি ও বিতরণে নিযুক্ত থাকত।

নেশার প্রসঙ্গে মদ, ভাঙ, গাঁজা ও আফিংএর কথা এসে পড়ল। ভারতবর্ষের সর্বত্র এসব নেশার প্রচলন ঘটেছিল বহু পূর্বে। মদ প্রথমে তৈরি হত নানা ফল থেকে--শেষ পর্যন্ত তার আঁতুড় রচিত হল ভাতের হাঁড়িতে ও তাল বা খেজুর রসের ভাঁড়ে। কেবল তাল, খেজুর বা নারিকেল জল গাঁজিয়ে তৈরি হত তাড়ি; দামেও সুলভ আর পাওয়াও যেত সর্বত্র। এটি ছিল জানপদ, জনপ্রিয় পানীয়। ইসলামে মদ নিষিদ্ধ হলেও সুলতান ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সদরে ও অন্দরে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। অনেকে পারশ্য থেকেও মদ আনাতেন। তাই বাঙলার নাম ছিল মদ্যপ মুসলমানের দেশ।

ভাঙের ঝাড় জন্মাত প্রায় সর্বত্রই ; তারই পাতা বেটে তৈরি হত সরবত—অপেক্ষাকৃত ধনীরা তার মধ্যে পেস্তা, বাদাম ইত্যাদি মিশিয়ে তাকে করে তুলতেন স্বাদু। হিন্দুর ঘরে ঘরে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। গাঁজা, সিদ্ধি বা ভাঙ গুল্মেরই মঞ্জরী। সে মঞ্জরী শুকিয়ে, পুড়িয়ে ধূমপান করা হয় একটি বিশেষ রকমের কলকেতে : সে কলকে ধরা হয় দু'হাত একত্র করে এবং ধূমপানও চলে যৌথভাবে। পোস্ত ফলের রস থেকে তৈরি হয় আফিং ; এর মাত্রা সামান্য। এর গতিবিধি সর্বত্র ; রাজপ্রাসাদে ও দরিদ্রের কুটীরে সর্বত্রই এর সমান আদর। রাজপুত রানারা একে সসম্মানে বরণ করতেন, এমনকি ভারত সম্রাট্ হুমায়ুনও এর পরম ভক্ত ছিলেন। আফিংসেবীর পক্ষে এ নেশা ত্যাগ করা প্রায় অসম্ভব। বাঙলায় এসব মাদক দ্রব্য, বিশেষ করে উগ্রবীর্য পানীয় তৈরির সর্বপ্রকার সুবিধা ছিল, তাই এ অঞ্চলে তা হাটে বাজারে অবাধে বিক্রি হত।

চৈতন্যমঙ্গলে গৃহস্থের আর যেসব তৈজসাদির সন্ধান পাওয়া যায়, তামার হাড়ি, পিত্তল কলস, বাটি, রসময় থাল, ত্রিহুতের গাড়ু, পিত্তলের ঝারি, উড়িয়া, গৌড়ীয়া কুলুপ, কাশ্মীরদেশের ক্ষুর, কাঞ্চীদেশের বেলী তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বিলাস-দ্রব্যের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে বিচিত্র চিরুনি, পাটের কাপড়, ভোটকম্বল, ইন্দ্রনীলমণি, লক্ষ্মীবিলাস খাট, কৃষ্ণকেলি বসন ও বিষ্ণুতেল।

মহাপ্রভুর বিবাহে বরযাত্রীরা কি কি খেয়েছিল ?

"পিষ্টক, পায়স, ঘৃত, দধি দুগ্ধ গুড়ে
বরজাত ভোজন করিল সৌড়ে সৌড়ে।" (সারে সারে)

সেকালে 'জগন্নাথের ভোগের' অর্থাৎ মহাপ্রসাদের তালিকা দেখা যাক।

"ব্যঞ্জন লাঁকড়া (লাবড়া) মদগ, সূপ ছানা বড়ি
ভাজা কোল তলা নারিকেল কোরা বড়ি

বড় আম্লা শর্করা কাঁজবড়া খীর ছেনা
অমৃতগুটিকা দুগ্ধকোরা চিনিপানা
মধুমণ্ডা, ঘৃতমণ্ডা, চিনিমণ্ডা, পিঠা।"

কবির কলিযুগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী—

"দেউল দেহরা মঠ ভাঙ্গিবে যবনে
শূদ্র সব করিবেক পুরাণ বাখান
শূদ্রাণী লইয়া ঘর করিব সন্ন্যাসী
কন্যা বেচিবেক যে সর্ব্বশাস্ত্র জানে
ব্রাহ্মণে রাখিব দাড়ি পারস্য পড়িবে
মোজা পাএ নড়ি হাথে কামান ধরিবে
মনসরি আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর
ডাকা চুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর
শূদ্রে পূজিবেক মূর্ত্তি শালগ্রাম শিলা
শূদ্র জগৎ গুরু হবে ম্লেচ্ছ হবেক রাজা
রাজা সর্ব্ব হরিবেক দুঃখিত হবে প্রজা।"

প্রজা যে তখন নিতান্তই দুঃখিত হতে শুরু করেছিল তা যথার্থ। নবদ্বীপ ও পিরলিয়া পাশাপাশি গ্রাম; দুই গ্রামের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল বহুবিধ। পিরলিয়া বা পিরল্যা যখন আর নবদ্বীপের সাথে পেরে উঠছিল না তখন করল কূটবুদ্ধির আশ্রয়গ্রহণ। গুজব রটিয়ে দিল যে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা বলাবলি করছে যে শীঘ্রই দেশের রাজা হবে একজন ব্রাহ্মণ। গুজব গেল কাজীর কানে, তারপর গৌড়াধিপের কানে। তারপর,

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়
ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয়।
... ...
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে
ঘর দ্বার লোটে তার লৌহপাশে বান্ধে॥"

দুর্বল, পরধর্মবিদ্বেষী হোসেন শাহ গুজবেও বিশ্বাস করতেন।

তুকতাকের সঙ্গে সঙ্গে জাদুবিদ্যাও যে পূর্বাঞ্চলে ত্রয়োদশ শতক থেকে পরম চমকপ্রদ হয়ে উঠেছিল তার উল্লেখ করছেন প্রখ্যাত কবি আমীর খশ্রু আর চতুর্দশে ইবন বতুতা। ইবন বতুতা বলেছেন, চাটগাঁ থেকে কামরূপ এক মাসের পথ; সে দেশের লোক জাদুবিদ্যা ও অভিচারে পরম দক্ষ। তিনি কোন্ কোন্ জাদুবিদ্যার নিদর্শন পেয়েছিলেন তার উল্লেখ করেন নি বটে, কিন্তু তা করেছিলেন সম্রাট্ আকবরের সভাসদ্ আবুল ফজল ষোড়শ শতকে। তিনি বলেছেন, এ সব জাদুবিদ্যা ও প্রহেলিকা এমন চমকপ্রদ যে দেখলে মনে হবে যে স্বয়ং পয়গম্বর এসব তাজ্জব কাণ্ড দেখাচ্ছেন। দু'-তিনটির কথা এখানে উল্লেখ করছি।

দর্শকবৃন্দের সামনেই কোনো পাত্রে একটি আমের আঁঠি পোতা হত। তা থেকে গাছ বেরিয়ে, বড় হয়ে, তাতে ফল ধরতো ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই। আমগুলি যে সত্যই আম তা পরখ করতেন দর্শকেরা, আম চেখে!

একটা মানুষকে টুকরা টুকরা করে কেটে ঢেকে রাখা হত। পরে জাদুকর হাঁক দিলে তাজা মানুষটা এসে দর্শকদের সামনে দাঁড়াত।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল দড়ির খেলা বা "Rope Trick" যার কথা বলে সারা পাশ্চাত্য জগৎ এখন ভারতবর্ষের কথা স্মরণ করে। অনেকে ভাবেন, এটা বোধহয় একটা ঝোলানো দড়ির উপর দিয়ে কিছু না ধরে হাঁটা, কিন্তু তা নয়, ব্যাপারটা সত্যই চমকপ্রদ।

এ খেলা দেখায় দু'টি লোক, একটি স্ত্রী অন্যটি পুরুষ, অর্থাৎ একজোড়া দম্পতি। খোলা জায়গায় খেলা দেখানো হয়; চারিদিকেই থাকে দর্শক। পুরুষটি তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলে, যাই একবার স্বর্গে ঘুরে দেখে আসি আমাদের এ খেলার দর্শকদের সুকর্ম ও কুকর্মের ফিরিস্তা। স্ত্রী বলে, বেশতো। পুরুষটি জামার পকেট থেকে একটা দড়ি বের করে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেয়;

দড়িটির মধ্যে মাঝে মাঝে গাঁট পাকানো। দড়িটির একদিক্ থাকে তার হাতে, অন্যদিক্‌টি শূন্যে ওঠাতে ওঠাতে দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। তারপর সে সেই দড়িটির গাঁট বেয়ে বেয়ে নিজেও শূন্যে মিলিয়ে যায়। যায় কিছুক্ষণ। সহসা তার প্রতিটি অঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে একে একে মাটিতে পড়তে থাকে। দর্শকেরা অবাক বিস্ময়ে এসব দেখে, আর জাদুকরের স্ত্রীটি সেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কুড়িয়ে নিয়ে একদিকে করে জড়। সব জড় হলে সে নিজে তার স্বামীর চিতা সাজিয়ে সেগুলি দাহ করে আর অগ্নিদেব লেলিহান হয়ে উঠলে সে নিজে তাতে আত্মাহুতি দিয়ে 'সতী' হয়। সর্বশেষ অবশিষ্ট থাকে ভস্ম।

এমন বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যে সহসা জাদুকর আকাশ থেকে লাফিয়ে পড়ে; দর্শকের দলে লাগে চমকের পর চমক। সে লাফিয়ে পড়েই তার স্ত্রীর কথা দর্শকদের জিজ্ঞেস করে—কোথায় সে? দর্শকদের কেউ কেউ তার অন্তর্ধানের পরবর্তী ঘটনাগুলি বলে যায়, কিন্তু সে-সব কথায় সে মোটেই বিশ্বাস করে না। বলে, না এ সত্য হতে পারে না, নিশ্চয়ই এ মুলুকের ভূস্বামী বা অন্য কেউ তাকে লুকিয়ে রেখেছে। জাদুকর তার স্ত্রীর নাম ধরে বারবার হাঁক দিতে থাকে; আর, অবাক কাণ্ড, তার স্ত্রীটিও বেরিয়ে আসে দর্শকদের মধ্যে স্ত্রীলোকদের জন্য সংরক্ষিত স্থান থেকে।

এমন আশ্চর্য খেলার জন্ম হয়েছিল পূর্বাঞ্চলে, হয়ত বা বাঙলায়ই। কিন্তু তার চিহ্নমাত্রও আজ মাত্র চারশ' বছর পরে নেই!

এবার আবার বাঙালী সমাজের দুর্দশার কথায় ফিরে আসা যাক। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি এ শতকের যে চিত্র এঁকেছেন তাঁর 'কীর্তিলতায়', তাতে এর কিছু সন্ধান পাওয়া যায়ঃ

"হিন্দু তুরকে মিলল বাস
একক ধম্মে অওকো উপহাস।
... ...

হিন্দু বোলি দূরহি নিকার
ছোটেও তুরুকা ভভকী মার।"

অর্থাৎ একের ধর্ম অন্যের উপহাস। তুরক ছোট হলেও বড়কে মারতে যায়।

জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলে বাঙলার যে চিত্র এঁকেছেন তা পঞ্চদশের চতুর্থপাদের এবং নবদ্বীপ-ঘেঁষা আধুনিক পশ্চিম বাঙলার, বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলের পটভূমি মোটামুটি পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙলার, প্রায় চৈতন্যমঙ্গলেরই সমকালীন। বিজয় গুপ্তের মধ্যে চতুর্দশের ছাপ বেশী প্রকট।

পদ্মাপুরাণে সর্বত্যাগী মহাদেবের যে কামবিহ্বল মূর্তি আঁকা হয়েছে তা সে-কালের সমাজেরই প্রতিচ্ছবি ; শিবের এমন নৈতিক দুর্গতির কথা অসম্ভাব্য।

বিজয় গুপ্তের ভাষায় ঃ

"মুক্তি তোমার নামে, তুমি তো মোহিত কামে
নরপশু কিসে লাগে আর।"

সুলতান হোসেন শাহ অর্থাৎ য়ুসুফের খুড়ার স্তুতি গেয়ে গুপ্ত অবশ্য বলেছেন, 'সুলতান হোসেন সা নৃপতি তিলক', কিন্তু সে প্রশস্তি যে নিতান্তই মৌখিক তাতে সন্দেহ নেই। তার প্রমাণ রয়েছে 'হাসেন হোসেন সংবাদে।'

হোসেনহাটি গ্রামে কাজির সাকরেদ দুলা হালদার,

"যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ।
পক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্র কিল
পাথরের প্রমাণ ঝড়ে পড়ে শিল।
... ...
যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে কান্ধে
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে

ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুক
তার পৈতা ছিড়ে ফেলে থুথু দেয় মুখে।”

এ সব অপমান ও অযথা দুর্গতির বিরুদ্ধে নালিশ করে কোনো সুবিচারের আশা নেই, কারণ স্বয়ং কাজি বলেন :

“হারামজাত হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান।”

তারপর তিনি নিজে কি করেন ?

“সেই ছিল হিন্দুর কন্যা তার কর্ম্মফলে।
বিবাহ করিল কাজি ধরি আনি বলে॥”

ব্যাপক ও বহুশতকের নৈতিক অধোগতির ফলে সমগ্র হিন্দু-সমাজ এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি মুসলমানের বিরুদ্ধে সক্রিয় কোনো প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা তার ছিল না। ফলে একদিকে সমাজ হয়ে উঠল একান্ত দৈবনির্ভর, অন্যদিকে অত্যাচারিতকে নির্বিচারে বর্জন করে সমাজশক্তিকে শুধু ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর করেই তুলল। দৈবাশ্রয়ী সমাজ ‘কর্মফলের’ তমসায় হল অন্ধ ; বৌদ্ধযুগে, অর্থাৎ বাঙলার একাদশ শতকেও, উপনিষদের যে কর্মবাদ ও কর্মফলের সুরঝংকার সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে রেখেছিল এবং যার শেষ রেশ রয়েছে এই পদ্মাপুরাণের মনসা ও চাঁদ সওদাগরেরই দ্বন্দ্বের মধ্যে, পরবর্তী কালে তার কদর্থ হতে হতে পরিসমাপ্তি ঘটল তামসিক ও দুর্বলের পরম অবলম্বন একান্ত দৈবনির্ভরতার মধ্যে। গীতা যে দৈবকে কর্মসিদ্ধির পথে পঞ্চম বা সর্বনিম্ন স্থান দিয়েছে তা-ও বাঙালী বিস্মৃত হল। তাই ‘ভূতের’ ভয় দেখিয়ে, এক্ষেত্রে সাপের ভয় দেখিয়ে, এ অত্যাচারের প্রতিরোধকে শুধু হাস্যকর করেই তুলল। এছাড়া আর উপায়ও ছিল না। এরই অন্যদিক্, অর্থাৎ নির্বিচারে অত্যাচারিতকে সমাজে বর্জন করার কথা, পরে আসবে।

এসব অত্যাচারের পটভূমিকায়ই বারবক শাহের আশ্রয়ে এক

কাল্পনিক 'কালাপাহাড়' বা হিন্দুদলনকারী, মন্দির-ধ্বংসী ও ধর্মান্তরিত হিন্দুর উপাখ্যান প্রচলিত হয়েছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় ষোড়শ শতকের সুলতান সুলেমান কররানীর সেনাপতি; তিনিই নানা দেবদেউল ও দেবমূর্তি ভগ্ন করেন। তবে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে হিন্দু থেকে মুসলমান হন এ উপাখ্যান ভিত্তিহীন।

'মনসামঙ্গলে' মনসার বিবাহের চিত্রটির সাথে আধুনিক হিন্দু বিবাহের চিত্রের বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই; পঞ্চদশ শতকের প্রায় সকল স্ত্রীআচারই এখনো বজায় রয়েছে। 'এয়ো'দের মঙ্গল গান, জোকার, 'পানগুয়া' তেল-সিন্দূরের আতিথ্য, অধিবাস, বৃদ্ধি, ষোড়শমাতৃকা পূজা, মঙ্গল স্নান, শুভদৃষ্টি, শয্যা তোলা সবই বর্তমান। মনসার পিতা শিব ঠাকুর কিন্তু কন্যাদান করলেন 'বেদবিধানে', শৈবমতে নয়। বলা বাহুল্য, মনসামঙ্গলের অন্যতম রূপই মনসার পাঁচালী; কথাটি এসেছে সংস্কৃত 'পঞ্চালিকা' থেকে, যার অর্থ খেলার বা নাচের পুতুল।

মেয়েদের নামেরও যে বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে তা মনে হয় না; সেকালের এয়োদের নামের তালিকায় দেখা যাচ্ছে কমলা, বিমলা শশিপ্রিয়া, তিলোত্তমা, চন্দ্ররেখা, সত্যবতী, যমুনা, জাহ্নবী, চন্দ্রকলা, বিজয়া, বিদ্যাধরী।

ফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এলাচি, লবঙ্গ বা লঙ্গ, চালিতা, জাম্বুরা বা বাতাবি নেবু। প্রথম দু'টি পর্যাপ্ত পাওয়া যেত মালাবারে; বাঙলায় তা কম ফলত না, হয়ত দক্ষিণ রাঢ়ে ও সুন্দরবনে। বিজয় গুপ্তের বাড়ি ছিল অধুনাতন বাখরগঞ্জে।

বাঙলায় তখন ব্রাহ্মণের পক্ষে হালচাষ দোষাবহ বলে সমাজ মনে করত, কারণ কবি কোনো কোনো দেশ সম্পর্কে নিন্দাসূচক ব্যঙ্গোক্তি করে বলেছেন,

> "ভট্টাচার্য্য হাল চষে গলায় পৈতা দিয়া
> স্ত্রীলোকেতে ঘুটা বাছে বিবস্ত্রা হইয়া।"

আহার্য ব্যাপারে পশ্চিম ও পূর্ব-দক্ষিণ বাঙলায় বিশেষ প্রভেদ নেই ; হয়ত দ্বিতীয়টিতে আমিষের আধিক্য কিছু বেশি।

নিরামিষে, 'নারিকেল কোরা দিয়া মুসুরীর সুপ', কলার থোড়, দুগ্ধ-লাউ, সুক্তাপাতা দিয়া কলাইর ডাল, কাঁচা কলা দিয়া সুগন্ধ পাচন, পাটায় ছেঁচা পোলতা পাতা, বেগুন দিয়া ধনিয়া পোলতা, ঘৃতপক্ব গিমা শাক, লাউর আগা, কুমারডগা, পুঁইশাক, নানা প্রকার কচু, পাকা কলা ও লেবুরসের অম্বল।

আমিষে, 'রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কাতলার আগ' মাগুর মৎস্য গিমা, তৈলে খরসুল মাছ, চিঙ্গড়ীর মাথা, রোহিত আর চিতলের কোল ভাজা, কৈ মৎস্য দিয়া মরিচের ঝোল, 'ছাগ মাংস কলার মূলে অতি অনুপম', শোল মৎস্য দিয়া আমের অম্বল। মাছের চুপড়িতে এবারই প্রথম বাঙালীর প্রিয় ইলিশের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

মিষ্টি, দুই তিন রকমের পিষ্টক পায়স, দুগ্ধে পিঠা।

শাকুন-শাস্ত্রের 'হাঁচি জেঠি'র বাধা তখনো প্রবল এবং অব্যাহত রয়েছে অন্তর্বত্নী পত্নীকে সামাজিক অখ্যাতি এড়াবার জন্য 'ছাড়পত্র' লিখে দিয়ে বিদেশযাত্রার প্রথা। ভাষার জগতে তখনো আরবী 'আল্লা' প্রবেশ করেনি, ফার্সী 'খোদা'রই রাজত্ব।

এবার চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দডিঙা বাণিজ্য নৌবহরের কথা বলে মনসামঙ্গলের পাঁচালী বা রয়ানী শেষ করি।

প্রত্যেকটি ডিঙ্গারই একটা নাম থাকত—কোনো ডিঙ্গা ছোট, কোনোটি বড়। হাতিয়ার সহ ডিঙ্গারক্ষীর দল থাকত সাথে; কোনো ডিঙ্গায় নৃত্য-গীতাদি আমোদ-প্রমোদের জন্য থাকত 'নাটুয়া'র দল। প্রধান নাবিককে বলা হত 'মালিম'। ডিঙ্গার নামগুলি নানা রকমের : পাটুয়া, শঙ্খচূড়, টিয়াঠুটি, ধবল, কেদার, পক্ষীরাজ, আজেলা, কাজেলা ইত্যাদি।

বিনিময় প্রথা ছিল বিদেশে ক্রয়-বিক্রয়ের মূলে। পাঁচালীতে

তার যে ফিরিস্তা রয়েছে তা যে ঐতিহাসিক সত্য এ কথা হলফ করে বলা চলে না ; না হবার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ শুধু মিলের খাতিরেই অনেক ক্ষেত্রে শব্দের রদবদল করা হয়েছে। তবুও তা থেকে একটা মোটামুটি ধারণা করা সম্ভবপর।

এক কুড়ি নারিকেলের বদলে পাওয়া যেত চৌদ্দ কুড়ি শঙ্খ, মুলার বদলে হাতির দাঁত, হলদের বদলে সোনা, কলাই-এর বদলে মুকুতা, প্রবাল, পাকরিয়া বা পাকা সুপারির বদলে মাণিক্য, মুসুরির বদলে রক্ত হিঙ্গুল, ছাগলের বদলে হরিণ, কবুতরের বদলে ময়ূর।

অবশ্য বিদেশে পছন্দ বা না-পছন্দের অনুপাতে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হত ; তবে দেশে ও বিদেশে সে যুগে 'পাটের শাড়ি'র যথেষ্ট চাহিদা ছিল।

এবার এল কৃত্তিবাসী রামায়ণ-প্রসঙ্গ। বাঙলায় কালিকা পুরাণ যে আসর বেঁধে দিয়েছিল তারই উপর চলল রামায়ণ গান, পঞ্চদশের দ্বিতীয় পাদ থেকে। সে আসরের বোধক রাজা গণেশের পুত্র যদু ওরফে জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ, না তাঁর পরবর্তী বারবক শাহ, তা নিয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, তবে রামায়ণ যে বাঙালীর প্রথম জাতীয় সাহিত্য তা নিয়ে কখনো তর্কবিতর্ক হবে না। কৃত্তিবাস রামায়ণের ছবি এঁকেছেন বাঙালী মনের রঙ দিয়ে ; শুধু কৃত্তিবাসই নন, সমগ্র বাঙালী সমাজই তা করেছে। তাই বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের ঘটেছে অমিল। কিন্তু এ অমিল সম্পর্কে বিশদ আলোচনার স্থান এ নয়। শুধু একটি ব্যতিক্রম সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব, কারণ সেটি আমাদের সামাজিক জীবনে মুখ্য বাৎসরিক আনন্দোৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা অকাল-বোধনের কথা বলছি। বাল্মীকির মূল রামায়ণে শ্রীরামের দুর্গাপূজার কোনো উল্লেখ নেই ; কৃত্তিবাসের রামায়ণে রয়েছে এর মনোরম বর্ণনা। কোথায় পেয়েছিলেন কৃত্তিবাস অকাল-বোধনের সূত্র ?

অন্য যেখানেই তিনি তা পেয়ে থাকুন না কেন, কালিকা পুরাণের পাতায় যে তা পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, কারণ এ পুঁথিটি বাঙলায় তখন বহু-প্রচলিত ছিল।

"রামস্যানুগ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ।
রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা॥"

অর্থাৎ পূর্বে রামের প্রতি অনুগ্রহ এবং রাবণ-বধের জন্য ব্রহ্মা রাত্রিকালে এই মহাদেবীর বোধন করেছিলেন।

দেবী ভগবতীর পূজা মূলত শবর বা অনার্যদের পূজা; দেবী তান্ত্রিকবাদের সিঁড়ি দিয়ে এসে, বাঙালী সমাজের বাৎসরিক শারদীয়া পূজোৎসবের কেন্দ্র হয়ে, চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

মহাভারতের পরিশিষ্টে যুধিষ্ঠিরের দুর্গাস্তবে দেবীর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় বলে সাধারণের বিশ্বাস; কারো কারো মতে অবশ্য এ অংশটি প্রক্ষিপ্ত। বাঙলার পুঁথিতে এঁর উল্লেখ দেখা যায় দ্বাদশ শতকের জীমূতবাহনে, চতুর্দশের কালিকা পুরাণে, ষোড়শ শতকের রঘুনন্দনে। কিন্তু বাঙলায় ব্যাপকভাবে অকাল-বোধনের প্রচলন ঘটেছে এরো অনেক পরে।

যুধিষ্ঠিরের স্তবেও এঁকে শবর, বর্বর, পুলিন্দ প্রভৃতি অনার্য-পূজিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে; ইনি বিন্ধ্যপর্বতবাসিনী 'সুরা-মাংস-বালপ্রিয়া', অপর্ণা অর্থাৎ পত্র-বল্কলাদিও পরেন না—বিবসনা।

কালিকা পুরাণেই এঁর শারদীয়া পূজার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। এখানে তাঁর মহিষমর্দিনী রূপ। মস্তক জটাজুট-সমাযুক্ত এবং অর্ধচন্দ্র শেখরস্বরূপ বিরাজমান। ত্রিলোচনা, মুখ পূর্ণচন্দ্রতুল্য, তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ, সুদন্তা, স্তনদ্বয় পীন ও উন্নত, দেহ ত্রিভঙ্গ ও দশবাহু-যুক্ত। দক্ষিণ বাহুগুলিতে উপর থেকে নিচে পরপর ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ ও শক্তি; বাম বাহুগুলিতে পর পর খেটক, পূর্ণচাপ, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা বা পরশু।

দেবীর নিচে ছিন্নশির মহিষ—খড়্গপাণি দানব, তার বক্ষস্থল

শূল দিয়ে বিদ্ধ; সর্বশরীর মহিষের রক্তে রঞ্জিত। দেবী দানবের কেশাকর্ষণ করছেন।

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে এঁর পূজা—নবমীতে দিতে হয় প্রচুর বলিদান। দশমীতে 'শাবরোৎসবে'র সঙ্গে হবে তাঁর নিরঞ্জন।

শাবরোৎসবটি কিন্তু বর্বরোচিত; দেবীপূজার শুচিতার পরিপন্থী। বিসর্জনের মিছিল হবে রাগনিপুণ কুমারী ও বারনারী ও নাটুয়াদের নিয়ে। সঙ্গে বাদকদল বাজাবে শঙ্খ, তূরী, মৃদঙ্গ ও পটহ বা ঢাক। ধ্বজাবাহীরা ওড়াবে নানা রঙের নিশান, কেউ কেউ ছড়াবে খই ও ফুল, কেউ ছড়াবে ধূলি ও কাদা। কৌতুকও করবে নানা রকমের, আর করতে হবে ভগলিঙ্গাদি-বাচক নানা গ্রাম্য শব্দের উচ্চারণ ও গান এবং নানা অশ্লীল বাক্যালাপ। কারণ,

"পরৈর্নাক্ষিপ্যতে যস্তু যঃ পরান্নাক্ষিপেদ্ যদি।
ক্রুদ্ধা ভগবতী তস্য শাপং দদ্যাৎ সুদারুণম্॥"

সেদিন যদি কেউ তার সঙ্গে অপরের অশ্লীল আচরণ ভাল না বাসে এবং অপরের সঙ্গে অশ্লীল আচরণও সে না করে, তবে দেবী ক্রুদ্ধা হয়ে তাকে নিদারুণ অভিশাপ দেন।

শাবরোৎসবটি শুদ্ধ হয়ে রুচিবিকার-রহিত হতে সময় লেগেছে, কারণ ষোড়শ শতকে রঘুনন্দনের বর্ণনায়ও এর সন্ধান পাওয়া যায়। কালিকা পুরাণেও কিন্তু দেবী দুর্গার পরিবারের মধ্যে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আবির্ভাব হয়নি; শিবের অবর্তমানে শুধু ছেলে দু'টির জন্য ভবিষ্যৎ চিন্তাই তাঁকে আকুল করেছে!

চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতক থেকে মুসলমানের দেখাদেখি হিন্দুরাও বাবরি চুল রাখত; এর আগে তারা রাখত লম্বা চুল। মেয়েরা তখনও কোঁচা দিয়ে কাপড় পরত আর পরত অঙ্গরক্ষণী বা আঙ্গরাখা। কংচুলী বা কাঁচুলিও ছিল প্রায় ত্রয়োদশ পর্যন্ত জনপ্রিয় এবং মেয়েরা তখনো নীবিবন্ধ পরত। ধুতি-চাদর বহুপূর্বকাল থেকেই ভব্য পোশাক বলে গণ্য ছিল।

আমরা এ পর্যন্ত বাঙালী জাতির পোশাক, আহার্য, তৈজস ইত্যাদি সম্পর্কে যে চিত্র তুলে ধরেছি তা তার সমগ্র চিত্র নয়; বস্তুত তা মুষ্টিমেয়, উচ্চবিত্ত বাঙালী সমাজের। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বাঙলায়, শুধু বাঙলায় কেন ভারতবর্ষের কোথাও, মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব হয়নি। সুবিশাল নিম্নবিত্ত সমাজটি ছিল কৃষিনির্ভর। যখন বহির্বাণিজ্য বর্তমান ছিল তখনও রপ্তানী মালের দৌলতে লাভবান্ হত মধ্যবর্তী দালালেরা ও সওদাগরেরা—চাষীরা ছিল যে তিমিরে সে তিমিরেই।

বহির্বাণিজ্যের অবলুপ্তির পরে আর্থনীতিক দিক্ থেকে বাঙালী সমাজ হল পুরোপুরি কৃষিনির্ভর। শিল্প যা ছিল তা-ও ছিল মূলত কৃষকদের চাহিদা মেটানোর জন্য—কামার, কুমোর ইত্যাদি। শুধু তাঁতিদের অবস্থা ছিল কিছু ভাল, কারণ বাঙলার তাঁত বাঙলার বাইরেও কাপড়ের যোগান দিত—কিন্তু তা-ও বাঙলার মনোরম কাপাসের সহায়তায়। কাজেই চাষ ভাল হলে সমগ্র সমাজই কিছু লাভবান্ হত, নইলে সবারই পড়ত মাথায় হাত। শিল্পে রত মানুষ ছাড়া যে আর সবাই চাষী ছিল তা নয়। এদের মধ্যে ছিল অসংখ্য ভূমিহীন প্রজা, যারা চাষী ও কারিগরদের সহযোগী হয়ে বা উচ্চবিত্তদের দাসত্ব করে কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটাত; চাষ খারাপ হলে এরা হয়ে যেত নিতান্ত নিরুপায়।

এই বিরাট্ জনসংঘের সাধারণ পোশাক ছিল তাই লেঙ্গটি বা নেংটি। সেটা অশালীনতা বা অসভ্যতার চিহ্ন নয়, দারিদ্র্যের নিদর্শন মাত্র। এ পোশাক দেখে নানা মন্তব্য করেছেন বহু দেশের পর্যটকই, শতকের পর শতক। কিন্তু এ পোশাকটি শুধু বাঙলারই সম্পত্তি নয়—এর অংশীদার ভারতবর্ষের সনাতন দরিদ্র জনসাধারণ।

চাষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে জমির কথা, অর্থাৎ চাষের জমির উপর চাষীর স্বত্ব ছিল কিনা। ভারতবর্ষের চিরাগত প্রথা অনুসারে এ প্রশ্ন অবান্তর। ভূস্বামীর সঙ্গে চাষীর সম্পর্ক

রাজা-প্রজার সম্পর্ক। জমি রাজার, তাতে প্রজা শস্য উৎপাদন করবে এবং, রাজা যখন যেরূপ বলবেন, তাঁকে সেরূপই শস্যের ভাগ দিতে হবে। অর্থাৎ রাজা ফসলের ভাগিদার মাত্র; চাষে লোকসানের দায়িত্ব তাঁর কিছুমাত্রও নেই। জমিটা ফসল উৎপাদনের একটা উপকরণ। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বাঙলায়ও এই রাজা-প্রজার সম্পর্কটা ছিল একটানা; অর্থাৎ ফসল দিয়ে মিটিয়ে দিতে হত রাজার কর এবং তাঁর নির্দেশ মতই ফসল উৎপাদন করতে হত।

জমির মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে কিছু পরে: এসেছে আরবী শব্দ রায়ত বা tenant যার অর্থ ভূম্যধিবাসী—আর এসেছে ফসলের বদলে একটা মোকররী বা নির্দিষ্ট খাজনার কথা। এতে চাষীর অবস্থা ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, সামাজিক দিক্ থেকে এর মূল্য বিচারের ফলাফল কি, এ সব তথ্য যথাসময়ে আসবে।

আমরা যে কথাটা এখানে স্পষ্ট করে তুলতে চাচ্ছি তা এই যে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বাঙলার মসনদের দখলকারীদের দলে যত পরিবর্তনই ঘটে থাকুক না কেন, তার ছাপ দেশের চাষীদের গায়ে লাগেনি, কেবল রাজার প্রাপ্য ফসলের দাবির তারতম্যের ফলে যা ঘটেছে তা ছাড়া। তারপর তুর্কীরা তো দেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে মাথা একেবারেই ঘামায় নি।

কৃষিনির্ভর দেশে এই যে বিরাট্ ভূমিহীন মানুষের দল, এরা ছিল আর্থনীতিক দিক্ থেকে সর্বাপেক্ষা দুর্বল। রাজার করের তারতম্যের ফলেই হোক বা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা প্লাবনের ফলেই হোক, যদি চাষের কোন হানি হত, তবে দেশে ঘনিয়ে আসত দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া, আঞ্চলিক বা সমস্ত দেশব্যাপী। সে ছায়া ঘোর অন্ধকারের রূপ নিত প্রথমেই এই ভূমিহীন প্রজাদের গ্রাস করে। বলা বাহুল্য, এরা দুর্ভিক্ষের প্রত্যন্তেই বাস করত; অর্থাৎ এদের বাসস্থান থেকে মাত্র এক পা এগোলেই দুর্ভিক্ষের দেশ।

হাবশী রাজত্বে প্রভুহত্যার হিড়িক পড়ে গেল। প্রভুহত্যা করেই হাবশীরা তক্ত পেয়েছিলেন; এঁদের কেউ স্থির হয়ে তক্তে বসতেই পারেন নি। এঁদের ছয় সাত বছরের রাজত্বের শেষ হল মুজাফ্ফর শাহের হত্যার ফলে। এঁকে খতম করে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ গদি দখল করলেন ১৪৯৩ বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং সে দখলদারিতে কায়েম রইলেন পঁচিশ বছর। ইনি মূলত তুর্কী না বাঙালী তা নিয়ে মতদ্বৈধ রয়েছে।

হাবশীদের উপর ছিল এঁর বিষদৃষ্টি, তাই এঁরই কালে তাদের এদেশ থেকে বিদায় নিতে হল। তারপর প্রভুহত্যায় বাঙলার পাইক বা পদাতিক সৈন্যেরা ছিল হাবশীদেরই দোসর; এ সব ষড়্যন্ত্রে এরাই ছিল অদ্বিতীয়। এই ষড়্যন্ত্রের মূলে সার্থক আঘাত করলেন হোসেন শাহ। ফলে, তাঁর গদি হল নিষ্কণ্টক।

হিন্দু সমাজে স্বজন-বর্জনের দ্বারা পরিশুদ্ধ হবার চেষ্টার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এটা উচ্চতর সমাজের কথা; নিম্নস্তরে বহির্বাসের পরিবর্তন ঘটতে লাগল অবাধে। উচ্চতর সমাজ সেদিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন বোধও করেনি আর করলেই বা কি—তার সামর্থ্য কোথায়? যে আত্মরক্ষাই করতে পারে না, অপরকে সে আর কি সাহায্য করবে?

বর্ষায় ব্যাং-এর ছাতার মত সারা বাঙলায় গজিয়ে উঠল শত শত মসজিদ, দরগা ও খানকা। এমন কোনো শহর, বন্দর, গঞ্জ বা নাম-করা গ্রাম বাদ রইল কিনা সন্দেহ যেখানে অন্তত একটি পীরের দরগা দেখা দিল না। মোটামুটি হিসাবে পুবে চাটগাঁ ও শ্রীহট্ট থেকে পশ্চিমে বর্ধমান (মঙ্গলকোট), দক্ষিণে বাগেরহাট ও পাণ্ডুয়া (হুগলি) থেকে উত্তরে দিনাজপুরের কান্তনগর—এই সমস্তটা রাজ্যব্যাপী ধর্মান্তরের হিড়িক পড়ে গেল। এ সব দরগায় মধু বিতরণ করতে লাগলেন স্থানীয় পীর সাহেব, আর কাজী সাহেব স্বয়ং তাঁকে রক্ষা করে মধুকরের মত বিধর্মী সমাজের চারিদিকে হুল

ফুটিয়ে দিতে লাগলেন। সে হুলের বিষে সমাজ হল আরো দুর্বল, আরো অশুচি। এ হুলের প্রধান লক্ষ্য হল হিন্দুনারী, তারপর উচ্চবর্ণের হিন্দুর খাদ্য ও পানীয়। পঞ্চদশে ও ষোড়শে হিন্দুনারীর আর্ত ক্রন্দন বাঙলার সর্বত্র শোনা গেল, আর দেখা গেল রাজধর্মীদের খাদ্য ও পানীয় স্পর্শ করে হিন্দুর জাতিপাতের চেষ্টা। দুর্বলের যা দুর্গতি হয় তা-ই হল ; তারা স্বজনকে রক্ষা করার চেষ্টা না করে, নির্বিচারে বর্জন করে আপন আপন শুচিতা রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা শুরু করল। কথায় বলে, 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে !'

'কুলীন' উপাধিটি অবশ্য বল্লাল সেনের দান নয়, কিন্তু বল্লালের পূবে এর কোনো উল্লেখও আর নেই। এই নবধা-লক্ষণযুক্ত কুলীন ব্রাহ্মণ কার সৃষ্টি তা বলা যায় না, তবে তিনি যে ত্রয়োদশ, চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতকের বাঙালী তাতে সন্দেহ নেই। কারণ প্রখ্যাত কুলাচার্য বন্দ্যঘটীয় দেবীবর মিশ্র বা দেবীবর ঘটক পঞ্চদশ শতকের চতুর্থপাদ থেকে ষোড়শ পর্যন্ত এদের সম্পর্কে নানা বিচার-বিবেচনার পরে যে নূতন সামাজিক নিয়মের প্রবর্তন করলেন তার ফল সমাজে হল সুদূরপ্রসারী। এ-ও হতে পারে, যে নবধা কুল-লক্ষণকে দেবীবর কুলীনের মাপকাঠি বলে ধরে নিয়েছিলেন সেটা তাঁর নিজেরই তৈরি। সুলতান য়ুসুফের কালে দেবীবরের জন্ম হয়েছিল বলে কথিত—তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক।

দেবীবর দেখলেন যে এ মাপকাঠি নিয়ে বিচার করলে সবাইকেই কুলহীন বলে ধরে নিতে হবে—ঠগ বাছতে গ্রাম উজাড়! কাজেই মানটা তাঁকে কিছু নামাতে হল। তিনি নবধা কুললক্ষণকে বাতিল করে যুগোপযোগী নূতন নিয়ম প্রবর্তন করলেন। এই নূতন নিয়ম 'মেলবন্ধন'। এটিকে একটু স্পষ্ট করে নেওয়া যাক।

কুলীনের কুল গিয়েছে সবারই, কিন্তু কতগুলি বিশিষ্ট দোষযুক্ত হয়ে। সে দোষের মধ্যে কোনোটি গুরু, কোনোটি লঘু। দোষের গুরুত্ব-লঘুত্ব বিবেচনা করে, সমশ্রেণীর দোষকে সমপর্যায়ে ফেলে,

তিনি কুলীনদের ছত্রিশটি দলে বিভক্ত করলেন। এক-একটি দলকে এক-একটি 'মেল' বলে বলা হল। একই মেলের মধ্যে যারা পড়ল তারা সমপর্যায়ের কুলীন ; ভবিষ্যতে তাদের কুলকার্য যদি সে মেলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তবে তাদের কুলীনত্ব বজায় থাকবে, এই হল মেলবন্ধনের মূলতত্ত্ব। মেলভঙ্গে তাকে পতিত হতে হবে। এই ছত্রিশটি মেলের বাইশটি প্রকৃতির নামে, ছয়টি গ্রামের নামে, তিনটি উপাধির নামে ও পাঁচটি দোষের নামে। শেষের পাঁচটির নাম –ছায়া, পারিহাল, শুঙ্গ সর্বানন্দী, প্রমোদিনী ও হরিমজুমদারী। 'প্রকৃতি' বলতে ঠিক কি বোঝা যায় তা নিয়ে মতদ্বৈধ হবে। দেবীবর সেকালে কুলাচার্যদের অগ্রণী ও পরম বিদ্বান্ ছিলেন, তাঁর ব্যবস্থা রাঢ়ীয় কুলীন সমাজ নির্বিবাদে মেনে নিল।

প্রত্যক্ষভাবে মুসলমান সংস্পর্শে কলুষিত বলে সেকালে তিনটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল ; রাঢ়ে সেরখানী ও পীরালী, বঙ্গে শ্রীমন্তখানী।

দেবীবর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ নিয়ে মাথা ঘামান নি ; তা করেছেন তাঁরই প্রায় সমসাময়িক পণ্ডিত উদয়নাচার্য।

কুলকার্যব্যাপারে বারেন্দ্র ও রাঢ়ী ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে একাল থেকেই একটা অদৃশ্য, দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে উঠেছে এবং নিঃসন্দেহে এটি বাঙালী ব্রাহ্মণ-সমাজকে আরো দুর্বল করে ফেলেছে। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে এ দু'টি সমাজের মধ্যে যে বিভিন্নতা তা নিতান্তই বাসস্থানগত, অথচ কিছুটা কুলাচার্যদের কারো কারো বিরুদ্ধতার ফলে, কিছুটা নিজেদের মনের একটা নিতান্ত অযৌক্তিক দুর্বলতার ফলে এ বাধাকে অতিক্রম করার সাধ্য তাদের হয় না।

তাই বলে রাঢ়ী বারেন্দ্রের বিবাহ যে আদৌ হয়নি বা হয় না তা নয়। পরবর্তী কালে তো হয়েছেই, এমন কি সেকালেও হয়েছে। নিত্যানন্দ দাস 'প্রেম বিলাসে' লিখেছেন,

"নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গা নাম,
মাধব আচার্য্যে প্রভু কৈলা কন্যাদান।

রাঢ়ীতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিও আন,
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিয়ে হয়েছে অনেক
দেশ ভেদে নামভেদ এই পরতেক।"

নারী যবন-দোষদুষ্ট হলেও, অর্থাৎ নারী যবন-ধর্ষিতা হলেও তাকে ও তার পরিবারবর্গকে, দেবীবরের নূতন নিয়ম প্রবর্তনের পূর্বে, যেমন নির্বিবাদে বর্জন করা হত এর ফলে তা আর করা হত না। নইলে 'দেহাটা' ও 'হরিমজুমদারী' মেলকে সমাজ মেনে নিল কেন?

"দেহাটা হইল মেল যবন দোষ তায়" আর "যবন ও রায়ীতে ভগ্ন হরিমজুমদারী"।

কিন্তু দেবীবর প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করা যাবে না, কারণ, এ মেলবন্ধনের ফল হল সুদূরপ্রসারী। বিবাহের গণ্ডি সংকীর্ণ হলে যে অবশ্যম্ভাবী ফল ঘটে, বিশেষ করে পুত্রের চেয়ে কন্যার সংখ্যা যে সমাজে বেশি, তা ফলল অল্প কিছুদিনের মধ্যেই। মেলবন্ধন হল সম্ভবত পঞ্চদশের শেষপ্রান্তে, বছর পঁচিশ-ত্রিশ পার না হতেই, প্রতিটি মেলের মধ্যে যোগ্য পাত্রের অভাব দেখা দিল। বহু কুলীন-কন্যা রইল অবিবাহিত। দেবীবর বিবাহে অর্থের লেনদেন অত্যন্ত দোষের বলে পাঁতি দিয়েছিলেন: সাধারণত একান্ন টাকা বরের মর্যাদা হিসাবে দেওয়া হত। চাহিদার অনুপাতে মালের সরবরাহ কম বলে, বাজারের স্বাভাবিক নিয়মে পণপ্রথা এসে সমাজে শুধু জুড়েই বসল না, বিবাহের একটা প্রধান অঙ্গ হিসাবে গণ্য হল।

এই আর্থিক সমস্যা ছাড়া, যোগ্য পাত্রের তো বহুবিবাহ হতে লাগলই, মেলরক্ষার জন্য সমাজে আরো অকল্যাণের সৃষ্টি হল। অশীতিপর বৃদ্ধের যূপকাষ্ঠে তরুণী বলি দেবার হল রেওয়াজ। আর, বালকের কাছে তার দিদিমার বয়সী নারীর বিবাহ-বন্ধন হাস্যকর হলেও কায়েম হল। ফলে, বাঙালী পুরুষ হারাল পৌরুষ, বাঙালী

দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতকের বাঙালী সাহিত্যের পঞ্চরত্ন (জয়দেব সহ)।
ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে তৈরি প্রধান প্রধান মসজিদ, দরগা ও খানকা।
গৌহাটি
ব্রহ্মপুত্র নদ
দেবকোট
(দিনাজপুর
গঙ্গা নদী
গৌড়
বিহার
মহাস্থানগড়
(বগুড়া)
ব্রহ্মপুত্র নং
শ্রীহট্ট
কেন্দুলি
জয়দেব
মুর্শিদাবাদ
শাহজাদপুর (পাবনা)
পদ্মা নং
চণ্ডীদাস
নান্নুর
পলাশী
জলঙ্গী
অজয় নং
সিঙ্গি
কাশীরাম
মঙ্গলকোট
চণ্ডীদাস
ছাতনা
বর্ধমান
নবদ্বীপ
ফুলিয়া
কৃত্তিবাস
বাঁকুড়া
দামোদর নদ
ত্রিবেণী
মুকুন্দরাম
দামুন্যা
কলিকাতা
পদ্মা নদী
ঢাকা
সোনারগাঁ
মুন্সীগঞ্জ
পার্বত্য
ত্রিপুরা
চট্টগ্রাম
ওড়িশা
গঙ্গা নদীর মোহনা
বঙ্গোপসাগর
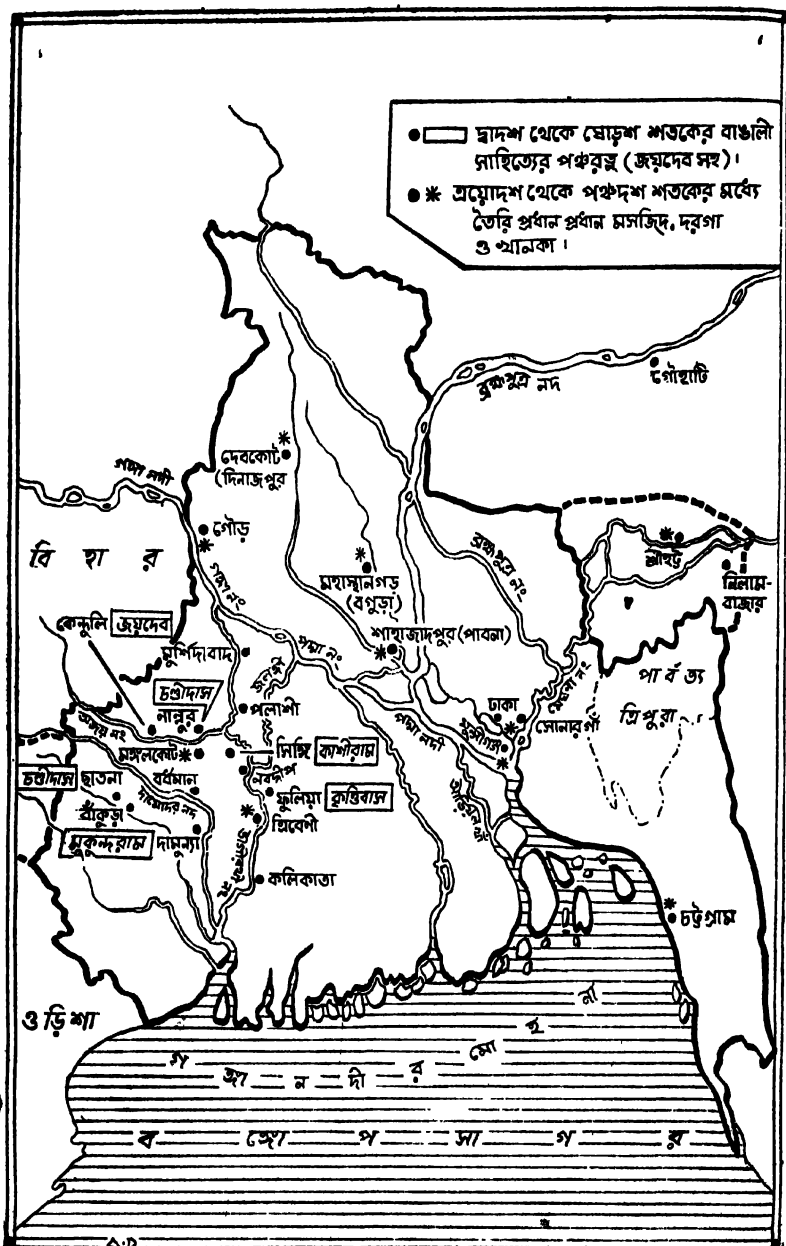
নারী হারাল নারীত্ব। আর এর অবশ্যম্ভাবী রূপ দেখা দিল উচ্চ সমাজের যৌন অনাচারে।

দেবীবরের কাল থেকে বাঙালী সমাজে ঘটকদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে গেল। এমন কি ঘটক ছাড়া একাল থেকে কোনো বিবাহই হতে পারত না। ঘটক প্রসন্ন না থাকলে কুলীনের মেলভঙ্গ অপরাধ ছিল তার অবশ্যম্ভাবী ফল; সে ফল ফলত হয় আশু, নয় অদূরভবিষ্যতে। কুলছিদ্র-অন্বেষণে কুলাচার্যদের জুড়িদার কেউ ছিল না। বারেন্দ্র অপেক্ষা বঙ্গে, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে, ঘটকদের প্রতাপ বেশী দিন অব্যাহত ছিল।

বিংশ শতকের শুরুতেও, পূর্ববঙ্গে একদা বহুপ্রচলিত একটি গানে বহুবিবাহরূপ এ কদাচারের সন্ধান পাওয়া যায়। বহুদিন পরে পেশাদার কুলীন শ্বশুরবাড়ী এলেন। গ্রামের পথে প্রথমেই যাঁর সাথে দেখা হল, তিনি তাঁর স্ত্রী; কিন্তু স্ত্রী হলে কি হবে—তিনি তাঁকে চিনতেই পারলেন না। তাই তাঁকে সম্বোধন করে বললেন,

> "বহুদিন পরে এসেছি চিনি না শ্বশুরবাড়ী
> কোন পথে যাইব মাগো, বিশ্বনাথ বাড়ুরীর বাড়ী ?"

এই চিত্রটির আবার একটি উলটা পিঠ রয়েছে। সে পিঠে আঁকা কন্যাভাব। কুলীনের সম্মান তখন সমাজে অপরিসীম; শ্রোত্রীয় ও বংশজের দল কুলীন পাত্রের কাছে, সে যোগ্য বা অযোগ্য যা-ই হোক না কেন, কন্যাদান করে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য উন্মুখ। কৌলীন্যই প্রধান কথা, পাত্রের চরিত্র, বিদ্যা, বিত্ত বা বয়সের কথা নগণ্য—ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। সমাজের এমন একটা অস্বাভাবিক মনোবৃত্তির ফলে ক্রমে আরো বাড়ল কৌলীন্যের কালিমা আর শ্রোত্রীয় ও বংশজদের দলে নিজের শ্রেণীতে কন্যা পাওয়া হল দায়। পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করে বিক্রমপুর পরগনায়, এ অবস্থাটা একটা কলঙ্কময় কাহিনীর প্রস্তাবনারূপে দেখা দিল।

কুলাচার্যেরা এর সুযোগ নিলেন অভাবিতরূপে। নামহীন,

গোত্রহীন একদল মেয়ে নৌকা ভরে সংগ্রহ করে এনে, যথেষ্ট কন্যাপণ নিয়ে শ্রোত্রীয় ও বংশজদের সঙ্গে বিয়ে দিতে শুরু করলেন ; এদেরই বলা হত 'ভরার মেয়ে'। এদের দলে নানাজাতীয় মেয়ে থাকত, এমন কি মুসলমানের মেয়েও। ভরার মেয়ের মধ্যে পাত্রী খুঁজতে এসে, বা বিবাহান্তে পাড়াপড়শী বলছে,

"তোরা দেখ এসে লো বৌ, দীপেরে চেরাগ কয় !"

বাঙলার কুলজী গ্রন্থগুলি ইতিহাস নয়, ইতিকথার আকর। তবে মাঝে মাঝে তার মধ্যেও ইতিহাসের দিগ্দর্শন পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যের কাল

(ষোড়শ শতক)

[সাত]

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)

নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫২৯)

হুমায়ুন (মোগল পর্বের প্রস্তাবনা) ১৫৩৮ [বিনা বাধায় গৌড় দখল]

শেরশাহ (পাঠান পর্ব)
থেকে
দাউদ কররানী } (১৫৩৯-১৫৭৬)

মানসিংহ (আকবরের প্রতিনিধি) ১৫৯৪

যুগাবতার শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হল ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী। এর পূর্বে কালিকা পুরাণের পাঠ ও রামায়ণ গানের আসর ছিল বাঙালীর সমাজের পক্ষে মুক্তিস্নান, কিন্তু মহাপ্রভুর ধর্ম সে সমাজে নিয়ে এল একটা মহাপ্লাবন। তার খরস্রোতে সারা বাঙলার সামাজিক রূপের মধ্যে একটা বিরাট্ পরিবর্তন এল বটে কিন্তু পরিশেষে তা রেখে গেল একটা অবরুদ্ধ, পঙ্কিল জলাশয়। সে কথায় ক্রমে আসা যাবে।

সেটা আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কাল। বারবক শাহের কাল পর্যন্ত বাঙালী সমাজ পীরের দরগার মধু পান করে, ইসলামী বহির্বাস-খানা নিয়ে নাড়াচাড়া করে আসছিল। বারবকের ছেলে য়ুসুফের আমল থেকে ধর্মান্তরের জন্য শুরু হয়েছিল কাজীর হুমকি, জোর-জবরদস্তি। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমল তার ব্যতিক্রম নয়। রাজদরবারে হিন্দুকে তিনি খুবই উচ্চপদ দিয়েছেন সত্য; সনাতন ছিলেন 'সাকর মল্লিক' বা 'সগীর মালিক' (ছোট রাজা) আর রূপ তাঁর দবীর খাস বা প্রধান সচিব। এঁরা ছাড়া আরও হিন্দু অমাত্য

ও বড় বড় রাজকর্মচারীও ছিল বটে, কিন্তু সে সবই সুষ্ঠু রাজকার্য পরিচালনার জন্য, হিন্দুপ্রীতির জন্য নয়।

ষোড়শ শতকের যবনিকা উত্তোলিত হল ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে। তবে এ দুর্ভিক্ষটি আঞ্চলিক, কারণ আনুমানিক ২৯৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে যে-সব ব্যাপক ও প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ঘটেছে তার ফিরিস্তাতে এর স্থান নেই। দুর্ভিক্ষের কারণ-স্বরূপ অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্লাবন প্রভৃতির কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক ; কিন্তু এক্ষেত্রে কারণ সম্ভবত চাষীর উপরে বিপুল করভার ও যুদ্ধের জন্য রাজ্যে বিশৃঙ্খলা। সুলতান হোসেন শাহকে পশ্চিমে রুখতে হল দিল্লীর সিকন্দর লোদীকে ; এদিকে পূর্বে কোচবিহার ও কামরূপ জয়ের জন্য ব্যস্ত হতে হল। তারপর দক্ষিণে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের সঙ্গে চলল বহুবর্ষব্যাপী অমীমাংসিত লড়াই। ফলে যথারীতি উলুখড়ের হল বিপদ।

কথা উঠবে সুলতানেরা এরূপ দুঃসময়ে দুঃস্থ প্রজাদের জন্য কি করতেন ? বলা বাহুল্য, বিশেষ কিছু নয়। দেশে রাস্তাঘাট বলতে কি আর ছিল, ছোট ছোট নদীনালা-পথে মাল চলাচলের সুবন্দোবস্তও ছিল না। সুলতানেরও সম্বল ছিল রাজধানীতে মজুদ করা যুদ্ধের জন্য রসদ। সুলতান বদান্য হলে আর দেশে যুদ্ধবিগ্রহ না থাকলে, তা থেকে হয়ত কিছু দান খয়রাত চলত, কিন্তু এক্ষেত্রে সে প্রশ্নই ওঠে না।

এ যুগে নবদ্বীপ ছিল ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্রগুলির অন্যতম। নবদ্বীপের প্রখ্যাত অধ্যাপক বন্দ্যঘটীয় বাসুদেব সার্বভৌমের (১৪৫০-১৫২৫) কাছে পড়ার জন্য দেশ-বিদেশের ছাত্র এখানে এসে হাজির হত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনামখ্যাত বাঙালী দিগ্‌গজ পণ্ডিতচতুষ্টয়—নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, স্মার্ত রঘুনন্দন ও তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ, এঁরই ছাত্র বলে কথিত। এঁরা অবশ্য একই সময়ে এঁর ছাত্র ছিলেন না, কেউ আগে,

কেউ পরে। ষোড়শ শতকের বাঙালী সমাজে যে-সব কৃষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হল, তাতে এঁদের ভূমিকা অসাধারণ। পূর্বাঞ্চলের এই প্রখ্যাত মহাবিদ্যালয়ের এত সুনাম হয়েছিল যে কারো কারো মতে সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে দেশ-বিদেশ থেকে এখানে জড় হয়েছিল চার হাজার ছাত্র ও ছ শ' অধ্যাপক।

এঁদেরই পুরোধা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য।

প্রথমে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, পরে অনন্যসাধারণ সাধক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রাণকেন্দ্র। এঁর সাধনার মূলতত্ত্ব—গীতার শ্লোক 'অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতং' এর মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ নরের মধ্যে নারায়ণের পরম উপলব্ধি। তাই মানুষের দেহগত আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ না করে, স্বামী-স্ত্রী, নায়ক-নায়িকা, বন্ধু-বান্ধব সকলের সম্বন্ধকেই নারায়ণের লীলা-বৈচিত্র্য বলে মেনে নিয়ে—এ সকলকে একটা চরম আধ্যাত্মিক আদর্শ বলে উপলব্ধি করাই এর মর্মকথা। 'প্রপত্তি' বা কৃষ্ণপদে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণই এর মূলমন্ত্র। এই নিষ্কাম ভক্তি আত্ম-প্রকাশ করে পাঁচটি রূপে : শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য। মাধুর্যের প্রধান আধার, গোপীগণ ও রাধার কিশোর কৃষ্ণপ্রীতি ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেম-উন্মাদনার মূল সূত্র এটি।

কিন্তু এ সব দার্শনিক তত্ত্বে আমাদের কাজ নেই, আমাদের কথা সমাজের। সেদিক থেকে মহাপ্রভু একান্তই যুগোপযোগী, বাস্তববাদী মহামানব। খোল-করতাল ও সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি জনসাধারণকে শুধু মুসলমান-ভীতি থেকেই রক্ষা করলেন না, জাতিভেদকে দূর করে এবং শূদ্র ও স্ত্রীলোককে তাঁর বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে একটা নূতন সমাজ-সংহতির আদর্শ সৃষ্টি করলেন। গৃহীর কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু তাঁর মতে বৈষ্ণবী-শক্তির ধারক ও বাহকদের নারীর সাহচর্য, এমন কি নারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলাও পুরোপুরি নিষিদ্ধ। যে বৈষ্ণবী-শক্তির উদ্বোধন তিনি করতে চেয়েছিলেন তা

সক্রিয় ও বীর্যবান্, চণ্ডীর ভাষায় তা 'ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা'। এটিকে আরো স্পষ্টতর করা হয়েছে পরবর্তী শ্লোকে :

"শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে !
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি ! নমোঽস্তুতে।"

এই বৈষ্ণবী-শক্তির উদ্বোধনেই তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছিল মুসলমানী অত্যাচারের প্রতিরোধে পালটা শক্তি-প্রয়োগের প্রেরণা। তাই কাজীর অত্যাচার যখন সহিষ্ণুতার শেষ সীমা লঙ্ঘন করল, তখন তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গকে নির্দেশ দিলেন,

"ক্রোধে বলে প্রভু, আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা॥
প্রাণ লঞা কোথা কাজী গেল দিয়া দ্বার
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বলে বারবার॥"

আরো রয়েছে—

"সর্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখোঁ মোরে কোন কর্ম করে কোন জন॥
দেখোঁ আজি কাজির পোড়াও ঘরদ্বার।
কোন কর্ম্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার॥
চল চল ভাই সব নগরিয়াগণ।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন॥"

—চৈতন্য ভাগবত (বৃন্দাবন দাস)

চৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যলীলার আদিগ্রন্থ, তাই মহাপ্রভুর মানস-জগতে বৃন্দাবন দাসের তুলিতেই সর্বাপেক্ষা বেশী স্পষ্ট ও অবিকৃত এ কথাটা মেনে নেওয়া অন্যায় হবে না। পরবর্তী ভাষ্যকারদের তুলিতে তাঁদের ইচ্ছামত তার অদল-বদল হয়েছে। পরবর্তী ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা যে অশ্রদ্ধেয় তার আরো কারণ এর সঙ্গে আমাদের বিষ্ণুর অবতার গীতার শ্রীকৃষ্ণের আদর্শেরও মিল নেই। বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের বাণী সর্বজনবিদিত—"পরিত্রাণায় সাধূনাং

বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" শুধু মাধুর্যের দ্বারা সাধুর পরিত্রাণ সম্ভবপর, কিন্তু দুষ্টের দমনে রজোগুণের বা শক্তির সাধনা অপরিহার্য। এঁদের বিচার তাই খণ্ডিত।

কিন্তু তখনো বাঙালী সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়নি; তাঁর এ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে গ্রহণ করবে কে? উচ্চকোটি সমাজে তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার স্থান হল না; নিম্নকোটি সমাজে খোল-করতাল-সংকীর্তনসর্বস্ব বৈষ্ণব পন্থার ঠাঁই হল।

"যত সব নাড়াবুনে সব হল কেত্তনে
কাস্তে ভেংগে গড়াল কত্তাল।"

শুধু ঠাঁই-ই হল না; সে শ্রেণী আশু বিপদ থেকে রক্ষাও পেল। সে সমাজে তখনো সহজিয়া বৌদ্ধ ও নাথপন্থীরা সংখ্যায় গুরু; কিছু ছিল ধর্মান্তরিত 'নয়া মুসলমান'। এরা, এমনকি কিছু 'নয়া মুসলমান'ও নির্বিবাদে জাতিভেদশূন্য বৈষ্ণব সমাজে ঢুকে পড়ল। স্ত্রীলোকও বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারে গুরু হল।

প্লাবনের শেষে যে-সব পঙ্কিল, পূতিগন্ধময় খানা, ডোবার সৃষ্টি হল সে কথা পরে বলা যাবে। কিন্তু মানসচক্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তা দেখতে পেলেন। তাঁর চারশ' বছর পরে, বিপ্লবের কথা চিন্তা করতে গিয়ে, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, কি হবে? The country is like dead mutton—'দেশটা তো একটা মৃত জড়পিণ্ড মাত্র'। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তা বুঝলেন; বুঝে ব্যথিতও হলেন; তাই তাঁর কর্মক্ষেত্র বাঙলা নিঃশব্দে পরিত্যাগ করে শেষ তেইশটি বছর কাটালেন সাগর-কূলে শ্রীক্ষেত্রে, রাজা প্রতাপ রুদ্রকে অত্যাচার প্রতিরোধের সাহস জুগিয়ে। বাঙলায় আর একটিবারও ফিরলেন না।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব হল ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট।

রঘুনাথ শিরোমণির (১৪৭৫-১৫৫০) মেধা অনন্যসাধারণ। নব্যন্যায়ের যে ভাষ্য তিনি প্রণয়ন করেন তা বাঙলার চিরন্তন গৌরব।

বাঙলা-শের শাহের আমলে (ষোড়শ শতকে)
✻ শেরশাহী নাম
+ পাল ও সেনেদের আমলের নাম
(বিভাগ-সীমা মোটামুটি একই)
০ ৪০ মাইল
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
পূর্ণিয়া
পূর্ণিয়া
আসাম
ব্রহ্মপুত্র নদ
✻ বরিন্দ (বরেন্দ্র)
+ পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি
পাটনা
ভাগলপুর
গৌড়
রাজমহল
গঙ্গা নং
তিস্তা নং
ব্রহ্মপুত্র নং
শ্রীহট্ট
নিলাম-বাজার
✻ বঙ্গ
+ সুবর্ণগ্রামভুক্তি
✻ রাঢ়
+ বর্ধমানভুক্তি
পদ্মা নং
অজয় নদ
দামোদর নদ
বর্ধমান
বাঁকুড়া
সোনারগাঁ
ধলেশ্বরী নং
✻ আরাইস-ই-বাঙলা
চাঁদপুর
+ হরিখেল
মীরসরাই
সীতাকুণ্ড (কীটগড়)
চট্টগ্রাম
চন্দ্রকোণা
হিজলী
মোহনা
গঙ্গানদীর মোহনা
বঙ্গোপসাগর
॥ অর্ধেন্দু দত্ত ॥
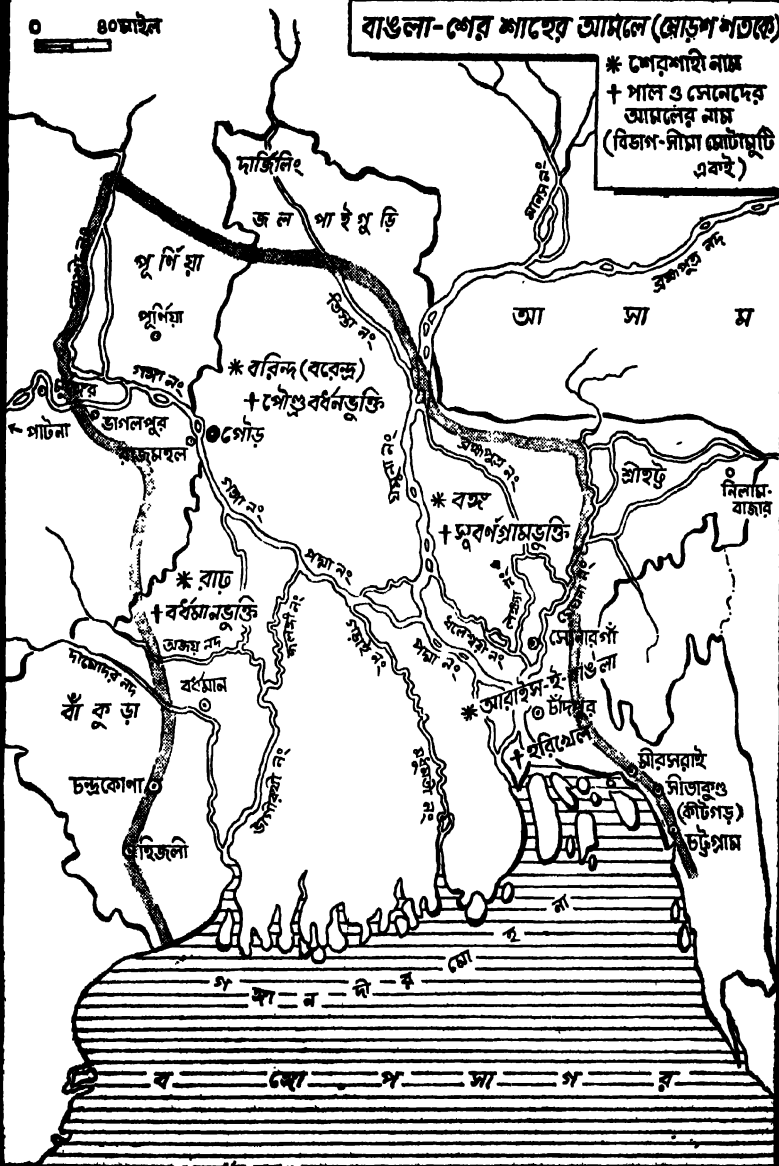
নব্যন্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে অবশ্য ত্রয়োদশ শতকে, স্রষ্টা মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায় ; কিন্তু শিরোমণি ঠাকুর আদিস্রষ্টা গঙ্গেশের মতে সায় না দিয়ে নূতন ছাঁচে তা ঢেলে সাজিয়েছেন। সে ছাঁচ এখন পর্যন্ত সর্বত্র নব্যন্যায় পাঠের দিগ্‌দর্শী। শুধু তা-ই নয়, যে Mathematical logic বা 'আঙ্কিক তর্কশাস্ত্র' নিয়ে দেশে, বিদেশে এত তোলপাড়, নব্যন্যায় তারই পূর্বজ বা পূর্বপুরুষ মাত্র। তর্কশাস্ত্র বা logic-এর আদিস্রষ্টা বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাবারিধি অ্যারিস্টটল। সারা পৃথিবীতেই অ্যারিস্টটলের তর্কশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা ; কিন্তু নব্যন্যায় সে প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ করেছে। নব্যন্যায়ের এ দুটি গৌরবকথা পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত। দরিদ্র শিরোমণি ঠাকুর তাই বাঙলাকে করেছেন অশেষ গৌরবান্বিত।

স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য দ্বাদশ শতকের ভবদেব ভট্ট ও জীমূত-বাহনের সার্থক উত্তরসাধক। স্মৃতির প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হিসাবে এঁরা বাঙালীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এঁর 'দুর্গাপূজাতত্ত্বম্' ও 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্' বাঙলার রক্ষণশীল পৌরাণিক সমাজ নিঃসংকোচে ও নির্বিবাদে গ্রহণ করেছে। তাঁর পূর্বসূরিদ্বয় বাঙালী ব্রাহ্মণের পাতে মাছের ঝোল দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মুসুরির দাল ও সিদ্ধ চাউলের ভাত দিতে দ্বিধা করেছিলেন। রঘুনন্দন সে দালভাতকেও ব্রাহ্মণের পাতে দিয়ে জাতে তুললেন ; ফলে বাঙালী ব্রাহ্মণ ভারতীয় অন্যান্য ব্রাহ্মণগোষ্ঠী থেকে আরো দূরে সরে দাঁড়াল।

রঘুনন্দন নিম্নকোটি হিন্দুদের স্বধর্মপ্রীতির ভিত্তি দৃঢ় করে গিয়েছেন 'মঙ্গলকাব্যে'র লৌকিক দেবদেবীদের পূজা অনুমোদন করে। এঁদের দলে রয়েছেন মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী, বাশুলী প্রভৃতি। এঁরা সবই আদ্যাশক্তি বা সৃষ্টির মূল কারণ বলে আজও পূজিত হন বাঙলার ঘরে ঘরে—সর্বসমাজেই।

রঘুনন্দন তান্ত্রিক মতবাদকে অগ্রাহ্য করেন নি : কালিকাপুরাণে যে শারদীয়া দুর্গোৎসবের উল্লেখ রয়েছে, তারই প্রতিধ্বনি শুনতে

পাওয়া যায় রঘুনন্দনের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে শবরোৎসবের কথাও বাদ যায়নি। সে উৎসবের বর্বরতা ক্ষয় পেয়েছে ক্রমে ক্রমে এবং বাঙলায় প্রথম সাড়ম্বর ও সামাজিক দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে আরো কিছু পরে।

ভূতচতুর্দশীতে অর্থাৎ দীপান্বিতা অমাবস্যার পূর্বদিন বাঙালী চৌদ্দটি শাক খায়, রঘুনন্দনেরই ব্যবস্থামত। এ রীতি আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রসম্মত। যে-যে রোগের প্রতিষেধক হিসাবে এর কদর তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। ওল (অর্শ), কেঁউ (ক্রিমি), বেতো (যকৃতের রোগ), কালকাসুন্দে (কাশি), সরিষা, নিম (চর্মরোগ), জয়ন্তী, শাঞ্চে, গুলঞ্চ (বায়ুনাশক), পলতা (পিত্তরোগ), শুল্‌ফা, হিঞ্চে, ভাঁট ও ঘেঁটু (ক্রিমি), ও সুষণী (স্নায়ুরোগ)।

তান্ত্রিক আগমবাগীশ সার্বভৌম পণ্ডিতের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমাদের কিছু সন্দেহ রয়েছে, কারণ তাঁর কর্মকাল মোটামুটি সপ্তদশ শতক। কাজেই তাঁর কথা বলা যাবে সে কালের ইতিহাসেই।

হোসেন শাহের আমলেও গ্রামে গ্রামে লেখাপড়ার চর্চা কিছু ছিল। সামান্য বাঙলা পড়ার জন্য ছিল 'চৌপাড়ি' ; সেখানে পড়া হত নামতা, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া। এর পরের ধাপ হল পাঠশালা, তারো উপরে ছিল টোল। সেখানে পড়া হত সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, পালি, প্রাকৃত-পৈঙ্গল। মুসলমানের জন্য ছিল মক্তব। হিন্দু ছেলেদের কর্ণভেদ হত পাঁচ বছর বয়সে ; তারপর হত তার 'হাতে খড়ি'। খড়িমাটি ছিল বটে, তবে স্লেটের (slate) তখনো আমদানি হয়নি। তাই আমাদের মনে হয় 'খড়ি' হয়ত 'খড়েরই' ছোটভাই ; পূর্ববঙ্গে 'খড়ি' বলতে এখনো বাঁশের ছোট কঞ্চিকেই বোঝায়। তা দিয়েই লেখা হত ধূলায় বা কলাপাতায়। হরীতকী ও বহেরা দিয়ে বা কাজল দিয়ে তৈরি হত কালি, তা দিয়ে খড়িরই সূক্ষ্ম ডগায় লেখা হত তুলট কাগজে, ভূর্জপত্রে বা তালপাতায়।

মুসলমান ছেলেদের 'বিসমিল্লাখানি' বা মক্তবে ভর্তি করা হত চার বছর, চার মাস, চার দিন বয়সের পর। হিন্দু মুসলমান উভয়েই জ্যোতিষী ডেকে দিনক্ষণ ঠিক করত।

বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায় জ্যোতিষী হিসাবে হিন্দু জ্যোতিষীই পছন্দ করত বলে মনে হয়। একদল মুসলমান জ্যোতিষীও সেকালে ছিল এবং এখনও রয়েছে। এঁরা মিশরীয় মতে ভবিষ্যৎ বিচার করেন। মিশরীয় মতে—দেহ চতুর্ভূত-সঞ্জাত : সকল গ্রহ-নক্ষত্রও তা-ই। ভূতচতুষ্টয় যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ্ (জল), তেজ (আগুন) ও মরুত (বায়ু)। এঁরা পুনর্জন্ম মানেন না কিন্তু কর্মফল মানেন। সাধারণত শুধু পঞ্জাবী মুসলমানেরা এঁদের মান্য করে চলে।

হিন্দুর উপনয়নের মত মুসলমানের হত 'সুন্নত' ; তার উদ্‌যাপন হত বহু আমোদ-প্রমোদের মধ্যে, ছেলেদের সাত বছর বয়সে।

এ সব কাল থেকেই যেন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে হৃদ্যতার অন্তরালটা ক্রমশ গড়ে উঠেছে। অত্যাচার ও গরু কোরবানির অবাধ প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তা বেড়েছে : কোরবানির ফলে দাঙ্গারও উল্লেখ রয়েছে।

একালেই হিন্দু নারীর উপর বলাৎকারের নেশা যেন মুসলমানকে গ্রাস করেছিল। এই নেশারূপ হীনতম পাপের সপক্ষে তাদের একটা যুক্তি ছিল : সেটা ধর্মান্তরণের পুণ্য। তার জন্য সুন্দরী নারী খুঁজে বেড়াত তাদের 'সিন্ধুকী' বা গুপ্তচর। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ' দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন, "ষোড়শ শতকে ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানগণ এবং শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানেরা এইরূপে যে কত হিন্দু রমণীকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। পল্লীগীতিকাগুলিতে সেই সকল করুণ কাহিনী বিবৃত আছে।"

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পরে তাঁর তক্ত দখল করে রইলেন তাঁর ছেলে নসরত শাহ দশ বছর। তারপরে সুলতান হলেন তাঁর ছেলে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ। কিন্তু সে অল্পকালের জন্য ;

পরের দৃশ্যে তাঁকে হত্যা করে তাঁর গদিতে বসলেন তাঁর কাকা, মুহম্মদ শাহ।

এদিকে সারা উত্তরাখণ্ডে তখন পাঠান বা আফগান ও মোগলদের মধ্যে ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্ব লেগে গেছে। আফগানদের সাহায্য করতে গিয়ে, হটে এসে, নসরত শাহ বাবরের কাছে মৈত্রী কবুল করে এসেছিলেন। পাঠান শের খান বা শের শাহ ছিলেন বিহারের একজন বড় জায়গিরদার। তাঁর শ্যেনদৃষ্টি তো এমনিই গৌড়ের ওপরে ছিল ; এবার একটা ছুতাও মিলে গেল। সুযোগ বুঝে, দিনকতক পরে, মুহম্মদ শাহের আমলে, সহসা হানা দিয়ে তিনি গৌড় থেকে ষাট মন সোনা সংগ্রহ করলেন ; মুহম্মদ শাহকে আরো নজরানা দিতে হল তের লক্ষ মোহর।

এদিকে বাবর তখন লোকান্তরিত, ছেলে হুমায়ুন হয়েছেন দিল্লীর বাদশাহ। হুমায়ুন গোড়া থেকেই যুদ্ধবিগ্রহে বিব্রত, তাই বাঙলায় পুনঃ দখলীস্বত্ব স্থাপনের চেষ্টা করতে তাঁর আসতে হল দেরি। কিন্তু যখন তিনি এলেন তখন গৌড়ে শের শাহের তরফ থেকে বাধা দেবার কেউ ছিল না, কারণ শের শাহ তখন উত্তরাখণ্ডের অন্যত্র আটক পড়ে গেছেন।

হুমায়ুন গৌড়ে কাটালেন নয় মাস কেবল আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে। হুমায়ুনকে অকেজো ও নিতান্ত প্রমোদপরায়ণ করে তুলতে শের শাহেরও চেষ্টা কম ছিল না। প্রবাদ, একবার তাঁর অনুচরেরা তাঁকে খুশী করার জন্য একজন অনন্যসুন্দরী নারী সংগ্রহ করেছিল। শুনে শের শাহ খুশী হওয়া তো দূরের কথা, বিরক্তই হলেন। বললেন, এটিকে যা করেই হোক হুমায়ুনের কাছে পাঠানো চাই। হলও তা-ই ; ফলে সব কাজ ছেড়ে দিয়ে হুমায়ুন একে নিয়েই মত্ত হয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত হুমায়ুনকে দেশই ছাড়তে হল ; শের শাহ বাঙলা ও বিহারের সুলতান হয়ে তক্তে বসলেন, পরে সমগ্র উত্তরাখণ্ড এল তাঁর কবলে।

বাঙলায় পাঠান পর্ব শুরু হল ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে।

শের শাহ ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ শাসনদক্ষ সুলতান। তাঁর পূর্বে কোনো সুলতান বাঙলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নি; অভ্যন্তরিক ও সমগ্র শাসনতন্ত্রের দায়িত্বও নেন নি, বিধিও প্রণয়ন করেন নি। তাঁরা যথারীতি সামন্তদের কাছ থেকে তাঁদের প্রাপ্য কর পেলেই খুশী থাকতেন। শের শাহের কালেই প্রথম এই গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম হল।

সেন রাজাদের আমলে, দ্বাদশ শতকে, বাঙলায় জরিপ হয়েছিল বটে, কিন্তু তা নিখুঁত হয়নি। শের শাহ সে জরিপ যতদূর সম্ভব নিখুঁত করে, সারা বাঙলাকে উনিশটি 'সরকারে' বিভক্ত করলেন। কতগুলি গ্রাম মিলে হল এক-একটি 'মৌজা', কয়েকটি মৌজা নিয়ে হল একটি 'ডিহি'—এ কথাটি ফার্সীর 'ডেহ্' বা গ্রামের বাঙলা অপভ্রংশ। কতগুলি 'ডিহি' নিয়ে হল এক-একটি 'পরগণা' এবং কয়েকটি পরগণার সমষ্টি হল একটি 'সরকার'। সবগুলি সরকারের আয়তনই যে সমান তা নয়। সরকারগুলির নাম হল সে অঞ্চলের বড় বড় গঞ্জের বা শহরের নাম থেকে।

প্রতিটি সরকারে ছিল একজন 'শিকদার' বা সরকার-শাসক, একজন মুনসেফ বা দেওয়ানী আদালতের বিচারক এবং সর্বোপরি একজন কাজী। ইসলামী রীতি অনুসারে কাজীই ছিলেন সর্বেসর্বা। এই উনিশটি সরকারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাকেও বলা হত 'আমিন-ই-বাঙলা'; তিনি সর্বপ্রধান কাজী। অর্থাৎ পূর্বতন জঙ্গী শাসনের পরিবর্তে শুরু হল ইসলামী ন্যায়-সংহিতার শাসন।

সুষ্ঠু শাসনের জন্য হল থানার সৃষ্টি—সেখানে সৈন্য মোতায়েন হল। সেখানে শিকড় গেড়ে বসে তারা যাতে সুলতানের কোনো অনিষ্ট না করতে পারে তার জন্য তাদের বছর বছর বদলি করা হত।

জরিপের ফলে চাষীর রাজকর বেড়ে হল ফসলের এক-তৃতীয়াংশ;

শেরশাহের কালে (ষোড়শ শতকে) বাংলা দেশে
সোনারগাঁ-গৌড়-দিল্লি-অটক (পাঞ্জাব) রাজপথের
আনুমানিক অবস্থান
অন্যান্য রাজপথ
নদীপথ
0 ৪0মা
পূর্নিয়া
তেলিয়াগড়ি
রাজমহল
গৌড়
ঘোড়াঘাট
শেরপুর-মুর্চা
(বগুড়া)
চলন বিল
শেরপুর-আতিয়া
(ময়মনসিংহ)
(পাবনা)
ঢাকা
সোনারগাঁ
চা-সরাই (চাসারা)
চাঁদপুর
মীর সরাই
সীতাকুণ্ড
চট্টগ্রাম
কুতুবদিয়া
কক্সবাজার
বাখরগঞ্জ
জয়ন্তিয়াপুর
শ্রীহট্ট
ব্রহ্মপুত্র নদ
অজয় নং
দামোদর নদ
ব — ঙ্গো — প — সা — গ — র
N.Dutta
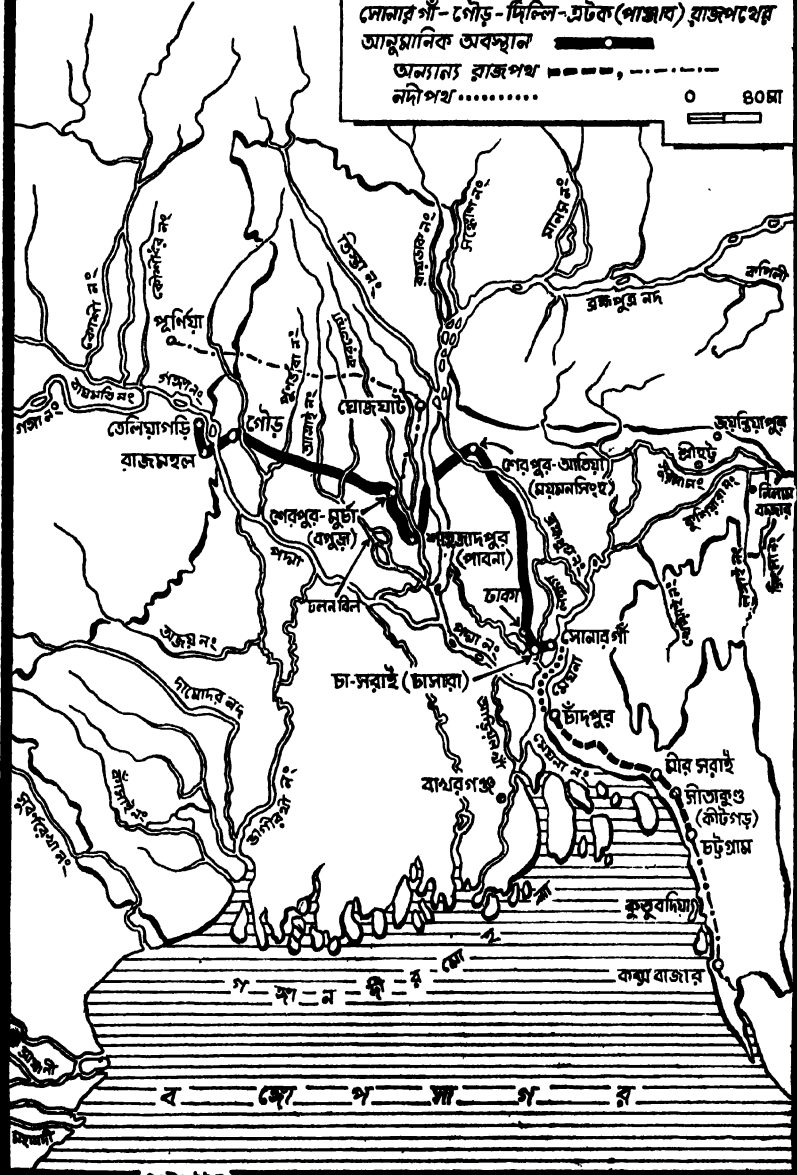
কর দিতে পারা যেত হয় ফসলে, নয় টাকাকড়ি দিয়ে। দ্বিতীয় পথটির প্রবর্তন হল এই প্রথম।

সামন্ত প্রথা রইল অব্যাহত, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা শের শাহ বাড়িয়ে দিলেন কিছু পাঠান ও কিছু রাজপুত সামন্ত যোগ করে। উদ্দেশ্য, যাতে সব হিন্দু সামন্তেরা সুলতানের বিরুদ্ধে একজোটে ষড়্-যন্ত্র না করতে পারে।

পাঠানেরা ছড়িয়ে পড়ল বাঙলার গ্রামে গ্রামে, বিশেষ করে অধুনাতন রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে। আর, পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম, হিজলী ও মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায়। রাজপুতেরা এসে বসল বীরভূমে ও চন্দ্রকোণায়; বীরভূমের বীরহাসির ও চন্দ্রকোনার চন্দ্রভান এদেরই বংশধর।

বাঙলা, বিশেষ করে পূর্ববাঙলা, নদীমাতৃক দেশ, তাই এ দেশের রাজপথই জলপথ। কাজেই সে জলপথকে সমৃদ্ধ ও নিরাপদ করার ভার দিলেন শের শাহ সামন্তদের ওপর—তাদের দিলেন এ জন্য জায়গির। পর্তুগীজ ও মগ দস্যুরা জলপথে এসে তখন নিম্ন বাঙলায় অনবরত হানা দিত। সুলতানের নৌবাহিনী জোরদার হবার ফলে তাদের ব্যাপক লুটতরাজ ও দস্যুতা বন্ধ হল।

এ ছাড়া স্থলপথে বাঙলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার জন্য শের শাহ গড়ে তুললেন একটা বিরাট, প্রশস্ত রাজপথ। এর পূর্বেই তিনি তৈরি করেছিলেন তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তিস্তম্ভ—অ্যাটক থেকে দিল্লী পর্যন্ত বেশ চওড়া একটি রাস্তা: এবার বাঙলার রাজপথকে টেনে এনে তার সাথে জুড়ে দিলেন। ফলে বাঙলার প্রসিদ্ধ বন্দর সোনারগাঁ থেকে অ্যাটক পর্যন্ত সমস্ত উত্তরাখণ্ডে সাক্ষাৎ যোগাযোগের সৃষ্টি হল। এটিকেই পরবর্তী কালে বলা হত 'Grand Trunk Road—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড।'

শের শাহের ছিল নামের মোহ—সারা বাঙলায় তার ছাপ

রয়েছে। শের শাহের প্রসিদ্ধ রাজপথ যে দিক্ দিয়ে গিয়েছে তার দিগ্‌দর্শনে সাহায্য করেছে এই শেরশাহী ছাপ। যেমন, শেরপুর-আতিয়া (ময়মনসিংহ), শেরপুর-মুর্চা (বগুড়া), ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, সেকালে পূর্ববঙ্গের পরবর্তী রাজধানী ঢাকার পত্তন হয়নি, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা তো দূরের কথা।

শেরশাহী আমলেই প্রথম 'কবুলিয়ত' বা 'কবুলতি' অর্থাৎ দাবি-স্বীকারপত্র ও 'পাট্টা' অর্থাৎ জমি ভোগ করার অধিকার-পত্রের প্রচলন হল। ফলে চাষীর স্বত্ব কিছুটা সুনির্দিষ্ট হয়ে কর আদায়-কারীদের অত্যাচারে পড়ল কিছু বাধা। শেরশাহী আমলে যে রুপার টাকার প্রচলন হল তার মূল্য আধুনিক টাকার সমান।

দুর্গাচন্দ্র সান্যালের 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে' দুধের চেয়ে জলের পরিমাণ অনেক বেশি ; অর্থাৎ গালগল্পের আধিক্যে ইতিহাস ধামাচাপা পড়েছে। শেরশাহী ডাকঘর সেকালের বিস্ময় ; তার যে চিত্রটি এতে রয়েছে তা এখানে তুলে দিচ্ছি।

"ডাকঘর শহরে শহরে ও থানায় থানায় ছিল। অশ্বারোহী বাহকগণ ডাক নিয়া যাইত। সবই ছিল বেয়ারিং ; চিঠির ওজন অনুসারে মাশুল কমবেশি হইত না। থানা প্রতি আধআনা মাশুল —দূরত্ব অনুযায়ী। প্রতি থানায় ডাকমুনসী ও বরকন্দাজ থাকিত। রাজা, জমিদারেরা ডাকখরচা বাবদ ট্যাক্স দিত—তাহাদের আর মাশুল লাগিত না, তাহাদের চিঠি বিলিও হইত। বাংলা হইলে দিল্লী চিঠি পাঠাইতে কম বেশি একটাকা চারি আনার মত লাগিত। তাতে রাস্তা মেরামত, ডাকঘরের খরচা নির্বাহ হইত। চিঠি বিলি হইত না, মাশুল দিয়া লোকে চিঠি নিয়া যাইত। এক বৎসর না নিলে চিঠি দগ্ধ করা হইত।"

শের শাহের কথা একটু বিশদ করে বলা হল এজন্য যে পরবর্তী মোগল ও ইংরেজ আমলের বনিয়াদ গড়ে ওঠেছিল শেরশাহী শাসন-তন্ত্রের ভিত্তিতে।

বক্তিয়ার খিলজী যখন বাঙলা থেকে আসাম জয়ের অভিযান করেন তখন লখনৌতি ও তিব্বতের মধ্যে বাস করত কোচ, মিচ ও টিহারু জাতি—যাদের ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট বলেছেন, কোচ, মিকে ও নেহারু ; এরা মূলত মঙ্গোলিয়ান। রামায়ণ, মহাভারতেও এদের 'কিরাত' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এদেরই এক সামন্ত, বিশ্বনাথ কোচ, কুচবিহারকে কেন্দ্র করে কোচরাজত্ব স্থাপন করেন ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে।

বিশ্বনাথের ছোট ছেলে চিলা রায় ছিলেন তাঁর বড় ভাইএর সেনাপতি। তাঁরই প্রতাপে সমগ্র আসাম হল তাঁর পদানত ; শুধু তা-ই নয়, কোচবিহার রাজ্যের পরিধি বেড়ে গেল মণিপুর, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের সীমান্ত পর্যন্ত। বাঙলার প্রত্যন্তে এই স্বাধীন রাজ্যকে দখল করতে সুলতানদের কম বেগ পেতে হয়নি। চিলা রায়ের একটি কীর্তি এখনো রয়েছে—সেটি কামাখ্যার মন্দির। ইসলামী তাণ্ডবে পুরনো মন্দিরটি ধ্বংস হয়েছিল ; চিলা রায় তা নূতন করে তৈরি করেছিলেন ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

আরবী পর্যটক ইব্রাহিম-বিন-হারিরির (১৫২৮) লেখায় বাঙলার সৈন্যদের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারের কথার উল্লেখ রয়েছে। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে ষোড়শ শতকের প্রথম পাদ শেষ হবার পূর্বেই কামান, বন্দুকের প্রচলন ঘটেছিল। বাঙলাই সে-সব আগ্নেয়াস্ত্রের সূতিকাগার কিনা তা বলা যায় না তবে বাঙলায়ই যে বারুদ আবিষ্কৃত হয়েছিল এ দাবিটা ভিত্তিহীন না-ও হতে পারে, কারণ বারুদ তৈরির প্রধান সরঞ্জাম, সল্টপিটার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত বাঙলারই প্রত্যন্ত অঞ্চলে। পরে প্রধানত এখান থেকেই বিদেশী বণিকেরা তা সংগ্রহ করে পাশ্চাত্যে চালান দিত টনে টনে।

বাঙলায় পোর্তুগীজের প্রথম ঘাটির পত্তন হল ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, চট্টগ্রামে। তখন তাদের মূল ঘাটি গোয়ায়। সেখান থেকে ১৫১৭

খ্রীষ্টাব্দে চারখানি জাহাজ বাঙলায় বাণিজ্য করতে পাঠানো হয়েছিল বটে, কিন্তু পথে আগুন লেগে তা অকেজো হয়ে যায়। পোর্তুগীজের পেশা ছিল ব্যবসা, কিন্তু নেশা ছিল দস্যুতা। পেশার চেয়ে নেশার তাকত বেশি। তাদেরই কিছু কিছু লোক মগদের সঙ্গে জুটে সে নেশায় মত্ত হয়। মগেরা আরাকানের জাতিবিশেষ।

পোর্তুগীজেরাই ক্রমে ক্রমে এদেশে আমদানি করে গোলআলু, জারুল, সফেদা, চীনাবাদাম, কমলালেবু, কেশুবাদাম, পেঁপে, আনারস, কামরাঙা, পেয়ারা, আতা, নোনা, লঙ্কা, মরিচ ও রাঙ্গা-আলু। অনেকের মতে, নীলও তারা এনেছিল তবে এ সম্পর্কে মতদ্বৈধ রয়েছে।

এর মধ্যে গোলআলু এসেই বাঙলার ঘরে ঘরে আসন জুড়ে বসল হয়ত সপ্তদশ শতকের শুরুতে; রাঙ্গাআলুও পেছনে পেছনে উঁকি মারল। প্রথম প্রথম বাঙালীরা এদের বিজাতীয় বলে সন্দেহ ও ঘৃণা করত। ব্রাহ্মণেরা স্পর্শও করতেন না। ক্রমে এদের স্পর্শদোষ ক্ষয়ে যেতে লাগল।

ষোড়শ শতক থেকেই বাঙলায় যাত্রা অভিনয় শুরু হয়েছে বলে মনে হয়। চৈতন্য ভাগবতে রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। তরজা ও কবির লড়াই সমগোত্রীয়; হয়ত যাত্রা অভিনয়ের চেয়ে একটু প্রাচীন। শৃঙ্গার রসে জবজবে হলে কবির লড়াই হয়ে দাঁড়ায় খেউড়।

শের শাহ একটা ঘূর্ণিঝড়ের মত অতি অল্প সময়ের মধ্যে সারা বাঙলা দেশটা তোলপাড় করে তাকে বে-আবরু করে দিয়ে গেলেন। সামাজিক দিক্ থেকে সব চেয়ে বেশি পরিবর্তন ঘটল পাঠানদের গ্রামে গ্রামে অনুপ্রবেশে। তারা কিন্তু পূর্ববর্তী তুর্কী ও পরবর্তী মোগলদের মত সামাজিকভাবে বাঙালী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চায়নি। ওরা স্থায়িভাবে বাঙলায় বসবাস করতেই এসেছিল, করেছেও তা-ই। শতকে শতকে তাই তাদের যেমন ঘটেছে দৈহিক

রূপের পরিবর্তন, তেমনি ঘটেছে মানসিক রূপের। শেষ পর্যন্ত তারা বাঙালীই বনে গেছে। সামাজিক দিক্ থেকে এ নিয়ে গবেষণা বিশেষ কিছু হয়নি।

শের শাহের মৃত্যুর পরে তার বংশধারা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে বছর কয়েকের মধ্যেই শুষ্ক, বিলুপ্ত হয়ে গেল। তক্তে বসলেন একজন পাঠান প্রাদেশিক শাসনকর্তা। পর পর তক্ত-দখলকারীদের হত্যার ফলে তার বংশও হল ক্ষণিকের অতিথি। তারপর হত্যাকারীর রূপ ধরেই এল কররাণী বংশ : এরাও পাঠান। এদের মধ্যে একমাত্র সুলেমান কররাণী (১৫৬৪-১৫৭২) ছিলেন দক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ। তবু এর কালেও যে হিন্দু নির্যাতন কম ছিল তা নয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সমসাময়িক সুলতান হোসেন শাহের কাল থেকেই চলেছিল উড়িষ্যা বিজয়ের তোড়জোড়, তার পরিসমাপ্তি ঘটল সুলেমান কররাণীর আমলে। এঁরই সেনাপতি 'কালাপাহাড়' সারা উড়িষ্যা জয় ও পুরীর মন্দির লুটপাট করে দেবদেবীর মূর্তি টুকরা টুকরা করে ভেঙ্গে ফেলেন। ইনিই ইতিহাসের প্রখ্যাত অদ্বিতীয় কালাপাহাড় : এঁর দেহে হিন্দুরক্ত ছিল বলে যে ব্যাপক প্রবাদ তা ভিত্তিহীন।

কালিকা পুরাণের বহুল প্রচারের ফলে ও তান্ত্রিকবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর সমাজে আমিষ ভোজনের প্রচলন বেড়ে চলেছিল, কিন্তু বৃন্দাবনের গোঁসাইদের মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম ব্যাখ্যার প্রভাবে তার গতি শুধু স্তব্ধই হল না, নিরামিষ ও মিষ্টি খাবারের প্রতি বাঙালীর দৃষ্টি পড়ল বেশি। এর আগে কোনো কোনো শ্রেণীর যতি ও ব্রাহ্মণ বিধবারা পুরোপুরি নিরামিষ খেত বটে, তবে সাধারণ সমাজে আমিষ ও নিরামিষ দুয়েরই প্রচলন ছিল। মহাপ্রভুর কাল থেকে আমিষ, নিরামিষ ঠাঁই ঠাঁই হয়ে গেল; এমন কি দুয়ের পংক্তি-ভোজনেও আপত্তি হল। সারা বৈষ্ণব সমাজ গেল নিরামিষের পক্ষে। নিরামিষ মুখরোচক করার জন্য বাড়ল মিষ্টির কদর।

সেকালের নিরামিষ ও আমিষ ভোজ্যের একটা তালিকা দেওয়া যাক।

নিরামিষ—নিমপাতা ও বেগুন ভাজা, মুগের ডাল, ব্যঞ্জন, ক্ষীরপুলি, নারিকেল পুলি, দুধ-চিঁড়া, পায়েস, চাঁপাকলা, ঘন দুধ, দই ও সন্দেশ। চিঁড়ার পরিবর্তে মুড়ি, খৈ, মুড়কির সন্ধান পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় নানাধরনের নাড়ুর।

আমিষ—পাবদা মাছের শুক্তা, মাছ ভাজা (চিতলের কোল, ইলিশ, পুটি, চিংড়ি, কৈ) কচি আম দিয়ে কাতলার ঝোল, তেঁতুল দিয়ে বোয়াল মাছ, পাঁঠা, হরিণ, ভেড়া, কবুতর বা কাছিমের মাংস। সঙ্গে থাকত কিছু ব্যঞ্জন ও অম্বল।

এদিকে দিল্লীর বাদশাহেরও তালিকায় তখন অদল-বদল হয়ে গেছে। হুমায়ুন লোকান্তরিত হয়েছেন, নাবালক পুত্র আকবর তাঁর অছি বৈরম খাঁর সহায়তায় রাজ্যরক্ষায় বিব্রত। সুলেমান কররাণী বিহারের শোণনদ পর্যন্ত অঞ্চল গ্রাস করে বসেছিলেন। কররাণী বংশের শেষ পুরুষ দাউদ তখন বিহার ও বাঙলার তক্তে। আকবর পাটনা থেকে প্রথম দাউদকে দিলেন হটিয়ে। দাউদ এসে আশ্রয় নিলেন তাঁর বাঙলার রাজধানী টাণ্ডায়, গৌড়েরই সন্নিকটে। তাঁর পেছনে ধাওয়া ক'রে আকবরের সেনাপতি মুনিমখাঁ বাঙলা আক্রমণ করলেন। দাউদের যুদ্ধ করার শক্তি ছিল না; গেলেন পালিয়ে উড়িষ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে শেষ হল বাঙলায় পাঠান রাজত্বের সাঁইত্রিশ বছর। পেছনে রেখে গেল অবিস্মরণীয় শেরশাহী কীর্তি আর 'কালাপাহাড়ে'র অপকীর্তি।

১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ে একটা নিদারুণ মড়কের কথার উল্লেখ রয়েছে। অনেকের মতে এর কারণ প্লেগ, কারো মতে আঞ্চলিক দুর্ভিক্ষ। এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু বলা যায় না। গৌড় যে বাঙলার তখন সবচেয়ে জনবহুল শহর ছিল তাতে সন্দেহ নেই। পঞ্চদশের পোর্তুগীজ পর্যটক বারোজের মতে এ শহরের অধিবাসী ছিল দু'লাখ।

গৌড় থেকে তার নিকটবর্তী টাণ্ডায় একালে রাজধানী পরিবর্তন কি প্লেগের প্রকোপেই হয়েছিল ? ষোড়শ শতকের শেষপাদের পর্যটক কিচ্ বলেছেন যে টাণ্ডাতেও তিনি অসংখ্য নেংটিপরা বাঙালী দেখেছেন। কিচ্ সম্ভবত ভারতবর্ষে প্রথম ইংরেজ পর্যটক।

দাউদকে উড়িষ্যা ছেড়ে দেওয়া হল বটে, কিন্তু মুনিমখাঁ পেছন ফিরতে না ফিরতে দাউদ মোগলের বশ্যতা অস্বীকার করলেন। শেষ পরাজয় ঘটল তাঁর রাজমহলে এবং প্রাণদণ্ডও হল।

এত সব যুদ্ধবিগ্রহের ফলে সারা বাঙলায়ই যে শান্তি ছিল না তা সহজেই বোঝা যায়। দাউদের মৃত্যুর পরে সে অশান্তি ক্রমশ ওঠল বেড়ে এবং ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রায় কুড়ি বছর বাঙলায় আবার চলল মাৎস্যন্যায় অর্থাৎ 'জোর যার মুলুক তার' নীতি।

আকবরের প্রতিনিধি মানসিংহ বাঙলার শাসনকর্তা হয়ে টাণ্ডায় এলেন ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু তখন সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা আর মোগল ও পাঠান অস্ত্রধারীরা দলে দলে লুটতরাজে মত্ত।

মুনিমখাঁর মৃত্যুর পরে (১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) ও মানসিংহের আসার পূর্বে উত্তরবঙ্গের প্রতাপশালী ভূস্বামী কংসনারয়ণ বাঙলা ও বিহারের মোগল দেওয়ানরূপে কাজ করেছিলেন বলে প্রবাদ। ইনিই প্রথম বাঙলায় বহুব্যয়ে মহিষমর্দিনীর পূজা করেছিলেন বলে অনেকের বিশ্বাস। পূজার পদ্ধতি প্রণয়ন করেছিলেন সে কালেরই পরম পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী, কালিকা পুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণের দুর্গাপূজা-পদ্ধতি ঘেঁটে। বৃহন্নন্দিকেশর পুরাণ পাওয়া যায়নি বটে, তবে সে পুরাণে উল্লিখিত পূজাপদ্ধতির সন্ধান মিলেছে। এ প্রবাদ কতদূর সত্য তা বলা দুষ্কর। তবে অষ্টাদশ শতকের পূর্বে যে এ পূজা বাঙলায় ব্যাপক হয়নি তাতে সন্দেহ নেই।

মহিষমর্দিনীর পূজা ছাড়াও দুর্গা বা দুর্গতিনাশিনীর পূজার প্রচলন হয়েছিল নানারূপে। এর মধ্যে নবদুর্গা, শূলিনী, বনদুর্গা ও জয়দুর্গা প্রসিদ্ধ। এঁদের রূপের তারতম্য রয়েছে।

শরৎকালে কোনো না কোনো রূপে ভারতবর্ষের সর্বত্রই শক্তিপূজা হয়ে থাকে। পূর্বাঞ্চলে মহিষমর্দিনী, উত্তরাপথের অন্যত্র নবরাত্রি, দশহরা ও রামলীলা, দক্ষিণাপথে নবরাত্রি ও দশহরা।

বহু অঞ্চলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের জন্য বেণেরা পহেলা বৈশাখে যে 'গন্ধেশ্বরী' পূজা করে তাঁর সঙ্গে মহিষমর্দিনীর মূর্তির সাদৃশ্য রয়েছে। গন্ধেশ্বরী মূর্তির রং অতসী ফুলের মত হলদে।

বাঙলার এই মাৎস্যন্যায়ের কালে, প্রধানত পূর্ববঙ্গে, পাঠান সর্দারেরা প্রবল হয়ে উঠল। নিম্নবঙ্গে জোরদার হল হিন্দু ভূস্বামীরা। এ কালকেই বলা হয় বাঙলার 'বারো ভুঞা'র আমল। এই 'বারো ভুঞা' বা বারোটি ভূস্বামী কিন্তু সংখ্যায় ঠিক বারোটি নয়—কথাটা বাঙলার প্রবাদ 'বারো ভূতে'র মত ; বেওয়ারিস সম্পত্তি যেমন বারো ভূতে খায়, বেওয়ারিস রাজ্যও তেমনি বারো জনের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয়।

এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভূস্বামী হলেন পাঠান সর্দার ঈশা খাঁ। অধুনাতন ময়মনসিংহ জেলার সবটা, ঢাকা, ত্রিপুরা, রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলার অনেকটা নিয়ে ছিল তাঁর জমিদারী। বিখ্যাত বন্দর সোনারগাঁ ছিল এর কেন্দ্র। ইনি অবশ্য লোকান্তরিত হলেন ষোড়শ শতকের সঙ্গে সঙ্গেই, কিন্তু তাঁর ছেলে মুসা তাঁরই যোগ্য উত্তরাধিকারী হলেন।

প্রতাপাদিত্য সুন্দরবনের ধূমঘাটে এসে জুড়ে বসলেন। অধুনাতন যশোহর ও খুলনা জেলার সবটা আর বাখরগঞ্জের বেশ খানিকটা মিলে ছিল তাঁর জমিদারি।

এ দু'জন ছাড়া এঁদের তালিকায় যাঁরা উল্লেখযোগ্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে বাখরগঞ্জ বা বাকলার, নোয়াখালির ভুলুয়ার, ময়মনসিংহের পাহাড়-ঘেঁষা সুসুঙ্গের ভূস্বামিগণ। এঁরা সবাই ছিলেন স্ব স্ব প্রধান ; যাঁর যাঁর জমিদারির পরিধি রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য তৎপর। এঁদের মধ্যে যে কোনো আদর্শগত ঐক্য ছিল তা নয় ; সমগ্র বাঙলার

পটভূমিকাও এঁদের মানসচক্ষে ছিল না—স্বদেশভক্তি বলতে যা বোঝা যায় তাতো নয়ই। এঁদের কারোর সম্বন্ধে স্বদেশপ্রীতি বা বীরত্বের প্রশংসাপত্র দান নিছক কবিকল্পনা মাত্র।

য়ুসুফের কাল থেকে হিন্দু-মুসলমানের যে প্রভেদটা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, এঁদের আশ্রয়ে তা বৃদ্ধি পেল। মুসলমান এলাকায় হিন্দু নিপীড়ন ছিল অব্যাহত; পাঠানদের গ্রামে গ্রামে অনুপ্রবেশের ফলে তা বেড়েই উঠল, তাই অনেক হিন্দু পৈত্রিক ঘরবাড়ী ছেড়ে এসে হিন্দু রাজ্যে বসতি স্থাপন করল। এতে সমাজ-সংহতি যে বেড়ে ওঠল তা নয়; উচ্চকোটি ও নিম্নকোটি সমাজের মধ্যে ব্যবধানও কমে গেল না। বাসস্থানের কিছু অদল বদল হল। এঁদের রাজ্যে শাসন-যন্ত্রও চলত রাজার ইচ্ছামত।

সামাজিক আদর-আপ্যায়নে পানের পরেই তামাকের স্থান। তামাক এদেশে এসেছে আকবরের রাজত্বের শেষাশেষি কিন্তু বাঙলা দেশে এর প্রচলন ঘটেনি সপ্তদশ শতকের আগে। কারণ বাঙলায় সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদের আগে মোগল তাদের দখলীস্বত্ব কায়েম করতে পারেনি।

তামাকপাতা ইউরোপে এনেছেন কলম্বাস আমেরিকা থেকে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি। পোর্তুগীজ তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছড়িয়ে দিয়েছে আরবে ও ভারতবর্ষের দক্ষিণাপথে। এখন যে যে প্রথায় তামাকপাতার ব্যবহার হয়, আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা প্রায় ঠিক তেমনি ভাবেই তা ব্যবহার করত। তাদের ধারণা ছিল এর ভৈষজ গুণ রয়েছে।

তামাকপাতা পেয়ে সমগ্র ইউরোপ হল ধূমপানে মত্ত; ভিষকেরাও এর গুণগান করলেন। তবু গোড়া থেকেই জড়িয়ে রইল এর প্রতি একটা গভীর সন্দেহ—হয়ত বা জিনিসটা বিষাক্ত।

পোর্তুগাল থেকে তামাকপাতা এল গোয়ায়, ক্রমে ছড়িয়েও পড়ল দক্ষিণাপথে। তবে এর ব্যাপক প্রচলন ঘটল দিল্লী বাদশাহী

দরবারে এর স্বীকৃতির ফলে। ধূমপান প্রথম করলেন স্বয়ং বাদশাহ আকবর ; যোগান দিলেন তাঁর সভাসদ্ আসাদ বেগ। এই আসাদ বেগকে অনুসরণ করেই আকবরের সঙ্গে তামাকের প্রথম পরিচয়ের বর্ণনাটি তুলে ধরছি।

"দক্ষিণাপথের বিজাপুরে আমি তামাকপাতা দেখতে পেলাম। ভারতবর্ষে এর সন্ধান পেলাম এই প্রথম। কিছুটা কিনে নিলাম সঙ্গে। তারপর তিন হাতের মত একটি কারুকার্যময় নল তৈরি করিয়ে, তার দুদিক মাণিক্যখচিত করে নিলাম। গোড়ার দিকে একটি রঙিন পাথরের নল বসিয়ে তার ওপরে দিলাম সোনার কলকে। সবটা দেখতে খুবই মনোরম হল।

"কলকেতে তামাক সেজে বাদশাহকে বলা হল এই সেই তামাক—মক্কা ও মদিনায় যা বহুপরিচিত। আকবর ধূমপান করতে শুরু করলেন, কিন্তু বাধা দিলেন এসে তাঁর ভিষক্। বাধা দেবার আগেই আকবর দু' তিনটে টান দিয়েছিলেন, আর দিলেন না। ভিষক্ ডেকে পাঠালেন ভেষজ তৈরিকারককে। তিনি পুঁথি ঘেটে বললেন এতে তামাকের কথা নেই। অনেকে বলল ইউরোপের ভিষকেরা এর গুণগান করেছেন, কিন্তু বাদশাহের ভিষক্ নিজে পরীক্ষা না করে তা মেনে নিতে রাজী হলেন না।

"যাক—আমার কাছে তখনো বেশ খানিকটা তামাকপাতা ছিল ; ধূমপানের নল ইত্যাদিও কিছু তৈরি করেছিলাম। তা বিলিয়ে দিলাম ওমরাদের মধ্যে। দিন কয়েকের মধ্যে সবাই আরো তামাকপাতা চেয়ে বসলেন! তামাক চালু হল। বণিকেরা দক্ষিণাপথ থেকে তামাক এনে দিল্লীতে বিক্রি করতে শুরু করল কিন্তু বাদশাহ নিজে তা আর স্পর্শ করলেন না।"

কিন্তু ক্রমশ এই নেশার বস্তুটি ছড়িয়ে পড়ল ওমরার প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের কুটিরে, দক্ষিণাপথের মাঠ থেকে উত্তরাপথের মাঠে ; এল বাঙলার ঘরে ঘরে।

ধূমপান তো চললই ; ক্রমে জলে পরিশুদ্ধ করে, ধূমপানের রীতি হল। তৈরি হল নানা ধাতুময় জলাধার ও কলকে। এল সাধারণ নারকেলের খোল, মাটির কলকে। তামাক ছড়িয়ে পড়ল সর্বসমাজে।

ক্রমে তামাক থেকে তৈরি হল নস্যি ও দোক্তা। সপ্তদশে ইংল্যাণ্ডে এর প্রচলন হল বহুল। দুই-ই এল বাঙলায় অষ্টাদশ শতকে—পেল সাদর অভ্যর্থনা।

এখন অবশ্য পৃথিবীর মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডই তামাকের প্রধান ভক্ত ; এর পরেই আমেরিকা, তারপর বৃটেন। ভারতবর্ষ জনবহুল দরিদ্র দেশ—তা-ও এ নেশার বাবদ কম মাশুল জোগায় না—বৃটেনের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রতিটি সাবালক জনপ্রতি বছরে প্রায় এক কিলো।

বাঙলায় তামাক চাষের ব্যাপক প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে চাষীর অভিজ্ঞতাও খনার বচনে এসে ঢুকে পড়ল ;

"তামাক বুনে গুঁড়িয়া মাটী
বীজ পুঁতো গুটি গুটি
ঘন ঘন পুঁতো না
পৌষের অধিক রেখ না॥"

তুর্কীরা বহিরঙ্গনেই তাদের নাচন দেখাত কিন্তু শেরশাহী আমল থেকে পাঠানেরা ঢুকল বাঙলার অন্দরমহলে। ফলে হিন্দুনির্যাতন বেড়ে উঠল। এর প্রমাণস্বরূপ দীনেশচন্দ্র যে তথ্য বের করেছেন তার মধ্যে একটি আইনগত। আইনটি উদ্ধৃত করা হয়েছে ফন্ নিয়রের (Von Neor) আকবরের জীবনী থেকে। আইনটি এই যে যদি দেওয়ানের কর্মচারী কোনো 'জিম্মি' অর্থাৎ হিন্দুপ্রজার কাছে খাজনা চায়, তা হলে তা দিতে হবে অত্যন্ত বিনীত ও নম্রভাবে। শুধু তা-ই নয়, যদি জিম্মির আনুগত্য ও একমাত্র সত্যধর্ম ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধার পরখ করতে তার মুখে সে থুথু দিতে চায়, তাহলে পরমানন্দে

হাঁ করে সে থুথু তার গ্রহণ করতে হবে। আকবর এ কলঙ্কময় আইন বাতিল করেন।

এই 'মুখে থুথু' দেবার পরম অবমাননাকর প্রথাটি যে প্রচলিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এর স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে;

"ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে
কার পৈতা ছি ড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে।"

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এই অত্যাচারের একজন জীবন্ত সাক্ষী। তাঁর আদি বাসস্থান ছিল বর্ধমানের সিমিলাবাদ পরগণার দামুন্যা গ্রামে; অত্যাচারের ফলে সেখান থেকে পালিয়ে এলেন আধুনিক মেদিনীপুরের ঘাটাল থানার অধীন আরড়া গ্রামে। আরড়ায় ছিল ব্রাহ্মণ জমিদার। সেটা যোড়শ শতকের শেষপাদ; এই আরড়াতেই কবিকঙ্কণ তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ চণ্ডীমঙ্গল লেখেন। সে পুঁথিতে যে সামাজিক চিত্র রয়েছে তা ইতিহাসের দিক্ থেকে পরম মূল্যবান্। আমরা এবার তারই অনুসরণ করব।

বাঙালী সমাজ ছিল গ্রামকেন্দ্রিক, জীবনযাত্রা একান্তভাবে কৃষিনির্ভর। রাস্তাঘাট যান-বাহনের অভাবে প্রায় প্রতিটি গ্রামই আত্মনির্ভর। চাষবাস ও সাধারণ জীবনযাত্রার জন্য যা প্রয়োজন তা সবই তৈরি হত গ্রামের মধ্যেই। বাঙালীর প্রায় সর্বশ্রেণীর লোকই গ্রামে গ্রামে বাস করত।

ব্রাহ্মণের কাজ ছিল যাজন, কুলপাঁজী বিচার, শাস্ত্রবিচার, জাওয়াতি' (জন্মপত্রিকা) লেখা, পুরাণ পাঠ; ব্রাহ্মণেরা চাষবাসও করতেন; কবিকঙ্কণ নিজেও মূলত ছিলেন চাষী। বাঙলায় ক্ষত্রিয়-গোষ্ঠী বলে বিশেষ কোনো গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয় না, যদিও তাদের পেশার উল্লেখ রয়েছে।

বৈশ্যেরা 'কৃষ্ণ সেবে', 'হীরা, নীলা, মতি, পলা' বিক্রেতা—'বৈশ্যজন সুখী'।

বৈদ্যেরা করত তন্ত্রমতে চিকিৎসা, 'বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়' কিন্তু অসাধ্য রোগ দেখলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে!

বাঙলার বৈদ্যদের উৎপত্তি নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক রয়েছে—তার বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। কারো কারো মতে দক্ষিণাপথের 'বেল্লাল' উপাধিধারী গোষ্ঠীর পেশা পৌরোহিত্য হলেও, তারা বিচার ও সৈন্যবিভাগেই বেশি কাজ করত। কর্ণাট থেকে 'বেল্লালের' দল এসে জুটেছিল বাঙলায়; এরাই এদেশীয় বৈদ্যদের পূর্বপুরুষ। তাই সেনেরা বলেন, আমরা সম্রাট্ বল্লাল সেনের বংশধর। অথচ, সুবর্ণবণিক্‌দের একগোষ্ঠী 'সেন' আখ্যাটি মৌরুসী পাট্টায় দখল নিয়েছে। বল্লাল সেনের সঙ্গে এদের বিরোধ সর্বজনবিদিত। তবে কি এরা 'মহাভারতের' ক্ষত্রিয় বীর ভীম সেনের বংশধর? না, অম্বষ্ঠ অর্থাৎ একটি সঙ্কর গোষ্ঠী যাদের উৎপত্তি হয়েছে ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতা থেকে?

গ্রামবাসীদের মধ্যে রয়েছে কায়স্থ, তেলি, কামার, কুমোর, তাঁতি, মালী, নাপিত, মোদক, সরাক, কাঁসারি ইত্যাদি। এরা অপেক্ষাকৃত উচ্চকোটির। তাঁতি বুনত আটপৌরে কাপড়—ভুনী (শাড়ী), ধুতি, খাদি (ছোট শাড়ী), গড়া (সাদা থানফাড়া ধুতি) আর সরাক বুনত পাটশাড়ী অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা মনোরম শাড়ী। কাঁসারিদের দোকানে দেখা যাচ্ছে ঝারী (জলপাত্র, গাড়ু), খুরি (ছোট বাটি), থাল, বাটি, বড় হাঁড়ি, কোষাকুষি, সাঁপড়ি (কৌটা), ঘাঘর, ঘণ্টা, সিংহাসন ও পঞ্চপ্রদীপ। মোদক তৈরি করে চিনি, খণ্ড, নাড়ু আর 'ফেরি করে শিশুর আহ্লাদ'।

অধস্তরে রয়েছে দাস, কলু, বাইতি, বাগদি, মাছুয়া, ছুতার, চণ্ডাল, মারাটা, ডোম ইত্যাদি। দাসেরা মৎস্য বেচে, চষে চাষ, বাইতিরা বাদ্যকর; ছুতার 'চিড়া কোটে, খই ভাজে—কেহ গড়ে শকট বিমানে।' চণ্ডাল করে লবণ বিক্রয়। আর 'মারাটা'—এরা কারা?

"ফিরে তারা গুজরাটে শোলকে পিলীহা কাটে
ছানি কাটে দিয়া চক্ষে কাঁটা।"

হয়ত গুজরাটী বা মারাঠী—শল্যবৈদ্য কিন্তু 'কু'। এরা বাঙলায় এসে জুটল কখন ও কি করে ?

বাঙালীর সমাজে ষোড়শ শতকে 'নয়া মুসলমান' ও পাঠান স্থায়ী আসন পেতে বসেছে প্রায় প্রতিটি বড় গ্রামেই। এদের মধ্যে রয়েছে জোলা, মুকেরী, পিঠারি, কাবারি, কাগতি, রঙ্গবেজ, হাজাম বা মুসলমানের নাপিত, কসাই, দরজি, নেয়ালি প্রভৃতি। কাবারিরা বেচত মাছ, কাগতি তৈরি করত কাগজ, মুকেরী চালাত গরুর গাড়ী, পিঠারি বেচত পিঠা, আর নেয়ালি তৈরি করত সাদা ফিতা।

এ যুগে এদের সবাই আর স্বকর্মনিরত নেই।

মুসলমান ফজর থেকে পাঁচবেরি নামাজ পড়ে, মালা জপে, পীরের মোকামে সাঁজ দেয়, কোরান পাঠ করে, পীরের শিরনি বাটে, দশের বিচার মেনে নেয়, প্রাণ গেলে 'রোজা নাহি ছাড়ে, মাথে নাহি রাখে কেশ—বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।' পরে ইজার আর মাথায় দেয় টুপি।

"যত শিশু মুসলমান, তুলিল মক্তব খান (খানকা), মকদম পড়ায় পঠনা।'

এবার চণ্ডী ছেড়ে ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে যাওয়া যাক।

দশ বছরের আগেই কন্যার বিবাহ দেওয়া ছিল বিধেয়। বিবাহের অঙ্গ ছিল অধিবাস, বরযাত্র, স্ত্রীআচার, শুভদৃষ্টি, মালাবদল, লাজাহুতি হোম ; পরের দিন শয্যা তোলা—'শয্যা তোলে, কড়ি মাগে পরিহাসীজন ; সাধু দেয় পঞ্চাশ কাহন'। রীতিগুলি এখনো মূলত অপরিবর্তিত।

হাটে বাজারে কি কি জিনিস পাওয়া যেত ? তেল, ঘি, লাউ, কচি কুমড়া, রুই, কই, চিতল, বোয়াল, শোলপোনা, কামরাঙ্গা, মহিষা-দই প্রভৃতি। বাজারের হিসাবে চাকরের ছলনা ? তা সেদিনও ছিল।

অতিথির আদর-আপ্যায়নে তখন গুয়াপানের সঙ্গে সন্দেশ যুক্ত হয়েছে। পায়রা উড়াইবার আমোদ তখনো ছিল আর ছিল ঘুড়ি ওড়ানো, কারণ সুতা ও নাটাইয়ের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

আহারে বসতেই পাতে প্রথম পড়ত সুকুতা, ঝোল, ঘন্ট, শাক; ঘি তো থাকতই আর থাকত ভাজা মাছ, ঝোল, মাংসের ব্যঞ্জন। শেষ হত দই, পিঠা ও পায়স দিয়ে।

স্বামীর বহুবিবাহের ফলে স্ত্রী বশীকরণের অস্ত্রে শান দিত। সে অস্ত্র ছিল; কাটা মহিষের নাকের দড়ি, সাপের আঁটুলি, রুই মাছের পিত্ত। অন্যত্র দেখা যায়: ছিনা জোঁক, শ্বেতকাকের রক্ত, কচ্ছপের নখ, কুমীরের দাঁত, গোসাপের আঁত, বাদুড়ের পাখা, সজারুর কাঁটা।

এ সব ছিল বহুপ্রচলিত; ইচ্ছা হয় কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন!

গর্ভিণীর মুখের অরুচি দূর করতে ব্যবস্থা ছিল:

"মীন চড়চড়ি কুসুম বড়ি।
সরল সফরী ভাজা চিঙ্গড়ি॥
... ...
আমড়া, নোয়াড়ি পাকা চালিতা
আমসি, কাসুন্দি কুল করঞ্জা
থোড়, উড়ুম্বর ইচলী মাছে
খাইলে মুখের অরুচি ঘুচে॥"

সওদাগরেরা বাণিজ্যে যেত। বাণিজ্যে ছিল দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা। কিন্তু কবিকঙ্কণের তালিকায় অনুপ্রাসেরই মিল—ইতিহাসের নয়।

"কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ দিবে
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে
শুঁঠের বদলে টঙ্ক॥"

তা না থাকলেও তাঁর জলপথের বিবরণ ইতিহাস-গন্ধী।
শ্রীক্ষেত্রের পরে "ফিরাঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডরে।"

হারামদ বা হারমদা পোর্তুগীজ প্রধান অ্যালমীডা না তাদের আর্মাডা (armada) বা যুদ্ধের নৌবহর? পোর্তুগীজ ও মগেরা দক্ষিণবঙ্গে অবাধ লুটতরাজ করে চলেছিল। লুটতরাজের সঙ্গে সঙ্গে চলত তাদের ক্রীতদাসের ব্যবসা। সাধারণত লোক ধরে বেচত জনপ্রতি কুড়ি থেকে সত্তর টাকায়।

কীর্তন শব্দটি এসেছে কীর্তিগাথা থেকে। ষোড়শ শতকে, মহাপ্রভুর ভাববন্যার প্রাণবস্তু হল নাম-কীর্তন, বা নাম-সংকীর্তন। সবই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন লীলা বিষয়ক। রাধাকৃষ্ণ লীলার পদ গানগুলি পদাবলী।

মহাপ্রভু নিয়ে এলেন নামকীর্তন কিন্তু তারও পূর্বে উত্তর রাঢ়ের প্রায় সর্বত্র প্রচলন ছিল পালা গানের; তার বিষয়বস্তু ছিল ভাগবতের গোষ্ঠলীলা, মানভঞ্জন, রাস প্রভৃতির।

এরই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলত মনসামঙ্গল, গীতগোবিন্দ, পাঁচালী, যাত্রাগান, কালীকীর্তন।

এ সব কীর্তনধারায় রাঢ়ের পল্লী অঞ্চলের নাম যুক্ত রয়েছে। গরাণহাটি পদ্ধতির জন্ম হয়েছে গড়ের হাটি পরগণায়, মনোহর সাহী পরগণা থেকে মনোহর শাহী, রাণীহাটি থেকে রেণেটি, মন্দারণ থেকে মন্দারিণী, ঝাড়খণ্ড থেকে ঝাড়খণ্ডী।

ষোড়শ শতকে বাঙলায় মাৎস্যন্যায়ের ফলে ডাকাতি, বিশেষ করে নদীপথে, বেড়ে গেল। শুধু পথিকের কেন, গৃহস্থেরও দস্যুভয় বাড়ল। তাই গ্রামে গ্রামেও বাড়ল লাঠিসোঁটা, বর্শা প্রভৃতি নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা। শাসনভার ছিল আঞ্চলিক সামন্তদের ওপর, রাজার একনায়কত্ব ছিল না। মোটামুটি যেমন ছিল গথ বা ভ্যাণ্ডালদের আমলে, ইউরোপে। সামন্তদের ব্যবস্থা ও শক্তির ওপর

মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করত। কাজেই অঞ্চলে অঞ্চলে ছিল তার তারতম্য।

চতুর্দশ শতক থেকে বাঙালীর সমাজে যে নৈতিক চেতনার উদ্বোধন হয়েছিল, প্রথমত কালীকীর্তনে পরে রামায়ণ গানে, মহাপ্রভুর কালে তা শুধু অব্যাহতই রইল না, বেড়ে উঠল। মহাপ্রভুর আদর্শে সারা বাঙলায় একটা নৈতিক জাগরণের সূত্রপাত হল। বাঙালীর তীর্থভ্রমণ বেড়ে গেল, বৈষ্ণবী শক্তির স্পর্শে বাঙালীর সমাজদেহেও যেন একটু প্রাণস্পন্দন দেখা গেল।

ওদিকে নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠল বাঙলার প্রজ্ঞাখ্যাতি। তার প্রধান কারণ সার্বভৌম মহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য ও রঘুনাথ শিরোমণির নব্যন্যায়ের যশ। এ সব মিলিয়ে, ষোড়শ শতক বাঙালীর প্রথম জাগরণের সূচনা করল।

প্রধান 'বারভুঁইয়া'র রাজ্য।
ইংরেজ আমলের বিভাগ
'সরকার' বিভাগ
মোগল-পাঠান রাজ্য সীমানায় মোগলের পাঁচটি ঘাটি বা থানা।
[মোটামুটি হিসাবে মোগল আমলের (ষোড়শ শতকে) 'সরকার বিভাগ' - ইংরেজ আমলের (বিংশ শতকের) বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে]
— আইন-ই-আকবরী —
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
রংপুর
ব্রহ্মপুত্র নদ
তাজপুর
পিঞ্জর
জন্নতাবাদ
দিনাজপুর
ঘোড়াঘাট
গঙ্গানদী
ঈশা/মুসা খাঁ
১৬১০/১১ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত
মালদহ
বগুড়া
শেরপুর
(পাঠানের শক্তিকেন্দ্র)
উদম্বর
বরবকাবাদ
রাজশাহী
ময়মনসিংহ
শ্রীহট্ট
পাবনা
মুর্শিদাবাদ
টেকে
ঢাকা
ভাওয়াল
বীরভূম
কুষ্টিয়া
পার্বত্য ত্রিপুরা
সোনারগাঁ
মামুদাবাদ
বর্ধমান
নদীয়া
ত্রিমোহানি
কুমিল্লা
পুরুলিয়া
মন্দারণ
বাঁকুড়া
সুলেমানাবাদ
যশোহর
ফরিদপুর
ত্রিপুরা
নোয়াখালি
পার্বত্য চট্টগ্রাম
হুগলী
হাওড়া
খিলাফতাবাদ
ফতাবাদ
মেদিনীপুর
সাতগাঁও
খুলনা
বাখরগঞ্জ
উড়িষ্যা
২৪ পরগণা
কুতুবদিয়া
রামচন্দ্র
(প্রতাপাদিত্যের জামাতা)
প্রতাপাদিত্য
বঙ্গোপসাগর
অর্ধেন্দু দত্ত

অবক্ষয়ের কাল

(সপ্তদশ শতক)

[আট]

মানসিংহ (১৬০১)
(পুনরাগমন)
শুজা (১৬৩৯—১৬৫৯)
শায়েস্তা খাঁ (১৬৬৪—১৬৮৮)
আজিম-উস্-সান (১৬৯৮—১৭০৭)
ইংরেজের শক্তিকেন্দ্র কলিকাতার ভিত্তি স্থাপন (১৬৯০)

বুদ্ধ যেমন তাঁর মতবাদ সম্পর্কে নিজে কিছুই লিখে যাননি, শুধু তাঁর ভক্তের দলকে মৌখিক উপদেশই দিয়েছেন, মহাপ্রভুও তেমনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব পন্থা সম্পর্কে নিজে কিছুই লেখেন নি। এর ফলে বৌদ্ধমতের দুটি শব্দের, অর্থাৎ 'নির্বাণ' ও 'করুণার', তাৎপর্য নিয়ে পরবর্তী কালে হল প্রবল মতদ্বৈধ ; ফলে সৃষ্টি হল মহাযান পন্থার, যা কালক্রমে পর্যবসিত হল সহজযানের আবিলতায়। সে আবিলতার ঘূর্ণাবর্তে বৌদ্ধধর্ম ক্রমে রসাতলে গেল।

মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবপন্থার ক্ষেত্রেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। যে বৈষ্ণবীশক্তির উদ্বোধন ছিল তাঁর লক্ষ্য আর, যার ঠিক পরিচয় রয়েছে তাঁর সমসাময়িক চরিতকার বৃন্দাবন দাসের রচনায়, তা পরবর্তী চরিতকারদের মনঃপূত হল না। বৈষ্ণবী-শক্তিতত্ত্ব পরিবর্তিত ও বিকৃত হতে হতে ঠেকল এসে শুধু মাধুর্য-আস্বাদনে। সে মাধুর্যের আধার হল নারী, তা-ও স্বকীয়া নয়, পরকীয়া। এ পরিবর্তন ঘটল অতি দ্রুত, প্রায় মহাপ্রভুর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই। অর্থাৎ পূর্ববর্তী 'সহজযানের' ভূত এসে ভর করল মাধুর্য-লোলুপ বৈষ্ণব সমাজের ঘাড়ে। ফলে বাঙালী বৈষ্ণব সমাজে যে নানা পঙ্কিল ও পূতিগন্ধময় বদ্ধ জলাশয়ের সৃষ্টি হল তার কিছু কিছু পরিচয় ক্রমে

ক্রমে দেওয়া যাবে। এ সব খানাডোবা পরবর্তী তুই শতকের মধ্যেও ভরাট হল না। শুধু যে তা-ই ঘটল তা নয়: বৈষ্ণবপন্থায় জাতিভেদও ফিরে এল এবং এসব আবিলতার ছোঁয়াচও লাগল আনুষ্ঠানিক পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মে। মহাপ্রভুর প্রবর্তিত নিয়মে বৈষ্ণব ভক্তগণের নারীর সঙ্গে কথাবার্তাও নিষিদ্ধ ছিল। এখন নারী শুধু মাধুর্য-লীলাসঙ্গিনীই হল না, বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারে গুরুও হল। ফল যা হবার তা-ই হল ; গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজও গেল রসাতলে।

সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে যে মতদ্বৈধ ছিল না, তা নয়। এদের মধ্যে নানা দলের সৃষ্টি হল ; আউল, বাউল, শাই, দরবেশ, নেড়া, কর্তাভজা, স্পষ্টদায়ক, কিশোরীভজা প্রভৃতি। দলগুলি বিভিন্ন হলেও মিল ছিল তিনটি বিষয়ে, গুরুবাদে, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনে আর পরকীয়া প্রেমে।

বাঙলার নদীয়া জেলার ঘোষপাড়া, শান্তিপুর, চব্বিশ পরগণার খড়দহ, বীরভূমের কেন্দুলী এবং বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের কোনো কোনো অঞ্চলে হল এদের ঘাঁটি। পূর্ববঙ্গে এ সব খানাডোবার সন্ধান বেশি পাওয়া যায় না। বিংশ শতকেও বাঙালী সমাজের এ বিষাক্ত ক্ষতগুলি শুকিয়ে যায়নি। আশ্চর্যের কথা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী-সমাজও এ পর্যন্ত এ ক্ষতের জ্বালার তীব্রতা বোধ করেনি! এরা সবাই মহাপ্রভু প্রদর্শিত পথের ভ্রান্ত পথিক মাত্র।

মানসিংহ, সম্রাট্ আকবরের প্রতিভূরূপে, বাঙলার শাসনকর্তা হিসাবে প্রথম এসেছিলেন ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। আবার এলেন ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে, বারভুঞা ও মগ-পোর্তুগীজ জল-দস্যুদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। এবার এসে সোজা ময়মনসিংহে গিয়ে বসলেন পাঠান ভুঞা মুসা খাঁর এলাকা ঘেঁষে। মুসা খাঁর বাবা ঈশা খাঁর দেহান্ত হয়েছিল এর তু'বছর আগে।

মোগল-পাঠান সীমান্তে তখন মোগলের মাত্র পাঁচটি ঘাটি বা থানা ; করতোয়ার পাড়ে ঘোড়াঘাট, ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্রের পুবপাড়ে

'শেরশাহী' শেরপুর, আধুনিক ঢাকার কাছে টোক ও ভাওয়াল, আধুনিক নারায়ণগঞ্জের কাছে ত্রিমোহানি। এগুলি সবই ছিল মোগলের সেনাবাস।

এবার শুরু হল মানসিংহের লড়াইএর পালা, শুধু মুসা খাঁর বিরুদ্ধে নয়, আরো কয়েকটি ভুঞা ও জল-দস্যুদেরও বিপক্ষে। প্রতাপাদিত্যও এদের অন্যতম।

আকবরের দেহান্ত হল ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে, মসনদে বসলেন জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর এমনই মানসিংহকে পছন্দ করতেন না। একে তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী খুশ্রুর মামা, তারপর জানতেন যে তিনি বাঙলার শাসনকর্তা থাকলে তাঁর একটি বিশেষ কামনা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই। কামনাটি একজন পরস্ত্রী আত্মসাৎ।

বর্ধমানের তুর্কী জায়গিরদার শের আফগানের স্ত্রী নূরজাহান ছিল তাঁর প্রথম যৌবনের বল্লভা ; চরিত্রহীন জাহাঙ্গীর তাকে ছলে, বলে, কৌশলে যা করেই হোক, দখল করতে মনস্থ করলেন। ফলে, বাদশাহী ফরমান মান্য করে মানসিংহ বাঙলার গদি ছেড়ে দিয়ে আসলেন জাহাঙ্গীরের দোস্ত কুৎবুদ্দীন খাঁকে। জাহাঙ্গীরের ইচ্ছা পূরণ হল বটে, কিন্তু আফগান ও কুৎবুদ্দীনের লড়াইয়ে দু'জনেরই প্রাণান্ত ঘটল।

জাহাঙ্গীর আইন-ই-আকবরীর লেখক আবুল ফজলকেও বিষ-দৃষ্টিতে দেখতেন। তার প্রধান কারণ আকবরের প্রভাব তাঁর ওপরে ছিল অপরিমিত। তার ওপর, তিনি ছিলেন সুফী আর সুফীরা সর্বতোভাবে রসুলের বাণী মান্য করে চলতেন না। প্রবাদ, আবুল ফজল ছিলেন বৃকোদরের ভায়রা ভাই ; তিনি নাকি জল ও সুপ বাদে রোজ বাইশ সের খাদ্য খেতেন! তাঁর আহার্যে ব্যঞ্জনাদির সংখ্যা অনেক সময় হাজারে পৌঁচেছে!

সেকালে মোগলের তরফে ইসলাম খাঁ ছিলেন ভাওয়ালের শাসক ; মানসিংহ যা শুরু করে অসমাপ্ত রেখে ফিরে গেলেন তা সমাপ্ত

করলেন ইনি। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ মোগলের করায়ত্ত হল। তারপর সে অঞ্চলে মোগলের দখলীস্বত্ব কায়েম করার জন্যই ঢাকা শহরের পত্তন করলেন, 'জাহাঙ্গীর নগর' নামে, বারো ভুঞা বিশেষ করে ঈশা খাঁ ও পোর্তুগীজ ও মগ দস্যুদের দমন করা এখান থেকে সহজ হবে বলে। এর মধ্যে দিল্লীর রঙ্গভূমিতে নানা ঘটনা ঘটল, তার মূলকথা তক্ত নিয়ে বাপ-বেটার কলহ। জাহাঙ্গীর যেমন পিতা আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহানও করলেন তা-ই। বাঙলার জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) ও রাজমহল দুই-ই দখল করে বসেছিলেন সাজাহান, কিন্তু জাহাঙ্গীরের দেহান্তের পরেই শুধু তিনি দিল্লীর তক্তে পোক্ত হয়ে বসতে পারলেন ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে। সাজাহান-পুত্র আওরংজেব ছিলেন দক্ষিণাপথের গদি চেপে, সুজা ছিলেন বাঙলায়। সুজার কালে বাঙলায় কিছুকাল একটানা শান্তি ফিরে এল। তারপর 'যেনাস্য পিতরো গতাঃ' নীতি অনুসরণ করে সাজাহানের পুত্র-চতুষ্টয়, পিতার জীবিতকালেই, লড়াই শুরু করলেন। কিন্তু আওরংজেবই দিল্লীর তক্ত দখল করলেন ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে, সুজা গেলেন পালিয়ে আরাকানে।

পূর্ববঙ্গ পুরোপুরি মোগলের আয়ত্তে আনার জন্য মানসিংহের, পরে ইসলাম খাঁর, প্রধান প্রয়োজন ছিল একটা পোক্ত নৌবাহিনীর। ফলে ঢাকায় মোগলের 'মীর বহরের' ঘাঁটি তৈরি হল। সেখানে বহুরকমের নৌকা তৈরি হত ; কোশ, জলবাস, গ্রা, পরিন্দা, বজরা, ভড়, বালাম প্রভৃতি। শ্রীহট্ট থেকে আসত নানা রকম কাঠ, তৈরি করত সূত্রধর অর্থাৎ ছুতারেরা। তাদের স্মৃতি বহন করে আছে ঢাকার 'সূত্রাপুর' পল্লী। কাঠ জোড়া দেওয়া হত লোহার পেরেক দিয়ে ; তা-ও তৈরি হত ঢাকায়। জাহাঙ্গীর-নামা অনুসারে বহরে সর্বশুদ্ধ ছিল চারশ থেকে পাঁচশ নৌকা। এর সাক্ষী রয়েছেন পাশ্চাত্যের পর্যটক ম্যানরিক, টেভার্নিয়ার প্রভৃতি।

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎবঙ্গে' লিখেছেন যে চট্টগ্রামের 'বালামী'

নামক এক শ্রেণীর ছুতার সমুদ্রগামী নৌকা তৈরি করত; 'বালামী' নৌকা এদের নাম থেকেই এসেছে; 'গাধা' নৌকা লোহার পেরেক দিয়ে জোড়া দেওয়া হত না, হত 'গন্বক' নামক একপ্রকার বেত দিয়ে। আর ছেঁদাগুলি জুড়ে দিত দড়ি, তুলা আর ধুনা, বা শাল-গাছের কস দিয়ে।

আকবরের প্রতিটি বহরে থাকত একজন 'নাখোদা' বা সর্বাধ্যক্ষ, একজন 'মৌলিম' বা 'মালিম' যার কাজ ছিল নদীর বাঁও মাপা ও দিক্‌নির্ণয়: একজন 'টাণ্ডেল' বা খালাসীদের নেতা, একজন 'সারেঙ্গ' বা জাহাজ পরিচালক, একজন 'ভাণ্ডারী'—রসদ থাকত যার হেপাজতে। এ ছাড়া থাকত সাধারণ খালাসীর দল ও নৌসেনা। সাধারণ খালাসী যোগাত পূর্ববঙ্গই; নৌচালন বিদ্যায় তাদের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। আকবরের নৌবহরে পোর্তুগীজও ছিল।

ইটালীয়ান (ভেনিসের) পর্যটক ফেডারীচি বলেছেন যে ঢাকার তৈরি জাহাজ ছিল পোক্ত ও সস্তা; ফলে ইস্তাম্বুলের সুলতান আলেকজান্দ্রিয়ায় তার জাহাজ তৈরি না করিয়ে করাতেন পূর্ববঙ্গ থেকে। কথাটা যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই, কারণ এদেশে তৈরি মালের এ দু'টি গুণের সমর্থন পাওয়া যাবে পরবর্তী কালের ইতিহাসেও।

ষোড়শ শতকের শেষভাগে টোডরমল বাঙলায় 'আসল জমা তুমার' নামে ভূমিকর নির্দিষ্ট করেন। বোধ হয় এর আগে কর ছিল হয় 'গৃহমাগত' শস্যের ভাগবিশেষ, নয় রোপিত শস্যের কিছু অংশ। দুইয়ের পরিমাপই অনির্দিষ্ট, জমিদারের মর্জির উপর তা নির্ভর করত। জমিদারেরা ত ঠিকাদার মাত্র, জমির মালিক ছিল দেশের রাজা। আকবরী ব্যবস্থায়ও জমিদারেরা ঠিকাদারই রইল বটে, তবে এখন, রায়তেরা ঠিকমত খাজনা দিলে, তাদের আর জমি থেকে উৎখাত করা সম্ভবপর হত না। তাদের মর্জির আওতার বাইরে এসে চাষীরা অনেকটা স্বাধীন ও স্বচ্ছ হল বটে, কিন্তু উদ্ধত হল। জমিদার ও

রায়তের মধ্যে যে স্বাভাবিক সৌহার্দ্য বর্তমান ছিল-তারও কোনো তারতম্য ঘটল না। মোটের ওপর টোডরমলের এই 'তুমার জমা' বাঙলার চাষীর পক্ষে একটা আশীর্বাদরূপেই গণ্য হল। 'তুমার জমা'র প্রথা অব্যাহত রইল প্রায় একশ পঁয়ত্রিশ বছর অর্থাৎ মুর্শিদকুলী খাঁর আমল শুরু হওয়া পর্যন্ত।

বাঙলার চাষীর প্রধান সম্বল ছিল ধান ; সে ফসল ফলত অজস্র। আর ধানও এত রকমের যে তার এক একটি রকমের একটি ধান নিলেও একটা মস্ত বড় পাত্র ভবতি হয়ে যেত। আইন-ই-আকবরীর এ তথ্য বামাই পণ্ডিতেব শূন্যপুবাণেরই প্রতিধ্বনি।

বাড়ী, ঘর তৈরি হত বাঁশ, বেত ও শণ দিয়ে। বাঁশ ও বেতের কাজ ছিল অপূর্ব ; এমন ঘরও তৈরি হত যার খরচ পড়ে যেত সেকালেই হাজার পাঁচেক টাকা বা তার বেশি। বাঙলার তৈরি মাদুরেরও বহু খ্যাতি ছিল ঃ কোনো কোনো রকমের মাদুর দেখে ভ্রম হত যে এ সব রেশমে তৈরী।

বাঁশের তৈরি 'বার দুয়ারী'—অর্থাৎ বারোটি দরজাওয়ালা ঘর ছিল অতি প্রসিদ্ধ। ফরিদপুরের একটি গ্রামে একটি 'চৌরী' বা চার-চালা ঘরের সন্ধান পাওয়া গেছে যার তৈরি খরচ পড়েছিল বারো হাজার টাকা ; হয়ত তার চিহ্ন এখনো কিছু রয়েছে। ইট কাঠের বাড়ীও যে ছিল না তা নয়, তাতে থাকত পোড়া মাটির সাজ—অনেকক্ষেত্রে এনামেল করা। তবে সাধারণত প্রাসাদ বা প্রাসাদোপম বাসগৃহ, মন্দির, মসজিদ ও দরবার তৈরি হত তা দিয়ে। বাঙলার কুটির দেউল তৈরি হত দোচালা বা চৌচালা ঘরের ধাঁচে। এর খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছিল বাঙলার বাইরেও।

আইন-ই আকবরীতে 'ঘোড়াঘাট' সরকারে পাটের তৈরি এক-রকম মোটা কাপড়ের কথার উল্লেখ রয়েছে—নিশ্চয়ই আধুনিক চটের পূর্বপুরুষ। এই সরকারে রেশমও তৈরি হত।

বাঙলার শেরশাহী বিভাগের ধাঁচেই আকবরী বিভাগ বা

সরকার গঠিত হয়েছিল। তার মোটামুটি চৌহদ্দির খবর পাওয়া যাবে সঙ্গের মানচিত্রে। স্যর যতুনাথের মতে, ইংরেজ আমলের বিভাগগুলির ক্রমাগত ভৌগোলিক পরিবর্তনের পটভূমিতে, আকবরী বিভাগগুলির সঙ্গে ইংরেজ আমলের বিভাগগুলির কতখানি মিল বা অমিল তার সূক্ষ্ম বিচার অসম্ভব, তবে মোটামুটিভাবে অমিলগুলি হল : (ক) মেদিনীপুরের দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগের এক বৃহদংশ আকবরের কালে যুক্ত ছিল উড়িষ্যায়, (খ) পূর্ণিয়া জেলা ও ভাগলপুরের পূর্বাংশ ছিল বাঙলায়, আর (গ) 'ভূম' অঞ্চল (সিংভূম, ধলভূম, মানভূম,) বাঙলার মন্দারণ সরকারেরই অংশ ছিল।

'বারবকাবাদে' বা রাজশাহী ও বগুড়ার কিয়দংশে মিলত সেকালের প্রসিদ্ধ কাপড় 'গঙ্গাজল' ; 'বাজুহা' বা পাবনা ও ঢাকার কিয়দংশে (বোধহয় ভাওয়ালে) ছিল ঘন বন ও লোহার খনি ; 'সোনারগাঁয়' হত প্রচুর মসলিন আর 'শরিফতাবাদ' বা বর্ধমান অঞ্চল বিখ্যাত ছিল ধপধপে সাদা ও সুঠাম গবাদি পশুর জন্য ; এক-একটির ওজন হত মন পনেরো।

'খিলতোবাদে' বা যশোহরের দক্ষিণাংশে (অধুনাতন খুলনা) ও বাখরগঞ্জের পশ্চিমাংশে ছিল ঘন বন ; সে বনে থাকত বন্য হাতি।

প্রত্যেক সভ্য সমাজেই আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা শুনা হলে নমস্কার ও প্রতিনমস্কারের রীতি বহুকাল পূর্বেই গড়ে উঠেছে। ইসলামীয় রীতিতে 'নমস্কার' হল 'সলাম অহ্লৈকুম', প্রতিনমস্কার 'অহ্লৈকুম সলাম'। আকবর এ দুটিকে এক করে মুসলমান সমাজে ঈশ্বরের সর্বোত্তমত্ব জ্ঞাপক 'আল্লাহু আকবর' চালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা চলল না এজন্য যে লোকের ধারণা হল এতে আকবর নিজেকেই ঈশ্বর বলে চালাতে চাইছেন। চলেনি আরো একটি ফতোয়া, সেটি বাল্যবিবাহ সম্পর্কে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় দলেই, অর্থাৎ সমগ্র বাঙালী সমাজেই বিবাহের বয়স বরের বেলা করতে চেয়েছিলেন ষোলো, আর কনের পক্ষে চৌদ্দ।

সপ্তদশ শতকের শুরুতেই কাশীরাম দাসের মহাভারত রচিত হয়। বর্ধমানের ইন্দ্রাণী পরগনার সিঙ্গি গ্রাম কাশীরাম দাসের জন্ম ও প্রাথমিক কর্মস্থল। প্রবাদ, সাড়ে তিনটি পর্ব লিখে তিনি 'স্বর্গপুর' যান (১৬০৪ বা ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে) এবং বাকিটা শেষ করেন তাঁর কবি ভ্রাতাদ্বয়। কালের দিক থেকে বাঙালীর রামায়ণ, ও মহাভারত মূল সংস্কৃতেরই অনুক্রম অনুসরণ করেছে অর্থাৎ যেমন সংস্কৃতে তেমনি বাঙলায় প্রথম রচিত হয়েছে রামায়ণ, পরে মহাভারত। কাশীরাম দাসের মহাভারতে নিত্যানন্দ ঘোষের রচনার খাদ কতটা মেশানো সেটা সাহিত্যরথীদের বিচার্য ; বাঙালী সমাজের দিক থেকে কাশীরাম দাসের মহাভারত কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত জনপ্রিয় হয়নি। ইসলামী বহির্বাস বাঙালী সমাজে রামায়ণ ও মহাভারতকে কখনো অস্পৃশ্য বা অপাঙ্‌ক্তেয় করে তোলেনি। সমাজের দিক থেকে দুটির পার্থক্য কতকটা এইমত : একটি

"কাশীরাম দাস কহে শোনে পুণ্যবান।"

অন্যটি : "শমন দমন রাবণ রাজা, রাবণ দমন রাম।
শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম॥"

অর্থাৎ রাম নামে, বা রামায়ণ ঘরে থাকলে, ভূত পালায়। মহাভারতের শ্রোতা শুধু পুণ্যবানেরাই, কিন্তু রামায়ণ সর্বজনীন, আপামর পাপী-পুণ্যবান সবারই।

বাঙলায় মুসলমানের অনুপ্রবেশের পরে, ত্রয়োদশ শতক থেকেই হিজরা অব্দের প্রচলনের চেষ্টা চলেছিল। হিজরা অব্দ চন্দ্র-ভিত্তিক, ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই, বৃহস্পতিবারে এর জন্ম ; জন্মদাতা সম্ভবত খলিফা ওমর (৬৩৮-৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)। রাজকার্য চলত এই অব্দ অনুসারেই, কিন্তু বাঙলার শিক্ষিত শ্রেণী শকাব্দ মেনেই চলত। সাধারণ লোকও হিজরা অব্দ গ্রহণ করেনি ; তারাও তাদের দৈনন্দিন কাজে সেনরাজাদের আমলেও যেমন 'পরগণাতি অব্দ' মেনে চলত, ইসলামী রাজত্বেও তেমনি।

১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর এই হিজরা অব্দ বন্ধ করে দিয়ে তাঁর 'তারিখ-ই-এলাহী' প্রচলনের চেষ্টা করেন। 'তারিখ-ই-এলাহী' সূর্য-ভিত্তিক, প্রাচীন ইরানীয় পদ্ধতির একটু পরিবর্তিত সংস্করণ। কিন্তু ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের পরে এটির বিলোপ ঘটল।

এর পরে এল আমাদের বঙ্গাব্দ। এটি মিশ্র জাতীয়—সংকর শ্রেণী; হিজরার সঙ্গে সূর্যসিদ্ধান্তের অব্দের সমন্বয়। বঙ্গাব্দ পৃথিবীর সর্বত্র গৃহীত ও প্রচলিত গ্রেগরিয়ান পদ্ধতির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলেছে একটা নির্দিষ্ট ব্যবধান রেখে। গ্রেগরিয়ান পদ্ধতিও সূর্য-ভিত্তিক।

পূর্বেই বলা হয়েছে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা সূর্যসিদ্ধান্ত রীতিতে অব্দ গণনা করত। ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষই তাদের হিসাব মেনে চলত। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের পরে, বাঙালী শিক্ষিত সমাজে আবার শকাব্দের অর্থাৎ সূর্যসিদ্ধান্ত-রীতির প্রচলন হল। ডঃ ফন লিউর (Dr. Von L. de Leeuw) মতে ভারতবর্ষে শকদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে খ্রীঃ পূঃ ১২৯ সনে। যথারীতি তার শতবর্ষ বাদ দিলে থাকে ২৯। কাজেই গ্রেগরিয়ান অব্দ থেকে বঙ্গাব্দ বের করতে হবে একটা যোগ-বিয়োগ কষে। গ্রেগরিয়ান অব্দকে শকাব্দে পরিণত করে তা থেকে বাদ দিতে হবে হিজরা অব্দ : যেমন, এখন গ্রেগরিয়ান অব্দ হল ১৯৭৩ ; শকাব্দ ১৯৭৩+২৯ =২০০২ ; বঙ্গাব্দ ২০০২—৬২২=১৩৮০।

শকদের ভারত-ইতিহাসে অনুপ্রবেশ ঘটেছে খ্রীঃ পূঃ ১২৯ সনে কি ১২৩ সনে তা নিয়ে মতদ্বৈধ বর্তমান। দ্বিতীয় অব্দটির প্রধান সমর্থক প্রখ্যাত বাঙালী বিজ্ঞানী মেঘনাথ সাহা। তাঁর মত ডঃ ফন লিউ মেনে নিয়েছেন বটে তবে কার্যত তার প্রচলন এখনো ঘটেনি।

আরো একটি দ্বন্দ্ব রয়েছে সূর্যসিদ্ধান্তবাদীদের। যদি তাঁরা ভারতবর্ষের চিরাগত রীতি মেনে চলেন তবে চৈত্র মাসকেই বর্ষশীর্ষে ধরতে হয়, আবার গ্রীক-চলডিয়ান রীতি মেনে নিলে বৈশাখ থেকে বর্ষ শুরু করতে হয়। এ দ্বন্দ্ব মেটাতে তাঁরা একটা মধ্যপন্থা বেছে

নিয়েছেন ; সৌর বর্ষ গুণতে তাঁরা বৈশাখকেই প্রথম মাস ধরেছেন, আবার চান্দ্র বর্ষ গুণতে ধরেছেন চৈত্র মাসকে। বাঙালী সমাজে এ রীতিই চলে, কিন্তু তামিলনাদে সৌর ও চান্দ্র বর্ষ দু-ই শুরু হয় চৈত্র থেকে।

পঞ্জি, পঞ্জী বা পঞ্জিকা কথাটা এসেছে সংস্কৃত পঞ্চাঙ্গ থেকে। পঞ্জিকার এ পঞ্চাঙ্গ কি কি ? তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ ও করণ। প্রথম তিনটি সহজবোধ্য : শেষ দুটির প্রয়োজন জন্মপত্রিকার গণনায়। 'যোগ' হল ফলিত জ্যোতিষের মতে একটা বিশিষ্ট কাল-বিভাগ আর 'করণ' হল দিন-বিভাগ। করণের সংখ্যা এগারো।

বলা বাহুল্য, হিজরা অব্দ ফলিত জ্যোতিষের ভিত্তিতে রচিত হয়নি ; এ ক্ষেত্রে মাস শুরু হয় সেদিনেরই সন্ধ্যা থেকে যেদিন অমা-পক্ষের শেষে নূতন চাঁদ আকাশে দেখা যায়। এখানে বঙ্গাব্দের দ্বাদশ মাসের সঙ্গে হিজরা অব্দের মাসের তালিকা দেখানো হল।

বঙ্গাব্দ	হিজরা অব্দ
বৈশাখ	মহরম
জ্যৈষ্ঠ	সফর
আষাঢ়	রবি-উল-আওয়ল
শ্রাবণ	রবি-উস-সনি
ভাদ্র	জুমাদা-উল-আওয়ল
আশ্বিন	জুমাদা-উস-সনি
কার্তিক	রজব
অগ্রহায়ণ	শবান
পৌষ	রমজান
মাঘ	শওঅল
ফাল্গুন	জুলকুদা
চৈত্র	জুলহিজা

আকবরের আমলে ভারতবর্ষে লেখাপড়ার চর্চাটা ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। বাঙলায়ও তার ছোঁয়াচ লেগেছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। মক্তবে যা পড়ানো হত বলে দাবি করা হয় তার ফিরিস্তা দেখলে অবাক হতে হবে। তার মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান, নৈতিকশাস্ত্র, পাটীগণিত, হিসাবপত্র, কৃষিবিদ্যা, জ্যামিতি, ফলিত জ্যোতিষ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পদার্থবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, ধর্মনীতি প্রভৃতি।

এদিকে টোলে পড়ানো হত মাত্র ব্যাকরণ, বেদান্ত ও পতঞ্জলি। টোলে পাঠ্য অনেক বিষয় বাদ পড়েছে, যেমন, নব্যন্যায়, সুশ্রুত ইত্যাদি ; তেমনি মক্তবের হিসাবটার মধ্যেও কিছু গোঁজামিল রয়েছে বলে মনে হয়। এ সন্দেহের কথাটা স্পষ্ট করে বলেছেন মুরল্যাণ্ড। তাঁর মতে পাঠ্যতালিকা হয়ত ঠিকই রয়েছে, কিন্তু তা যে সত্যি পড়ানো হত তার একান্ত প্রমাণাভাব। আইন-ই-আকবরীতে লেখা সংকল্পটি সম্ভবত পুঁথিগত হয়েই রয়েছে।

তারপর বাঙলায় এর পুরোপুরি প্রচলন ঘটার সম্ভবনাও ছিল না, কারণ আকবরের দেহান্ত হল সপ্তদশ শতকের শুরুতেই ; আর তার আগে আকবরের প্রতিপত্তি বাঙলায় কায়েমও হয়নি।

তবে এটা স্পষ্ট যে মক্তবের সঙ্গে টোলের পাঠের কোনো সংযোগ ছিল না। শ্লোকের সঙ্গে বয়েতের সম্পর্ক-স্থাপন তো দূরের কথা, মোলাকাতও কখনো হয়নি। বাইরে যা হোক, মূলগতভাবে দু দলই একই সমাজের লোক ; সবারই রক্তের মধ্যে রয়েছে শ্লোকের ধারা, রামায়ণ, মহাভারত ও গীতার বীজ। তাই এ বিচ্ছেদটা ক্রমশ মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়াল।

সপ্তদশের শুরুতে তামাকের প্রচলনের পরে অল্পকালের মধ্যে সারা দেশে উচ্চ-নীচ সকল সমাজকেই সে নেশা পেয়ে বসল, অন্য সব নেশা ছাপিয়ে। বিশেষ করে তা জমে উঠল দিল্লীতে অভিজাত মুসলমান সমাজে। খাওয়ার পরে আরামের ধূমপান ;

আলবলা ও হুঁকা দুই-ই চলত। মেয়েরা সাধারণত টানত হুঁকা। মানুচি লিখেছেন যে শেষটা এমন হয়ে দাঁড়াল যে একমাত্র দিল্লীতেই তামাকের ওপর খাজনা থেকে রাজকোষে আসতে লাগল দিন প্রতি পাঁচ হাজার টাকা! এই নেশার প্রতিরোধে জাহাঙ্গীর ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে জারি করলেন এক নিষেধাজ্ঞা, কিন্তু তা কার্যকরী হল না। নিম্ন কোটির লোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সারা বাঙালী সমাজেও এ নেশা ক্রমে ব্যাপক হয়ে দাঁড়াল।

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ব্যাপকভাবে বাঙলার চিনি রপ্তানি শুরু হয় দেশে ও বিদেশে; এরূপ রপ্তানি অব্যাহত থাকে একশ বছর। এতে বাঙালী সাধারণেরও, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের, সমৃদ্ধি বেড়ে যায়।

ভদ্র পোশাকের জন্য বিদেশী পর্যটকেরাও সেকালে বাঙালীর তারিফ করেছেন। বাঙালীর শার্ট ছিল লম্বা ধরনের, এখন তা-ই পাঞ্জাবীরূপে সর্বত্র প্রচলিত। উচ্চতর সমাজে পার্শী ও ভারতীয় মিশ্র রীতিতে প্রচলিত ছিল আঁটোসাটো ট্রাউজার; তার ওপরে শার্ট।

ধনীরা পরত দরবারী পোশাক, ট্রাউজার ও লম্বা কোট; পাগড়ি পরত সকল শ্রেণীর হিন্দুই। মুসলমানেরাও পাগড়ি পরত, তবে হিন্দুর পাগড়ি ছিল রঙিন কাপড়ের, উঁচু ধরনের; মুসলমানের পাগড়ি ছিল সাদা কাপড়ের, গোল ধরনের। পাগড়িহীন মানুষ সেকালে অশ্রদ্ধেয় ছিল। হিন্দু ধরনের পাগড়ি মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। মোজার উল্লেখ অবশ্য রয়েছে, কিন্তু মোজা কেউ একটা বড় পরত না। পরত জুতো, ধাঁজে ছিল যা তুর্কী অর্থাৎ ফিতাহীন, সরুডগা আর নিচু গোড়ালি-ওয়ালা। হিন্দু ও মুসলমান দুই-ই হাঁটু পর্যন্ত ঝোলান লম্বা কোট ব্যবহার করত; তা তৈরি হত নানারূপ কাপড়ের। বোতামের জায়গায় ছিল সুতার ব্যবহার; সে সুতা হিন্দুরা বাঁধত বাঁ দিকে, মুসলমানেরা ডান দিকে।

আইন-ই-আকবরীর নজিরে ঘোড়াঘাটে অনেক পাটের কাপড় তৈরি হত। আকবরের আমল থেকেই পাটের মোটামুটি চাষ শুরু হয় রংপুরে। পাট অবশ্য বাঙলায় নবাগত নয়; প্রাকৃত পৈঙ্গলে বাঙালীর প্রিয় নালিতা শাকের উল্লেখ রয়েছে। এই পাটের কাপড় পরত সব সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ, উনবিংশ শতকের প্রথমপাদ পর্যন্ত। সুতার তৈরি হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো 'ল্যাংগোটা' পরত অনেকে, তা থাকত কোমরে বাঁধা, নাভির নিচে।

বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান নারীরা পরত শাড়ি ও আঙ্গিয়া; দিল্লীর নজিরে মুসলমানের অন্দরে ঘাগরা, ব্রিচেজ ও শার্ট প্রচলিত হতে শুরু করেছিল। কিন্তু দু দলই মাথায় বাঁধত সিল্ক বা মিহি কাপড়ের দোপাট্টা অর্থাৎ মাঝে লম্বালম্বি সেলাই দেওয়া আবরণ। উভয় অভিজাত সম্প্রদায়ের নারীরা পরত নাগরা জাতীয় জুতো। সাধারণ লোক হাঁটত খালি পায়ে।

সপ্তদশের প্রথম পাদের ফরাসী পর্যটক পাইরার্ড লিখেছেন, কেশ ও দেহ-পরিচর্যার জন্য বহু প্রকারের সুগন্ধি তেল বাঙলা থেকে দেশের সর্বত্র চালান যেত। নারিকেল তেলের প্রচলন ছিল দরিদ্রের দলে। হিন্দুরা তিসির তেলও ব্যবহার করত।

সাবান কথাটা পোর্তুগীজ Sabao ও ফরাসী Savon-গন্ধী, কিন্তু আরবী, পার্শী ও তুর্কী ভাষায়ও সাবুন বা সাবান রয়েছে। কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষে গাত্রমার্জক বা মার্জনলেপ ছিল না ভাবলে ভুল করা হবে। তার প্রচলন ঘটেছিল বহুকাল পূর্বেই। আইন-ই-আকবরীতে 'ঘাসুল' বা একপ্রকার তরল মার্জনলেপের উল্লেখ রয়েছে। চন্দনের ব্যবহারও ছিল ব্যাপক, প্রলেপ হিসাবে।

এখন যেমন, সেকালেও তেমনি দরিদ্রেরা দেহ মার্জনা করত রিঠা, কলাগাছের ক্ষার, বা আমলকী দিয়ে। আর রং ফর্সা করতে ব্যবহার করত তেঁতুলের চূর্ণ, চন্দন ও কাঁচাহলুদ।

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি হতে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে

কাঁচের আরশি আসতে শুরু হয়, কিন্তু এদেশেও তার আগে থেকেই কাঁচ তৈরি হত। কাঁচের আরশি যখন পর্যাপ্ত ছিল না তখন লোকে ব্যবহার করত পিতলের আরশি, যার নমুনা এখনো বাঙালী সমাজের বরবেশে পাওয়া যাবে।

মেহেদি পাতার লাল রংএ সেকালে রঙিন হত মেয়েদের নখ ও হাতের পাতা।

নানাপ্রকার অলঙ্কার যে কেবল নারীর সৌন্দর্যবর্ধক ও ঐশ্বর্য-জ্ঞাপক হিসাবেই ব্যবহৃত হত তা নয়, এর মধ্যে নিহিত ছিল ধর্মসংস্কারও। হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠানে সোনা ছিল অপরিহার্য, আর মুসলমানেরা মণিমাণিক্যের জোরে অশুভ গ্রহের নজর এড়াত। কিন্তু এখনও যেমন, উভয় দলেরই ছিল অলঙ্কারগত প্রাণ। ডাচ পর্যটক লিন্সকোটেন বলেছেন, বাঙালী মেয়েদের মুক্তার প্রতি ছিল বিশেষ লোভ।

আহার্যের ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমান ছিল বিপরীতধর্মী। হিন্দুর খাদ্য সাধারণত নিরামিষ-ঘেঁষা, মুসলমানের আমিষ। এক পঞ্জাব ও বাঙলার ব্রাহ্মণেরাও মাছমাংস খেত। খিচুড়ি ছিল সাধারণ মানুষের জনপ্রিয় খাদ্য।

সপ্তদশের ফরাসী পর্যটক লে ব্লাঙ্ক বলেছেন, বাঙালীদের মধ্যে সংরক্ষিত মিষ্টি ও ফল, টাটকা মিষ্টি ও মসলার প্রচলন খুবই বেশি। মিষ্টির কথাটা খুবই সত্য, তবে বাঙালীর খাদ্যতালিকায় মিষ্টির এই ক্রমবর্ধমান বরাদ্দ মোটামুটি আধুনিক বলেই মুরল্যাণ্ড অনুমান করেছেন। এ অনুমান সত্য বলেই মনে হয়, কারণ পূর্ব শতকের খাদ্যতালিকায় মিষ্টির প্রাধান্য নেই। পোর্তুগীজদের বাঙলায় পদার্পণের কিছু পরেই তা বেড়ে ওঠে, বিশেষত রসাল মিষ্টির দিকটা অর্থাৎ রসগোল্লা, পান্তুয়া ইত্যাদি। একদিকে 'নেড়ানেড়ী'র নিরামিষ আহারে 'মালপো' ভোগের প্রাবল্য, অন্যদিকে পোর্তুগীজ-দের নানারকম মিষ্টি তৈরির কৌশল, দুটি মিলে হয়ত রসাল মিষ্টির

ছড়াছড়ি শুরু হয়; বাড়ির তৈরি পায়েস, সন্দেশ, সীতামিশ্রি, দুধলাউ প্রভৃতি হার মানে।

এ কালেরই পর্যটক স্টেভরিনাস লিখেছেন, মুসলমানেরা ও বাঙালীরা খেমটা ওয়ালী ও বাইনাচের দারুণ পক্ষপাতী। মানুচি বলেন, সাধারণত মুসলমান মেয়েরাই এ পেশা গ্রহণ করতেন; কিছু কিছু হিন্দু মেয়েকেও এসব নাচ-গানের আসরে দেখা যেত বটে।

বহুপ্রাচীন কাল থেকেই নদীমাতৃক বাঙলায় প্রশস্ত ছিল জলপথ, বিশেষত দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে। এজন্য নৌকাও তৈরি হত নানা রকমের। ক্রমে দেশের অভ্যন্তরে কিছু কিছু রাস্তা তৈরি হলে প্রচলন হল গরুর গাড়ীর ও ঘোড়সওয়ারের—বিশেষ করে শেরশাহী আমলে। বাঙলার হাতির বেশ কদর ছিল দেশজোড়া। দিল্লীর চতুর্দশ শতকের সুলতান, গীয়াসুদ্দীন তোগলক, এই বাঙলার হাতির শোভাযাত্রার আড়ালে, সুলতানজাদা জোন খাঁর ষড়যন্ত্রের ফলে, তাঁবু চাপা পড়ে মারা যান। বাঙলার সেনাবাহিনীরও বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে থাকত হাতি।

হাতিতে হাওদা চাপিয়ে রাজরাজড়া যাতায়াতও করতেন। এর সাথে ক্রমে যুক্ত হল এসে মনুষ্য-বাহিত ডোলা (দোলা), এরই ছোটবোন ডুলি ও পালকি—যাদের চল মোটামুটি অব্যাহত ছিল প্রায় বিংশ শতকের কিছুটা কাল পর্যন্ত। আকবরের কালে এল ঘোড়ায় টানা এক্কা ও গাড়ি; প্রথমটি দেশী ধাঁজে দ্বিতীয়টি বিদেশী ধাঁজে তৈরী। টাঙ্গা বোধহয় এ দুটির মিশ্ররূপ।

মুসলমান মেয়েদের পিতার সম্পত্তিতে অধিকার ছিল পুত্রের অর্ধেক: সেটা সে ভোগদখলও করতে পারত বিবাহের পরেও। হিন্দু মেয়েদের এ অধিকার ছিল না; আর্থনীতিক ব্যাপারে তাই দ্বিতীয় দলটি প্রথম দলটি থেকে ছিল কমজোর।

মোগলদের আমলে, উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের

বহুলাংশ তাদের আয়ত্তে আসার পরে, গৌড়বঙ্গকে শুধু বাঙলা বলে পরিচয় পত্র দেওয়া হল।

বরেন্দ্রের উদয়নাচার্য ও বঙ্গের দেবীবর ঘটকের নূতন ব্যবস্থার পরে বাঙলার সর্বত্র ঘটকদের সামাজিক প্রতিপত্তি খুবই বেড়ে উঠল। উচ্চকোটি হিন্দুর যে-কোনো বিবাহ-প্রস্তাবে তাঁদের অনুমতি ও বিরোধিতার উপর নির্ভর করত বরকনের ও তাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠা; এমন কি তাঁরা বিমুখ হলে কন্যার বিবাহ দেওয়া ও কুল রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে এ কতদূর সত্য তা বলা সম্ভবপর নয়, তবু দুর্গাচন্দ্র সান্যালের লেখা থেকে এই চিত্রটি তুলে ধরছি।

"বিবাহের কথাবার্তা ঘটকদের একচেটিয়া। সোনার বেণে, শুঁড়ীদের মধ্যে আগাগোড়াই বিবাহের চুক্তির মধ্যে যৌতুক, অলঙ্কার, নগদ টাকার/সম্পত্তি দিবার কথা থাকে, ব্রাহ্মণের মধ্যে কোথাও থাকিত না। পণ (পণ-কুলজ্ঞেরা কুলমর্যাদা বিবেচনা করিয়া নির্দিষ্ট করিতেন সাধারণত ১০১ টাকা), ভোজন এবং বারবর্দারী (যাতায়াতের ব্যয় এক যোজনের বেশি হইলে, নচেৎ নয়) এই তিনটি পাত্রপক্ষের প্রাপ্য। যৌতুক ও অলঙ্কার যাহা খুশী। সুসজ্জিত পাত্রকে দেওয়া হইত—লাল চেলীর ধুতী চাদর। কাণে সোণার কুণ্ডল, গলায় সোণায় গাঁথা রুদ্রাক্ষ মালা। দক্ষিণ হস্তে সোণার ইষ্ট কবচ ও রূপার বলয় ও সোণার অঙ্গুরি। বাম হস্তে সোণার তাগা ও রূপার বলয়। কোমরে রূপার বিছা, পায়ে রূপার খাড়ুয়া ও শিশুকাঠের খড়ম। কপালে চুয়া (অর্থাৎ ধুনা ইত্যাদি চুয়াইয়া তৈরী সুগন্ধ নির্যাস) ও চন্দনের ফোঁটা।"

এই ছিল মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণের বরবেশ বা উত্তম পোশাক।

সেকালের বিত্তশালী হিন্দুদের বাড়ির দেয়ালগুলি সম্ভবত চুনকাম করা ও চিত্রবিচিত্র থাকত। বাঙলার ও গুজরাটের বাড়িগুলি সম্পর্কে কিছু কিছু সন্ধান মিলেছে। বাঙালীর বাড়ির

একদিকে থাকত একটি জলাশয়, ফলের বাগান থাকত জুড়ে একদিক, তৃতীয় দিকে থাকত বাঁশের ঝাড় আর একদিক থাকত খোলা।

বাড়ির বৈঠকখানা সজ্জিত হত হিন্দু ও ইরাণী মিশ্ররীতিতে। একে বলা হত 'মোগলাই' বৈঠকখানা।

"দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা, পূর্ব্বদ্বারী তার প্রজা
পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই, উত্তরদ্বারীর খাজনা নাই॥"

(নিকৃষ্টতার জন্য)

বাঙলার এ প্রবাদটি কতদূর সত্য জানা নেই, তবে মুসলমানের বৈঠকখানা প্রায়ই থাকত পশ্চিমমুখী, কদাচিৎ দক্ষিণমুখী ; হিন্দুর পূর্বমুখী। বাঙলার রাজরাজড়ার বৈঠকখানার চিত্রটি তুলে ধরছি—

"বৈঠকখানার মধ্যস্থলে পশ্চাতের দেউলে লাগা এক তক্তপোষে গদীর উপর আসন পাতা রাজার নিজ আসন। তাহার পশ্চাতে তাকিয়া, দুই পাশে বালিশ। আসনের সম্মুখে এক হাতবাক্স, দোয়াত, কলমদান ও সহী মোহর। তাহার দক্ষিণ দিকে একখানা শতরঞ্চ ও চাদর পাতা তক্তপোষ, কয়েকটা মোড়া ও জলচৌকী ; তক্তপোষ ও মোড়াতে সম্ভ্রান্ত লোকের বসিবার স্থান। রাজার বামদিকে মেজের উপর চাটাই পাতা (পাড়া)। তাহার উপর শতরঞ্চ ও চাদর পাড়া মুন্‌সীখানা। তাহাতে আমলারা বসিয়া লেখাপড়া করিত। মুন্‌সীখানার দক্ষিণ দিকে রাজার বামপার্শ্বে গদী, চাদর ও তাকিয়া সংযুক্ত একটি আসন দেওয়ানের জন্য থাকিত। সাধারণ লোক বসিবার জন্য মুন্‌সীখানার সম্মুখে কয়েকটা শপ (মাদুর) থাকিত।"

এই হল সদর বৈঠকখানা : এখানে যেতে হলে পরতে হত দরবারী পোশাক। এ ছাড়া থাকত 'বালাখানা' ; ওপরতলার ঘর নয়, গুপ্ত পরামর্শের জন্য এক ছোট দরবার। এখানে যেতে হত অনুমতি নিয়ে ; বালাখানায় দরবারী পোশাকের দরকার হত না।

ষোড়শে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের কথা শুরু হয়েছে। এঁর

কাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে ; তবে সপ্তদশকেও তিনি জীবিত ছিলেন বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা দলে ভারী। এঁর লেখা 'তন্ত্রসার' প্রামাণিক পুঁথি, বাঙলায় সর্বাপেক্ষা মান্য ও বিশদ তন্ত্রের বই। বাঙলার ঘরে ঘরে পূজিত যে কালীমূর্তি তা যে এঁরই কল্পনাপ্রসূত এ সম্পর্কে কোনো মতদ্বৈধ নেই। সে কল্পনার মূল দৈবী প্রেরণা। 'তন্ত্রসারে' রয়েছে তান্ত্রিক দীক্ষা, পূজা, কুলাচার ও যন্ত্রের (বা দেবীর গূঢ় প্রতিরূপ) কথা। বাঙলায় প্রচলিত সমস্ত তান্ত্রিক কার্যই তন্ত্রসার মতে করা হয়।

এখানে 'যন্ত্রের' কথা একটু বিশদ করে বলা যাক। যোগিনী তন্ত্রের মতে দেবীকে হয় প্রতিমাকারে, নয় মণ্ডল বা যন্ত্রাকারে পূজা করতে হয়। তবে মণ্ডলে ও যন্ত্রে একটু প্রভেদ রয়েছে। এই মণ্ডল আঁকা হয় সাধারণত নানা রং দিয়ে। মণ্ডলে ও যন্ত্রে প্রভেদটুকু এই যে মণ্ডলের প্রতীকে যে-কোনো দেবতাপূজাই চলে কিন্তু যন্ত্র কোনো বিশেষ দেবতার প্রতীক।

আগমবাগীশ ছাড়াও বাঙলায় আরো যে কজন তন্ত্রশাস্ত্রের লেখক রয়েছেন তাঁদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের পূর্ণানন্দ পরমহংস, শঙ্কর আগমাচার্য ও পশ্চিমবঙ্গের রঘুনাথ তর্কবাগীশ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এঁরা সবাই ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকের লোক।

বাঙলায় কালীপূজা হয় বহুনামে ও রূপে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল 'দক্ষিণাকালী'। দক্ষিণাকালী-মূর্তি চতুর্ভুজ ; বাম হস্তদুটির একটিতে একটি সদ্য ছিন্নমুণ্ড, অন্যটিতে খড়্গ ; দক্ষিণ হস্ত-দুটির একটিতে 'বর' ও অন্যটিতে 'অভয়ের' সংকেত বা ভঙ্গি।

নরমুণ্ডমালা ও ছিন্নহস্তের তৈরী মেখলা এঁর ভূষণ। এঁর দাঁত বেরিয়ে আছে, কশ বেয়ে রক্ত ঝরছে, ত্রিনয়নে নবীন সূর্যের জ্যোতি। মুখে বীভৎসতা, বর্ণে কৃষ্ণমেঘতুল্য। পীনপয়োধরা, শ্মশানচারিণী দেবী, নগ্না ; চরণতলে মৃত শিবদেহ, চতুর্দিকে ভয়ঙ্কর ও চিৎকার-রত শৃগালীর দল।

সিদ্ধকালী, ভদ্রকালী ও গুহ্যকালীরূপে ইনি শীর্ণা, ক্ষুধার প্রতি-মূর্তি। এর পর রয়েছে শ্মশানকালী, রক্ষাকালী ও মহাকালী। মহামারীর প্রশমনে শ্মশানকালী ও রক্ষাকালীর পূজা হয়।

দেওয়ালী, মাঘের কৃষ্ণা চতুর্দশী (রটন্তী) ও জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে (ফলাহারী) বাঙলায় বাৎসরিক কালীপূজা হয়; এর মধ্যে দেওয়ালীর পূজা সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। পূজা হয় সাধারণত মধ্যরাত্রে এবং ইনি ছাগ মেষ ও মহিষ-বলিপ্রিয়া। শনি ও মঙ্গলবারে এঁর দর্শন অতি শুভ বলে বিবেচিত। বলির মুণ্ডচ্ছেদ করতে হয় এক কোপে।

আওরংজেবের আমলে বাঙলার প্রথম শাসক হয়ে এলেন মীরজুমলা, পরে শায়েস্তা খাঁ, পরে আওরংজেবের নাতি আজিম-উস্-সান। মাঝখানে এসেছিলেন অপদার্থ খান্-ই-জাহান্, যিনি এক বছরের মধ্যে দু কোটি টাকা চুরি করে বাঙলা প্রবাদে কুখ্যাত হয়ে রয়েছেন 'নবাব খাঞ্জা খাঁ' নামে।

শায়েস্তা খাঁরও ছিল চুরির অপবাদ; তার ওপর তিনি ছিলেন প্রজাপীড়নে ও বেনামী একচেটিয়া ব্যবসায়ে দক্ষ। তাঁর দৈনিক আয় ছিল দু লাখ আর ব্যয় তার অর্ধেক। তাই প্রথম তের বছর নবাবীতে তাঁর অর্থসঞ্চয় হয়েছিল আটত্রিশ কোটি টাকা বলে প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের অভিমত। তাঁর আমলে প্রজার অবস্থা তাই সহজেই অনুমেয়। তবে নিম্নবঙ্গে জলদস্যুর ভয় অনেকটা তিনি দূর করতে পেরেছিলেন, সম্ভবত যতটা না শৌর্যের দ্বারা তার অনেক বেশি অর্থের দ্বারা অর্থাৎ পোর্তুগীজকে ঘুষ দিয়ে।

মীরজুমলা থেকে মুর্শীদকুলী খাঁ পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৬৬০ থেকে ১৭২৭ পর্যন্ত সাতষট্টি বছর নবাবের দল সবাই ছিলেন 'ক্ষত্রিয়-বৈশ্য'। তাদের পেশা ছিল নবাবী, কিন্তু নেশা ছিল গোপন ব্যবসা। পেশার চেয়ে নেশার তাকতই বেশি, তাই বাঙলার শোষণ একালে চলল অবাধে।

এই পটভূমিকায় পাশ্চাত্ত্য বণিকদের কথা এসে পড়ছে। বাঙলায় প্রথম অভ্যাগত পোর্তুগীজ ; এদের প্রথম পদার্পণ হয়েছিল চাটগাঁয়, পরে ঘাঁটি হল দেশের অভ্যন্তরে গঙ্গাতীরে হুগলীতে। এর আগে বাঙলার সাতগাঁ ছিল প্রসিদ্ধ বন্দর, কিন্তু ষোড়শ শতকের শেষার্ধ থেকে সরস্বতী নদীতে চড়া পড়ে সাতগাঁ গেল রসাতলে।

কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে হুগলীতে বসেও পোর্তুগীজ তাদের স্বভাব ভুলল না ; যথারীতি দেশী বণিকদের ওপর দৌরাত্ম্য শুরু করল। দৌরাত্ম্য যখন চরমে পৌঁছল, আর তা দিল্লীর বাদশা সাজাহানের কানে উঠল, তিনি বাঙলার শাসক কাশিম আলী খাঁকে পোর্তুগীজ বিতাড়নের আদেশ দিলেন। তিন মাসের চেষ্টার ফলে হুগলী দখল হল, পরে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে হুগলী হল বাঙলার গঙ্গাতীরের বাদশাহী সদর বন্দর। চাঁটগা তখনো মোগলের দখলে আসেনি ; এসেছে শায়েস্তা খাঁর আমলে।

দ্বিতীয় অভ্যাগতের দল ওলন্দাজ। এরা এসে বসল চুঁচুড়া ও কাশিমবাজারে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে।

তৃতীয় ইংরেজ ; এরাও এসে বসল প্রথম হুগলীতে পরে কাশিম-বাজারে প্রায় ঐ একই কালে।

চতুর্থ ফরাসী : এরা ক্রমে ক্রমে ঘাঁটি বাঁধল ঢাকা, চন্দননগর ও কাশিমবাজারে প্রায় সপ্তদশ শতকের শেষপাদে।

ছোটখাটো যারা এসেছিল, তাদের উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

নবাবদের গোপন ব্যবসায়ে পরম সহযোগিতা করল ধূর্ত ইংরেজ ; অন্য কারো সাথে এদের বনিবনাও হল না।

বাঙলা কখনো একান্তভাবে জমিনির্ভর ছিল না ; দেশের ধনভাণ্ডার পূর্ণ হত প্রতিটি শতকেই কমবেশি আংশিক শিল্পজাত মাল সরবরাহ করে।

বাঙলায় জাত প্রধান শস্য ছিল ধান এবং শিল্পজাত দ্রব্য ছিল

সুতী ও রেশমের কাপড় ও চিনি। দেশের পুরোপুরি চাহিদা মিটিয়েও এসব জিনিস ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে ও বিদেশে চালান হত। ধান ও তুলা জন্মাত বাঙলার সর্বত্র, রেশম ও চিনি প্রধানত উত্তর বঙ্গে।

বলা বাহুল্য, এসব মাল নিয়েই নবাব ও ইংরেজ কোম্পানির কারবার চলত দেশে ও বিদেশে। নবাবদের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে, অত্যাচারের ভয়ে চাষী ও শিল্পীরা বিদেশী কোম্পানিকে মাল সরবরাহ করত জলের দরে, আর নবাব ও ইংরেজদের যৌথ-প্রতিষ্ঠান তা দেশে বিদেশে বিক্রি করে বহুগুণ লাভ করত। সোরা ছিল নবাবদের একচেটিয়া সওদা-ই-খাস। এতে লাভ হত অনেক। শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে ইংরেজের চেয়ে পোর্তুগীজদের ভাব ছিল বেশি। এর ফল হল এই যে বাঙলার চাষী ও শিল্পীরা ক্রমে দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হতে লাগল, আর পূর্বে যেসব মানুষ কিছু কিছু দালালি করে দিন গুজরান করত তারা তাদের পেশা ছেড়ে, পরমুখাপেক্ষী হয়ে নেংটি-ওয়ালাদের দলে ভিড় বাড়াতে লাগল। রক্ষক যেখানে ভক্ষক সেখানে এই পরিণতি ছিল অবশ্যম্ভাবী। পরবর্তী কালে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংরেজ 'ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি' তো বটেই, ইংরেজ গভর্নমেণ্টও এই নবাবী তালিমই অনুসরণ করেছে।

বস্তুত ধনী ও দরিদ্রের বাসস্থানের কথা বলতে গিয়ে অনেকেই বলেছেন, সেকালে দরিদ্রের কুটির ছিল যেমন শ্রীহীন ও দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি, ধনীর আবাস ছিল তেমনি সুশোভন ও সেকালের ঐশ্বর্য-জ্ঞাপক নানা আসবাবে ভরা। আধুনিক কালেও দুয়ের মধ্যে যে বিরাট অসংগতি রয়েছে, তার চেয়েও বেশি ছিল সেকালে।

একাল থেকেই মাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সন্ধান পাওয়া যায় সমসাময়িক সাহিত্যে ও বিদেশী পর্যটকের লেখায়, যেমন ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ারের। তা-ও শুধু বাঙলায়, ভারতবর্ষের অন্য কোনো অঞ্চলে নয়। এরা প্রধানত আইনজীবী ও বিচারালয়ের কর্মী।

ধনী ও দরিদ্রের মধ্যবর্তী হিসাবে এদের জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে আধুনিককালের মধ্যবিত্তের মানের বিশেষ কোনো অসংগতি নেই।

যদিও ফসলের বদলে অর্থ দিয়ে রাজস্ব মেটানোর প্রথা বাঙলায় প্রথম প্রচলিত হয়েছিল শেরসাহী আমলে, আকবরের কালেই অর্থাৎ সপ্তদশের শুরু থেকেই তা বিশেষ করে চালু হল। তারপর টোডরমলের ব্যবস্থায় রাজস্ব নির্ধারিত হত যতটা জমিতে বীজ ছড়ানো হল তার ওপর, যতটা ফসল গৃহজাত হল তার ওপর নয়। ফলে চাষীর ঝুঁকি গেল অনেক বেড়ে।

কিন্তু সময়মত ঋণ তাকে কে দেবে? পূর্বে দিত দেশের স্বর্ণবণিকেরা। কিন্তু তাদের উৎখাত করেছিলেন বল্লাল সেন, দ্বাদশ শতকে। সেকাল থেকেই গুজরাটী ও রাজস্থানী কুসীদজীবীরা বাঙলায় এসে তাদের স্থায়ী আসন দখল করেছিল; এবার তাদের ব্যবসা ক্রমশ প্রসারিত হতে লাগল। কিন্তু গ্রামে গ্রামে জমিদার, তালুকদারের ১৭৬৫ অবধি রায়তকে টাকাভি ঋণ দিত। তাই কুসীদজীবীদের প্রথম কাজ-কারবার চলল উচ্চকোটি সমাজে।

ব্যাপারটা ঘটল ঠিক ইংল্যাণ্ডে যা ঘটেছিল তার বিপরীত। সেদেশেও স্বর্ণকারেরাই দেশী লোকের ঋণের চাহিদা মেটাত, এমন কি রাজারও। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বিদেশী ইহুদীরা। দেশের স্বার্থে, আর্থনীতিক কাঠামো রক্ষা করতে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম এডোয়ার্ড ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে দেশ থেকে ইহুদী বিতাড়ন করলেন। ইংল্যাণ্ড বেঁচে গেল। আর বাঙলার রাজা বল্লাল সেন এর পূর্বশতকে দেশী স্বর্ণকারদের সঙ্গে ঝগড়া করে, দেশের আর্থনীতিক কাঠামোতে বসালেন বিদেশী গুজরাটী ও রাজস্থানী কুসীদজীবীদের। ফলে বাঙলার আর্থনীতিক অবস্থা হল ঘায়েল, এবং পরবর্তী কালে রাজস্থানী 'জগৎশেঠ' এসে বাঙলার অর্থনীতি তো বটেই রাজনীতি-তরণীরও হাল ধরে বসতে পারলেন। বাঙালী সমাজ এতে ক্রমশ দুর্বল হতে লাগল।

আকবর ত্রিশ ড্যামের ওজন এক সের বলে ধার্য করে দিয়েছিলেন : 'ড্যাম' ছিল তাঁর আমলে প্রধান তামার মুদ্রা। চল্লিশ সেরেই হত এক মন : টনের হিসাব পারে সাতাশ মনই ধরা হত। এক টাকায় ধরা হত চল্লিশ ড্যাম : আটটি 'ডামরি'তে হত একটি ড্যাম। কিন্তু গৃহস্থের দৈনন্দিন কেনাবেচায় এর চেয়ে অনেক কম মানের মুদ্রার দরকার পড়ত ; এর চেয়ে কম মানের ধাতব মুদ্রা ছিল না, শুধু হিসাবের পাতায় এক ড্যামকে পঁচিশ ভাগে ভাগ করে এক ভাগকে বলা হত 'জিতেল'। কিন্তু বাস্তব বিনিময়ে ব্যবহার চলত 'কড়ি'র : সাধারণত পাঁচ হাজার একশ কুড়ি 'কড়ি'র মূল্য ধরা হত এক টাকা। সর্বকালে ও সকল বাজারে যে কড়ির মূল্য একই থাকত, তা বলা চলে না। সপ্তদশ শতকেও হাটে বাজারে কিছু কিছু ধাতব মুদ্রা ছিল। তা ক্রমে ক্রমে কমে পরবর্তী শতকে দেখা দিল শুধু কড়ি, কড়ি আর কড়ি! কড়ি আসত বেশির ভাগই ভারত মহাসাগরের মলডাইভ দ্বীপ থেকে।

তখনো ভারতবর্ষের কয়লার আবিষ্কার হয়নি। জ্বালানি হিসাবে ধনীর ঘরে ব্যবহার হত কাঠ। দরিদ্রেরা পুড়োত শুকনো গাছের পাতা, খড় ইত্যাদি—এখনো তারা যা পোড়ায়। ঘুঁটে চিরদিনই পুড়ত, গোবরও হাসত ; তবে ক্ষণিকের জন্য, কারণ অন্য কাজে অর্থাৎ জমির সার হিসাবে তার ভূমিকা তখনো যা ছিল এখনো তা-ই রয়েছে।

চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালানর বহুপ্রাচীন প্রথা তখনো বজায় ছিল। সে আগুন রক্ষা করা হত তুষের পাত্রে। এর পর, 'পাটখড়ি'র (পাট গাছের আঁশ তুলে নেবার পর যে কঙ্কাল বজায় থাকে) টুকরার আগায় গন্ধক মাখিয়ে জ্বালানো হত প্রদীপ, ধরানো হত উনান।

আলোর ব্যবস্থা হত রেড়ির তেলের প্রদীপে। ধনীদের গৃহে থাকত ধাতব পিলসুজ ও তার ওপর ঠোঁটওয়ালা বাটি, তাতে জ্বলত সলতে। দরিদ্রের ঘরের পিলসুজ ও তেলের আধার দুই-ই মাটির তৈরী। তবে সাধারণত দরিদ্রের আলোর বড় একটা প্রয়োজন

হত না। পথ চলতে হত মশাল জ্বালিয়ে। কেরোসিন তখনো দেখা দিয়ে বাজার মাৎ করেনি। ঝাড়লণ্ঠন এসেছে কিছু পরে; সেটা বিদেশীদের দান।

বাঙলার সমুদ্রতটে লবণ তৈরি হত বটে তবে সৈন্ধব লবণ আসত সুদূর পঞ্জাবের সম্বর হ্রদ থেকে—তা-ই একে বলা হত সৈন্ধব লবণ; কিছু কিছু আসত সেথাকার সমুদ্রের তীর থেকেও, সবই অবশ্য জলপথে। ফলে লবণ, ছিল বড় মহার্ঘ বস্তু। কারো কারো মতে, বাঙলার খাদ্যশস্যের প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি ছিল তার মূল্য। 'সৈন্ধব লবণ' হত কেলাসিত বা crystallized; সমুদ্রজাত লবণকে বলা হত করকচ। প্রথমটি ছিল সাত্ত্বিক আহারের অংগ। ব্রাহ্মণ বিধবারা ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরা সাধারণত করকচ খেতেন না। বাঙলার করকচ বিহারের পুবে যেত না।

সপ্তদশ শতকের পুরোপুরি হিসাব-নিকাশ করেই বিশেষ করে সামাজিক দিক থেকে একে অবক্ষয়ের কাল বলা হয়েছে। সে অবক্ষয়ের বীজ ছিল পূর্বের শতকে।

প্রথম, মহাপ্রভুর বাণীর অপপ্রচার। যে বৈষ্ণবী শক্তির সঞ্চার তিনি বাঙালী সমাজদেহে করতে চেয়েছিলেন তা গ্রহণ করার যোগ্যতা সে মৃতদেহের ছিল না। ফলে, অচিরেই সে বাণী তামসিক ভক্তিবাদে পরিণত হয়ে একদিকে যেমন সমগ্র জাতিকে করল কর্মবিমুখ, অন্য দিকে তেমনি সমাজের অংশ-বিশেষকে করল প্রবল শৃঙ্গার-ধর্মী ও দূষিত। পরবর্তী দু শতকেও সমাজের সে মালিন্য সংশোধিত হল না।

দ্বিতীয়, সপ্তদশ শতকের মধ্য থেকে অষ্টাদশের প্রথম পাদ পর্যন্ত বাঙলার শাসকেরা করতেন বিদেশীদের সহায়তায় গোপন ব্যবসা। ফলে দেশের চাষী ও ব্যবসায়ী এ দু দলই ক্রমশ দরিদ্র হতে লাগল। সমাজের রক্তক্ষয় শুরু হল।

তৃতীয়, রাজস্বের দিকে একটা মূলগত পরিবর্তনের ব্যাপক প্রসারের ফলে বাঙলার চাষী-সম্প্রদায় হল ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিদেশী কুসীদজীবীরা এসে ক্রমশ বাঙালী সমাজের তথা জাতির রক্ত-মোক্ষণে যোগ দেবার সুবিধা পেল।

মন্বন্তরের কাল

(অষ্টাদশ শতক)

[নয়]

মুর্শীদ কুলী খাঁ (১৭১৭—১৭২৭)

আলীবর্দী খাঁ (১৭৪০—১৭৫৬)

সিরাজদ্দৌল্লা (১৭৫৬—১৭৫৭)

ইংরেজ

পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭, ২৩শে জুন।

মন্বন্তর ১৭৭০

পূর্ববর্তী শতকে মাধুর্য-লোভী বামাপন্থী খোল-করতাল-মন্দিরা-একতারা-সর্বস্ব সহজিয়া বৈষ্ণবের কথা বলা হয়েছে। এ গোষ্ঠীর যে-সকল দলের সম্পর্কে সাধারণের ধারণা কিছু অস্পষ্ট তাদের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

এদের মধ্যে 'স্পষ্টদায়কেরা' মুর্শিদাবাদের (সৈদাবাদ) রূপরাম কবিরাজের শিষ্য। গুরুর দেবত্বে এরা বিশ্বাসী নয়; স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে চেলারা সবাই একই আখড়ায় বাস করে ভাই-বোনের মত।

'কর্তাভজা'দের আদিম প্রতিষ্ঠাতা নদীয়ার আউলচাঁদ। পরে চাকদহের (নদীয়া) সদ্‌গোপ রামশরণ পাল এ দলের কর্তারূপে দেখা দেয়। দু জনেই অষ্টাদশ শতকের। এদের মধ্যে ইসলামী প্রভাব বর্তমান, কারণ, এরা শুক্রবারকে পবিত্র বলে মানে, জাতিভেদ এমন কি, হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদও মানে না, আর ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তির কথা বলে।

'বলরামাই' দলের প্রতিষ্ঠাতা বলরাম হরি; নদীয়া (মেহেরপুরের) অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। অমূর্ত সাধনা এদের লক্ষ্য এবং এরা জাতিভেদের বিরোধী।

'সখীভাব বৈষ্ণব' দলের প্রধান কেন্দ্র মালদহের জঙ্গলীতলা। এরা সবাই, স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষ স্ত্রীবেশ পরিধান করে, স্ত্রীনাম গ্রহণ করে, নৃত্য করে ধর্মপ্রচার করে, কখনো কখনো নানা বন্য গোষ্ঠীর গুরুগিরি করে। রাজস্থানের জয়পুরে ও বারাণসী ধামে এদের শাখা রয়েছে।

বলা বাহুল্য, সকল সহজিয়া বৈষ্ণবই পরকীয়া চর্চায় মশগুল। অষ্টাদশের দ্বিতীয় পাদে জয়পুরের মহারাজা এদের এই নিতান্ত বৈষ্ণব-বিরোধী মত খণ্ডনের জন্য জনকয়েক বৈষ্ণব পণ্ডিত বাঙলায় পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে মাধুর্য-লোলুপ ভবী ভোলবার নয়: গৌড়ীয় বৈষ্ণব দল সে মতে সায় দিলেন না। আর দিলেই বা কি হত? রক্তের স্বাদ পেলে বাঘ কি কখনো তা ভোলে?

ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে এখনো সারা বাঙালী সমাজ আউল, বাউলের গানের কদর দেয়। আমাদের মতে এ সবের সত্যিকার মূল্য যাচাই হয় শুধু সামাজিক কষ্টিপাথরে। সেদিক থেকে বিচার করলে এদের গানে কি থাকে? একটা উদাসী সুর, কর্মবিমুখতা, দারিদ্র্যের প্রশস্তি আর তামসিক ভক্তিবাদ—'মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে আমি আর বাইতে পারি না' ধাজের। সমগ্র জাতি ও সমাজের পক্ষে এসব নৈরাশ্যের ও ক্লৈব্যের প্রচার অকল্যাণকর, দুর্বলতাবর্ধক। যা দুর্বল করে তা সবই পাপ, জঞ্জাল মাত্র—সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

এদের আখড়াগুলি সাধারণত কামকলার লীলাক্ষেত্র, গাঁজা-ভাং-এর আড্ডা: এদের আদর্শ কলুষিত, এরা সমাজদেহের দূষিত ফোড়া।

আওরংজেবের দেহান্ত হল অষ্টাদশের শুরুতেই ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে। সেকালে মোগল সাম্রাজ্যের ছিল একুশটি সুবা; তার মধ্যে বাঙলা একটি। সারা সাম্রাজ্য থেকে আকবরের আমলে রাজস্ব খাতে আদায় হত বছরে তের কোটি একুশ লক্ষ টাকা; তা বাড়িয়ে

বাঙলাদেশ (পূর্ণিয়া ছাড়া) - ১৭৭০
মন্বন্তরের কবলে
মন্বন্তরের তীব্রতম প্রকোপ
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি ১৮৬৯
কোচবিহার (করদমিত্র রাজ্য) ১৭৭২
পূর্ণিয়া
দিনাজপুর ১৭৬৫
রঙ্গপুর ১৭৬৫
ভাগলপুর
পাটনা (আজমগড়)
গৌড়
মালদহ ১৭৬৫
বগুড়া ১৭৬৫
ময়মনসিংহ ১৭৬৫
শ্রীহট্ট
রাজসাহী ১৭৬৫
মুর্শিদাবাদ ১৭৬৫
পাবনা ১৭৬৫
বীরভূম ১৭৬৫
কুষ্টিয়া
ঢাকা ১৭৬৫
ত্রিপুরা
পার্বত্য ত্রিপুরা ১৭৬৫
বর্ধমান ১৭৬০
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া ১৭৬০
যশোহর ১৭৬৫
ফরিদপুর ১৭৬৫
কুমিল্লা ১৭৮৯
নোয়াখালি ১৭৬৫
হুগলী ১৭৬০
কলিকাতা ১৭৫৭
খুলনা ১৭৬৫
বাখরগঞ্জ ১৭৬৫
মেদিনীপুর ১৭৬০
২৪ পরগণা ১৭৫৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৭৬০
চট্টগ্রাম ১৭৬০
ব ঙ্গো প সা গ র
A. Dutta

আওরংজেব করেছিলেন তেত্রিশ কোটি পঁচিশ লক্ষ। তাঁর কালে সর্বত্র জায়গীর (ঠিকাদারি) জমি গেল বেড়ে, আর বাদশার খালসা (খাসমহল) এল কমে। সমাজে এর প্রতিক্রিয়া কি হল তা ক্রমে ক্রমে দেখা যাবে।

আওরংজেবের দেহান্তের খবর পেয়ে নাতি আজিম-উস-সান বাঙলা থেকে গেলেন আগ্রায় ধেয়ে; তাঁর পিতা শাহ আলম আসলেন কাবুল থেকে। তারপর যথারীতি দিল্লীর তক্তের জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়াঝাঁটি মেটানোর পর শাহ আলম 'বাহাদুর শাহ' নাম নিয়ে বসলেন গদিতে।

বাহাদুর শাহের কাল থেকেই মোগল সাম্রাজ্যের বাঁধুনী সর্বত্র ভেঙ্গে গেল। আওরংজেবের প্রখ্যাত দেওয়ান মুর্শীদ কুলী খাঁ বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার মূলত সর্বেসর্বা স্বাধীন নবাব হয়ে বসলেন। কাগজে-কলমে আজিম-উস-সান সুবাদার অর্থাৎ সৈন্যাধ্যক্ষ ও শাসক থাকলেও, তিনি বহুকাল বাঙলা-ছাড়া: কাজেই সুবাদার হলেন মুর্শীদ কুলী খাঁ-ই এবং দশটি বছর বাঙলার একমাত্র কর্তা হয়েই রইলেন।

মুর্শীদ কুলী খাঁর দেহান্ত হল ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর জামাতা শুজাউদ্দীন প্রথমে সর্বময় কর্তা হলেন বাঙলা ও উড়িষ্যার, পরে বিহারেরও। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ বসলেন গদিতে। আলীবর্দী খাঁ ছিলেন শুজাউদ্দীনের প্রিয় বন্ধু—বিহারে নবাবের প্রতিভূ। সরফরাজকে হত্যা করে পিতৃবন্ধু আলীবর্দী বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার সর্বময় কর্তা হলেন ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ষোলো বছর রাজত্ব করলেন। আলীবর্দীর মৃত্যু হল ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে; গদিতে বসলেন বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লা।

তারপর পটপরিবর্তন হল দ্রুত। পলাশীর যুদ্ধ হল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে; বাঙলার সিংহাসনের কোণ চেপে বসল ইংরেজ বণিক্। তারপর চলল পুতুল নাচ; আসরে এলেন মীরজাফর, মীরকাশিম;

সঙ্গে সঙ্গে চলল ঠিকাদার ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাঙলার শোষণপর্ব। তার প্রথম ভাগের পরিসমাপ্তি ঘটল বাঙলার প্রলয়ঙ্কর 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে'। তার পরের দৃশ্যে দেখা দিল বাঙালীর অশ্রুধারায় ইংরেজ গোষ্ঠীর সারাটি ভারতবর্ষ ধৌত করার অসীম প্রচেষ্টার কাহিনী। বাঙালীর অশ্রুধারা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল ভারতবর্ষে সর্বত্র।

বাঙলায় এক মহাকল্পের সূত্রপাত হল অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে। এতে সারা বাঙালী সমাজ ও জাতি তো একেবারে বিধ্বস্ত হলই, গোটা ভারতবর্ষই বাঙলার সে দাবানলে ঝলসে গেল।

অষ্টাদশের প্রথমার্ধে বাঙলার নবাবেরা ছিল মূলত স্বাধীন। দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল না; ঘরের শান্তি বাইরে থেকে এসে কেউ বড় প্রতিবন্ধও সৃষ্টি করেনি। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রায় দশটি বছর বর্গীর হাঙ্গামা ও তার জের চলল বটে, তবে তাতে দেশের যে বিশেষ আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হল তা বলা চলে না, কারণ তার প্রকৃত পরিমাপ এখনো হয়নি। সাধারণত বর্গীরা যে রাস্তায় বাঙলায় আসত তারই আশেপাশে করত অত্যাচার—দেশের অভ্যন্তরে বড় ঢুকত না। তারপর বর্ষা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশ ছেড়ে চলে যেত; আর আসত আবার জানুয়ারী নাগাত। প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি হল উড়িষ্যা অঞ্চলটি নবাবের বেহাত হল বলে, আর বছরে বার লাখ টাকা চৌথ দিয়ে হামলার ফয়সালা করার ফলে। এর চেয়ে হয়ত পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে ব্যাপক ও ক্ষতিকর হামলা করত মগ ও পোর্তুগীজ দস্যুর দল।

অষ্টাদশ শতকের বাঙালী সমাজকে আর্থিক সংস্থা ও সংহতির দিক থেকে স্পষ্ট দুভাগে বিভক্ত করা চলে। শতকের প্রথমার্ধে দুই-ই রইল মোটামুটি স্থিতিশীল, দ্বিতীয়ার্ধে দুই-ই হল একান্ত ছিন্নভিন্ন। বাঙালী তখন থেকেই একেবারে কাঙালী হতে শুরু করল। সে ইতিহাস বড় মর্মান্তিক।

বাঙলার চাষী তখন হিন্দু ও মুসলমান দুই-ই। বেশি মুসলমান

জমিদার অর্থাৎ জমির জায়গীর ঠিকাদারেরা বেশির ভাগই হিন্দু। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা তখনো মুষ্টিমেয়। দেওয়ানী বা জমি-সংক্রান্ত কার্য ও বিচার চালাত জমির ঠিকাদারেরা: ফৌজদারি মামলার বিচার করত কাজী ও মুফ্‌তী, দ্বিতীয়টি 'অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট' বা বিনা-মাইনের বিচারক; সবই মুসলমান। সৈন্যদল ভরাত মুসলমানে: আইন আদালতেও উকিল (বকীল)-দের মধ্যে মুসলমানের প্রাধান্য। রাজস্ব বিভাগে, স্থল ও নৌসৈন্য-বিভাগের মহাফেজখানার দপ্তরে কিছু কিছু হিন্দু স্থান পেয়েছিল।

আকবরের কাল থেকে মুর্শীদ কুলী খাঁর 'তুমর জমা'ই ছিল একমাত্র রাজস্ব। মুর্শীদ কুলীই তার ওপর প্রথম অতিরিক্ত কর চাপান; একে বলত 'আবওয়াব'। এই আবওয়াব পরবর্তী কালে শুধু বেড়েই চলল: আলীবর্দীর আমলে তা বেড়ে হল প্রায় দশগুণ; এই আবওয়াব থেকেই হত চৌথ আদায়।

এই ক্রমবর্ধমান আবওয়াবের দাবি মেটাতে গিয়ে ঠিকাদার জমিদার ও চাষী দুয়েরই অবস্থা আর তত সচ্ছল রইল না। এ সময়েই জমিদারদের জন্য মুর্শীদ কুলী খাঁ কুখ্যাত ও নিতান্ত অকীর্তিকর 'বৈকুণ্ঠ-বাসে'র সৃষ্টি করে তাঁর সাম্প্রদায়িকতার খ্যাতি ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় করে রেখেছেন।

বলা বাহুল্য, চাষই বাঙালী সমাজের একমাত্র উপজীবিকা ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ছিল ব্যবসা। বেণেদের হাতেই ছিল ব্যবসা। অষ্টাদশের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙলার ব্যবসায়ী যেত ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র, বিশেষ করে মালাবারে, পঞ্জাবে, গুজরাতে, আসামে ও কাছাড়ে। এদিকে কাশ্মীর, ভুটান, মুলতান ও পাটন থেকে নানা ব্যবসায়ী সর্বদা বাঙলায় এসে ভিড় করত। বাঙালী ব্যবসায়ী সর্বত্র তাদের সুতী-কাপড় বিক্রি করে গুজরাত, সুরাট, মির্জাপুর, ফরক্কাবাদ ও নাগপুর থেকে তুলা সংগ্রহ করত। বাঙলার প্রতিটি পরগনায়ই তুলা জন্মাত বটে, কিন্তু দেশ ও বিদেশের জন্য যে পরিমাণ

সুতীর কাপড় বাঙলায় তৈরি হত, তার জন্য তা পর্যাপ্ত ছিল না। তুলার হাট ছিল মুর্শিদাবাদে ও তার সন্নিকটে ভগবানগোলায়।

এই তো হল অন্তর্বাণিজ্যের চিত্র। বহির্বাণিজ্যে পাশ্চাত্ত্য বণিকদের ভূমিকা অষ্টাদশের দ্বিতীয়ার্ধেই শুরু করা শ্রেয়। প্রথমার্ধে কিন্তু বহির্বাণিজ্যের বাজারও ছিল সরগরম। একালে হিন্দু, মুসলমান ও আরমেনিয়ান বণিকেরা বাঙলার মাল পৃথিবীর সর্বত্র, বিশেষ করে তুর্কীস্থানে, আরবে, পারশ্যে ও তিব্বতে চালান দিত। বাঙলায় যা আমদানি হত তার চেয়ে বেশি হত রপ্তানি। তাই বাঙলার বাণিজ্য উদ্‌বৃত্ত অর্থাৎ balance of trade দেশের শিল্পী সমাজের পক্ষে ছিল পরম মঙ্গলকর।

পূর্বে বাঙলায় সৈন্ধব লবণ আসত সুদূর পঞ্জাব থেকে; ফলে বাঙালীকে দিতে হত অনেক অর্থদণ্ড। হয়ত অষ্টাদশ শতকে, কি তার কিছু পূর্বে, বাঙলার 'নিমক মহালে' শুরু হল সামুদ্রিক লবণ তৈরি। সে নিমক বা 'নিমক মহাল' হল মেদিনীপুরের দক্ষিণ অংশ, সমুদ্র ঘেঁষা। পাশেই 'জঙ্গল মহাল' এদের সবারই পদবী 'ভূম', সিংভূম, মানভূম, বীরভূম, ধলভূম। ভূম-চতুষ্টয়ের মধ্যে এখন প্রথম তিনটি রয়েছে বাঙলার পুরুলিয়ায়, ধলভূম বিহারে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাঙলার লবণ এখন যেতে লাগল গঙ্গা বেয়ে সস্তা ভাড়ায় বারাণসী, মির্জাপুর, এলাহাবাদ, নেপাল, আসাম। এতে লাভ হত প্রচুর। আসামের পথে এর সহযাত্রী ছিল সুপারি ও তামাক: তার বদলে আসত আসামী মুগার কাপড়। নিমক মহালে লবণ তৈরি কিন্তু নবাবদের আয়ত্তে ছিল না: সে অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের জমিদারেরাই তা করত, আর তা নিয়ে কারবার করত দেশের বণিকের দল।

প্রাকৃত পৈঙ্গলের কাল থেকে বাঙালীর প্রিয় খাদ্যের মধ্যে নালিতা বা পাট শাকের উল্লেখ রয়েছে। আইন-ই-আকবরীতে রয়েছে ঘোড়াঘাটে (রংপুরে) তৈরি চটের কাপড়ের কথা। গরিবেরা

বাঙলার সর্বত্র সে কাপড় পরত উনবিংশ শতকের শুরু পর্যন্ত। মধ্য অষ্টাদশ শতকে হাতে বোনা চটের প্রথম রপ্তানির কথা শোনা গেল। উনবিংশের মধ্য পর্যন্ত তাঁতে-বোনা চটের রপ্তানির উল্লেখ রয়েছে। ১৮৫০/৫১ খ্রীষ্টাব্দেও প্রায় সাড়ে একুশ লাখ টাকার চটের থলে রপ্তানি হয়েছে।

এদিকে অষ্টাদশের শেষধাপে রপ্তানির ফিরিস্তায় সামান্য শণ পাট কাঁচা মালের উল্লেখ রয়েছে। তা নিয়ে স্কটল্যাণ্ডে চলল পরীক্ষা নিরীক্ষা। ডাণ্ডী থেকে প্রথম যন্ত্রে তৈরী চটের প্রচলন ঘটল ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং অচিরেই তা বেড়ে বাজার মাত করে দিল। বাঙলার তাঁতে তৈরী চটের মালের কবর হল, বাঙালী আরো ফতুর হল।

সারা বাঙালী সমাজ যে ঐশ্বর্যের দৌলতে স্বাচ্ছন্দ্যর মুখ দেখেছিল তা সবই ভূমিজ ; ধান, পাট, সুতীর কাপড়, সিল্ক ও চিনি।

পাশ্চাত্ত্য বণিকদের সবারই তো কিনতে হত এসব মাল নগদ দাম দিয়ে ; এর পরিবর্তে এদেশে কোনো বেসাত রপ্তানিও করতে পারত না। কাজেই বাঙলা সে ধনটা পেত পুরোপুরি। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চিনি থেকেও বাঙলা পেত মোটামুটি বছরে তিন লক্ষ টাকা।

পলাশীর যুদ্ধের পরে এ মনোরম চিত্রটি গেল একেবারে বদলে। প্রথমে ইংরেজ পেল এসব পরম লাভজনক পণ্যের একচেটিয়া অধিকার ; ফলে, বাঙলার চাষীর, শিল্পীর ও দালালের লাভের অংশ এল কমে। পণ্যের বাজারও গেল সংকুচিত হয়ে। পরিশেষে ঐ শতকের শেষার্ধেই প্রধানত তিনটি কারণে ইংল্যাণ্ডের বাজারে বাঙলার সব তৈরী মালের সদর দরজাই বন্ধ হয়ে গেল! এ তিনটি কারণের একটি, ভারতবর্ষে তৈরী মালের উপর ইংল্যাণ্ডের শুল্ক বৃদ্ধি ; দুই, ইংল্যাণ্ডে বাঙলার কাঁচামাল থেকে ইংরেজের সেসব মাল তৈরি ; তিন, ইংল্যাণ্ড ও ফরাসীদেশে নানা যুদ্ধবিগ্রহ। যেমন করেই হোক বাঙলার কপাল পুড়ল!

এখানে একটু নীলের কথা বলা যাক। বাঙলায় প্রথম এর চাষ বেশি ব্যাপক ছিল না বলেই মনে হয়, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে যে বহুকাল থেকেই এটি প্রচলিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সপ্তদশ শতকের রপ্তানির ফিরিস্তায় এ মালটি উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশের প্রথম পাদে তা বন্ধ হয়ে যায়, কারণ আরো সস্তায় সে মাল পাওয়া যেত আমেরিকা-ঘেঁষা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে।

সমাজে দাসত্বের প্রথা সারা ভারতবর্ষে বহুকাল থেকেই ছিল প্রচলিত ; তাই মানুষ কেনা-বেচাও বজায় ছিল। এসব ক্রীতদাসকে হয় ঘরোয়া কাজে, নয় খেতের কাজে লাগান হত। বাঙলায়ও সে রীতি ছিল। ইসলাম এল সে রীতিরই পোষক হয়ে ; প্রত্যেক মুসলমান সম্ভ্রান্ত পরিবারেই থাকত ক্রীতদাস, বিশেষ করে ক্রীতদাসী। পাশ্চাত্ত্য অন্যান্য বণিকের মত ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও এ কাজে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিল। এমন কি উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে ওয়ারেন হেস্টিং-এর গভর্ণমেণ্টও কয়েদী ডাকাতদের স্ত্রী-পুত্রকে দাসদাসীর বাজারে বিক্রি করেছে।

মন্বন্তরের ফলে বাঙলায় দাসব্যবসায় ফেঁপে উঠল অষ্টাদশের শেষার্ধে। তা ছাড়া এমনিই তো পোর্তুগীজ ও মগ ডাকাতেরা পূর্ব ও নিম্ন বঙ্গের সর্বত্র, এমন কি কলকাতা-ঘেঁষা সুন্দরবন, বজবজ, আক্রা প্রভৃতি জায়গায় হানা দিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চুরি করত। অষ্টাদশের শেষ ধাপে কলকাতায় বড় বড় নৌকাভর্তি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এনে রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করে বেচা হত বলে স্যার উইলিয়াম জোন্স লিখেছেন।

অষ্টাদশ শতকে হিন্দু সমাজেও ফার্সী শেখার ধুম পড়ে গেল ; কারণ ফৌজদারী ও দেওয়ানী দুই আদালতেই দলিল-দস্তাবেজ লেখা হত এ ভাষায়ই। বিহারী হিন্দুরা ভাল ফার্সী শিখে 'মুনসী' বলে পরিচিত হল। মক্তবে ও মসজিদে মসজিদে শেখানো হত ফার্সীর

প্রাথমিক ব্যাকরণ, লেখন-পদ্ধতি, সাধারণ কেচ্ছা ও ছড়া, সাদীর গুলিস্তান ও বোস্তান, আর কোরানের বয়েত।

টোলে পাঠের পাঠ্যসূচী আগেও যা ছিল তা-ই রইল; সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি ও সংক্ষিপ্ত অমরকোষ। বাঙলায় শুধু প্রসার ঘটল নব্যন্যায়ের, তা সবই পশ্চিমবঙ্গে। বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, কুমারহট্ট, গোন্দলপাড়া, ভদ্রেশ্বর, জয়নগর মজিলপুর, বালী ও আন্দুলে। উত্তর বঙ্গের দিনাজপুরের টোলও ছিল বিখ্যাত।

মক্তবে আরবী থেকে অনূদিত হয়ে হয়ত-বা বিজ্ঞানের ছিটে ফোঁটা এসেছিল; টোলে তার চিহ্নমাত্রও ছিল না। আইন-ই-আকবরীতে মক্তবের যেসব পাঠ্যতালিকার উল্লেখ রয়েছে তার একাংশও যে এদেশে প্রচলিত হয়েছিল তার বিশেষ কোনো প্রমাণ নেই।

মক্তব ও টোল দুই-ই রইল যার যার সীমাবদ্ধ প্রাচীরের অন্তরালে। শ্লোকে আর বয়েতে দেখাসাক্ষাৎও ঘটল না; ধুতি-চাদর আর ইজার-কামিজের প্রভেদ বেড়ে চলল; যদিও, একটু চিন্তা করলেই বোঝা যেত যে উভয়েরই মূলবস্তু একই কার্পাস। প্রভেদ শুধু বাইরের আকারের।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি অবধি দেখা গেল গ্রামে গ্রামে পাঠশালাই রইল প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। এসব শিক্ষায়তনে প্রাথমিক আরবী, ফার্সী ও বাঙলা একই সঙ্গে পড়ানো হত। আর হত পাটীগণিত—কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক ছিলেন এক আধারে দুই—পণ্ডিত ও মুনশী; কদাচিৎ বিভিন্ন। অ্যাডামের গণনায় বাঙলা ও বিহারের দেড় লাখ গ্রামে এক লাখ এমন পাঠশালা ছিল অর্থাৎ প্রতি তিনটি গ্রামে দুটি পাঠশালা।

পাঠশালা বসত সাধারণত গ্রামের ইজারাদার জমিদারের বৈঠকখানায় অথবা চণ্ডীমণ্ডপে। কোনো কোনো শিক্ষক নিজেও একটা সাধারণমত ঘর তৈরি করাতেন শণ ও বাঁশ দিয়ে। শিক্ষকদের

মধ্যে থাকত নানা শ্রেণীর মানুষ। মুর্শীদাবাদের একটা হিসাব পাওয়া গেছে : তাতে দেখা যায় কায়স্থের সংখ্যা বেশি, ব্রাহ্মণের প্রায় তিনগুণ ; মুসলমানের উল্লেখও রয়েছে : আর রয়েছে ডোমের। ডোম শিক্ষকের পাঠশালার চিহ্ন এখনও দক্ষিণ রাঢ়ে মেলে।

পাটীগণিতের কথায় শুভঙ্করের কথা এসে গেল। পাটীগণিত শিখতে হত 'নামতা' পড়ে—এই ছিল সহজ উপায়। আর পাটীগণিতে ছিল সবারই বহু প্রয়োজন, কৃষিকার্যে ও ব্যবসায়ে।

ছাত্রদের মোড়ল সুর করে নামতা বা পাটীগণিতের ছড়া বলে যেত ; অন্যেরা পরে একসাথে ধরত পোঁ অর্থাৎ তারা ছিল দোহার। শুভঙ্করের নামতা পড়ানো হত না এমন পাঠশালা অষ্টাদশে বা ঊনবিংশে ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না।

অথচ শুভঙ্কর কে ছিলেন এবং কত শতকের মানুষ তিনি তার হদিস এখনো পাওয়া যায়নি। যেমন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন 'ককার'। একদা এই জনপ্রিয় পাটীগণিত শিক্ষকের ইতিহাস আজও অজ্ঞাতই রয়েছে : অবশ্য অনেকে বলেন তিনি সপ্তদশ শতকের মানুষ এবং তার মৃত্যু ঘটেছিল ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

তেমনি রয়েছেন শুভঙ্কর। তাঁর ছড়ার পাণ্ডুলিপি বাঙলার বহু অঞ্চলে পাওয়া গেছে এবং বাঙলার সীমান্ত দেশেও। কারো কারো মতে তিনি ছিলেন বাঁকুড়া অঞ্চলের মানুষ। বুকানন তাঁকে নদীয়ার কায়স্থ বলে বলেন। তিনি যে বাঙলায় ইংরেজদের আমলের বহুপূর্বের মানুষ তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর ছড়ার অনেকগুলিতে রয়েছে আধুনিক বাঙলা ভাষার রূপ ; আবার কতগুলিতে ভাষার বহু প্রাচীন চিহ্ন—এখন যা আমাদের অবোধ্য। যেমন,

"কুরুবা কুরুবা কুরুবা লিজ্জে
কাঠায় কুরুবা কাঠায় লিজ্জে।
কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ,
বিশ ধূলে হয় কাঠার সমান।"

যে মোগলাই খানার খোশবায় বহুশতক ছাড়িয়ে আজও পাওয়া যায়, তার জন্ম বোধহয় আকবরের রসুই ঘরে, ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদে; হুমায়ুনের কালে তা ছিল কিনা বলা দুষ্কর। আকবরের ঘরে ছিল বহুদেশের পাচক। ইংল্যাণ্ডের Too many cooks spoil a broth প্রবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা নানা দেশের নানা খাবার তৈরি করত, প্রধানত আমিষ। আইন-ই-আকবরীতে তারা যেসব মশলা ব্যবহার করত তার ফিরিস্তা রয়েছে। আকবরের নিজের জন্য তরমুজ আনা হত সুদূর সমরখণ্ড থেকে; প্রতিটির জন্য খরচ পড়ত আড়াই টাকা। আপেল, আঙ্গুর, আনারসের কথা নাই বলা গেল; তারপর দেশী ফল তো রয়েছেই। কফি আসত আরব থেকে; পোর্তুগীজেরা এনে দিত বিভিন্ন আসব। খানা দেওয়া হত চীনের পোর্সেলিনের বাসনে।

দেখাদেখি আমীর ওমরা তাঁদের নিজেদের রসুই ঘরও সাজিয়েছিলেন ওই একই রকমে। বাঙলার নবাবদেরও যে তার ছোঁয়াচ লেগেছিল তাতে আর বিস্ময়ের কি রয়েছে? সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার ঠিকাদার জমিদারেরাও তার করল অনুকরণ।

আকবর নিজে এসব খানার রসাস্বাদ করতেন না; সবই ছিল মোগল বাদশার ঐশ্বর্যের প্রতীক। অতিথি অভ্যাগত, বিশেষ করে বিদেশী পর্যটক, বণিক ও পাদরী এসব দুর্লভ ও মহার্ঘ আহার্য খেয়ে তৃপ্ত হয়ে বহু গুণগান করেছেন। বাঙালী সমাজে বাঙালীর একান্ত নিজস্ব খানার সাথে মোগলাই খানার ছিটেফোঁটা একান্তভাবে জড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে উচ্চকোটির সামজিক নিমন্ত্রণে।

দেবীবর ও উদয়নাচার্য প্রতিষ্ঠিত কৌলিন্য প্রথার ফলে যে বহুবিবাহের প্রচলন ঘটেছিল তা পুরোপুরিই অব্যাহত রইল এ শতকে; তার সঙ্গে যে পণপ্রথার প্রচলন ঘটেছিল তা-ও বাড়ল বই কমল না। মিথিলাতেও ব্রাহ্মণদের মধ্যে এ রোগের ছোঁয়াচ লেগেছিল; শেষাশেষি মৈথেলী ব্রাহ্মণদের সমাজপতি দ্বারভাঙ্গার

মহারাজ নির্দেশ দেন যে ব্রাহ্মণেরা পাঁচজনের বেশি ব্রাহ্মণী গ্রহণ করতে পারবে না। বাঙলায় কিন্তু সমাজপতিরা কোনোদিনই এর সংখ্যার কোনো সীমা নির্দেশ করেন নি।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি উচ্চকোটি হিন্দু সমাজে একবার বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা হয়েছিল। দ্রাবিড়, বারাণসী, মিথিলা প্রভৃতি অঞ্চলের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের কাছ থেকে পাঁতি এনে সে চেষ্টা করেছিলেন ঢাকায় বাঙলার নবাবের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ। মনুর প্রখ্যাত সূত্র "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চাপৎসু নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে॥"-র ওপর ছিল তাঁদের পরম আস্থা। অর্থাৎ মনুর বিধিমতে, যদি নারীর স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হয়, মরে যায়, সংসার ত্যাগ করে, ক্লীব বলে প্রতিপন্ন হয়, অথবা তার সমাজচ্যুতি ঘটে, তবে তার দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণে কোনো বাধা নেই।

কিন্তু সে সাধুচেষ্টায় বাদ সাধলেন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। এঁর জন্ম হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদেই এবং আলীবর্দী খাঁর আমল থেকে জমিদার ও সমাজপতি হিসাবে এঁর প্রভূত প্রতিপত্তি ঘটেছিল।

এঁরই সভাসদ ছিলেন রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র। তাঁর লেখায় সেকালের বাঙালী চরিত্রের ও সমাজের ছাপ রয়েছে। সে ছাপ কলঙ্কময়। বলা বাহুল্য, আমরা কাব্যালোচনা করছি না; আমাদের কথা সমাজের। তাঁর আদর্শে রচিত রসিকচন্দ্র রায়ের 'জীবনতারা' ও কালীকৃষ্ণ দাসের 'কামিনীকুমার' সুষ্ঠু, সুস্থ সমাজ ও চরিত্র গঠনের আরো পরিপন্থী।

মোটের উপর পলাশীর যুদ্ধের ঠিক পূর্ববর্তীকালে বাঙালী সমাজে, উচ্চকোটি শ্রেণীর মধ্যে, ফিরে এসেছিল তার পুরনো দিনের বীভৎসতা, অবাধ কামলীলা ও বিলাসব্যসন-জাত চরিত্রের দুর্বলতা, চরম স্বার্থপরতা ও দৌর্বল্য-সম্বল ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা। কি হিন্দু, কি

মুসলমান দুয়েরই। এর জন্যই পলাশীর প্রসিদ্ধ আম বাগানের পাশঘেঁষা ভাগীরথীর জলে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এক গ্রীষ্ম সন্ধ্যায় বাঙলায় স্বাধীনতা-সূর্য ডুবে গেল।

পূর্বে লোকসংগীতের ক্ষেত্রে পাঁচালি, সংকীর্তন প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। অষ্টাদশে তার সঙ্গে এসে জুটল 'কবিগান'। কবি-গানে দু'দলের প্রশ্নোত্তর ছলে নানা বিষয়ের অবতারণা করা হত। ক্রমে সমাজের সর্বস্তরে শুধু শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য হবার ফলে কবিগান 'খেউড়ে' পরিণত হল। কবিগান বাঙলার আসরে নেমেই তা মাত করে দিয়েছিল: খেউড়-এর জনপ্রিয়তা তাকেও অতিক্রম করে গেল।

সাধারণত আমাদের ধারণা যে মুর্শীদ কুলী খাঁর আমলেই বাঙলার জমিদারদের সৃষ্টি হয়েছিল অর্থাৎ জমির মালিকানা স্বত্ব তাদের মধ্যে বর্তেছিল। ধারণাটা ঠিক নয়। মুর্শীদ কুলী খাঁর আমলেও জমিদারেরা আগের মতই শুধু রাজস্ব আদায়ের সহায়কই ছিলেন: ভূস্বামী হলেন আরো পরে। যথাকালে সে কথা আসবে।

মুর্শীদ কুলী খাঁ শুধু জমিদারদের মধ্যে একটু অদল-বদল করে-ছিলেন মাত্র। সাধারণত মুসলমান ইজারাদারেরা হিন্দু ইজারা-দারদের চেয়েও বেশি অকর্মণ্য ছিলেন। কাজেই তিনি বাছাই করে, অক্ষম মুসলমানদের করলেন ত্যাগ আর সে-সব ইজারাদারি বিলি করে দিলেন মোটামুটি কর্মঠ হিন্দুদের মধ্যে। ঊনবিংশ শতকেও যে-সব বড় বড় ভূস্বামী জমিদারের উদ্দেশ পাওয়া যায়, যেমন বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, সুসঙ্গ, বীরভূম, বিষ্ণুপুর ইত্যাদি, তাঁরা সবাই মুর্শীদ কুলী খাঁর পূর্ববর্তী। বলা বাহুল্য, বারভুঁঞার কথা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এসব অদলবদলের ফলে হিন্দু ইজারাদারদের সংখ্যা বেড়ে গেল আর বাড়ল কিছু শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের দল। কারণ তখন হিন্দুদের মধ্যে ফার্সী পড়ার ধুম পড়েছে। মুর্শীদ কুলী খাঁর হিন্দুর প্রতি ছিল একটু নেকনজর; তারা ফার্সী শিখে রাজ-সরকারেও

চাকরি পেল আবার উকিল হয়ে আইন আদালতেও ঢুকে পড়ল। ষোড়শ শতকে যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের দল হল কিছু ভারী।

হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দল আরো বাড়ল কিছু আলীবর্দীর আমলে।

মুর্শীদ কুলী খাঁর আমলে সারা বাঙলায় ছিল লাখখানেক গ্রাম ; সভ্যতা ও সমাজও গ্রাম-কেন্দ্রিক। সমাজ-নিয়ন্তা জমিদার-ইজারাদার। তারা গ্রামে গ্রামে শান্তিরক্ষক ও আঞ্চলিক বিচারকও — অর্থাৎ সর্বেসর্বা।

তবে এসব অদল-বদলে বাঙলার সামাজিক প্রতিবেশের কোনো ইতরবিশেষ ঘটেনি ; তা ঘটেছিল শুধু এসব ইজারাদারদের ভূস্বামিত্ব লাভের ফলে।

এসব অদল-বদলের যেমন সামাজিক ব্যাপারে কোনো ভূমিকা ছিল না, পলাশীর যুদ্ধেরও তেমনি। সেটা একটা রাজনৈতিক ঘটনা মাত্র। কিন্তু সে ঘটনার ফলে সারা দেশে যে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হল তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এসে লাগল সমাজ-জীবনে।

পলাশীর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে সে বছরই ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথমেই বহাল হল চব্বিশ পরগনার ইজারাদার-রূপে। তারপর তাদের দেওয়ানির কাজের প্রসার ঘটল একটির পরে একটি অঞ্চলে। বাঙলাদেশের প্রায় সব কটি অঞ্চলই তাদের দখলে এল ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ; এ শতকের মানচিত্রে তার পৌর্বাপর্যের নির্দেশ রয়েছে। এবার চলল ইংরেজের ঠিকাদারির কাজ, বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ; দুয়েরই মূলনীতি হল বাঙলা দেশ শোষণ।

প্রথমে রাজস্ব আদায়ের কথা বলা যাক। স্যর যদুনাথ সরকারের মন্তব্য দিয়েই শুরু করি। তিনি লিখেছেন "কিন্তু যখন মুঘল শাসন ও সভ্যতার অর্দ্ধচন্দ্র ডুবিয়াছে, অথচ ব্রিটিশেরা নিজ হাতে সাম্রাজ্য শাসন লইতে কুণ্ঠিত, শুধু বাণিজ্য এবং টাকা আদায় ছাড়া বাঙ্গলায়

কোন কাজ করিবেন না, সেই আঠার বৎসর—পলাশীর যুদ্ধ হইতে হেস্টিংস কর্তৃক শাসন-সংস্কার আরম্ভ পর্যন্ত—বাঙ্গলার পক্ষে যে কি ভীষণ কাল ছিল, তাহা সকল সাহেব-লেখকই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মেকলের চক্ষে বাঙ্গালীরা—কি হিন্দু কি মুসলমান—সমান ঘৃণার পাত্র, মনুষ্য নামের উপযুক্ত কিনা সন্দেহ! অথচ তিনি তাঁহার "লর্ড ক্লাইভ" এবং "ওয়ারেন হেস্টিংস" নামক দুইটি জগদ্বিখ্যাত প্রবন্ধে এই অত্যাচার-অবিচারের জ্বলন্ত চিত্র দিয়াছেন। [Then was seen what we believe to be the most frightful of all spectacles, the strength of civilization without its mercy]" অর্থাৎ সেকালে যে দৃশ্যের অবতারণা করা হল তা সকল দৃশ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর; সভ্যতার শক্তির প্রচণ্ড উন্মত্ততা, যার মধ্যে কৃপা ও করুণার লেশমাত্রও নেই।

এরই প্রথম প্রত্যক্ষ ফল হল পলাশীর যুদ্ধের তের বছরের মধ্যে বাঙলার প্রলয়ংকর মন্বন্তর। এর ফলে সমগ্র বাঙালী জাতি ও সমাজ বিকল ও বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

ইতিহাসের পাতায় লেখা এই যে মন্বন্তর ঘটেছিল ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে আমরা একে বলি 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' অর্থাৎ বঙ্গাব্দের গণনায় ১১৭৬ সালে। পূর্বে এই সঙ্কর বঙ্গাব্দের যে সূত্র দেওয়া হয়েছে তা প্রয়োগ করে এক্ষেত্রে এক বছরের প্রভেদ দেখা যায়, যথা ১৭৭০ + ২৯ = ১৭৯৯ − ৬২২ = ১১৭৭। কিন্তু মনে রাখতে হবে, খ্রীষ্টাব্দ শুরু হয় জানুয়ারীতে আর বঙ্গাব্দ বৈশাখে; দু'য়ের ব্যবধান সাড়ে তিন মাসের মত। এই ব্যবধানের সময়েই শুরু হয়েছিল মন্বন্তর অর্থাৎ ১৭৬৯/১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের শীতে, তখনো নূতন বঙ্গাব্দ আসেনি।

এজন্য Hunter তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "Annals of Rural Bengal"-এ লিখেছেন যে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে বাঙলায় যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তার ক্ষয়ক্ষতি দু'পুরুষের মধ্যেও পূরণ হয়নি।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' এই মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা।

তাঁর অমর তুলিকার স্বল্প রেখাঙ্কনে যে চিত্রটির সৃষ্টি হয়েছে বাস্তবের দিক থেকে তা তুলনাহীন।

"আশ্বিনে কার্ত্তিকে (১১৭৫) বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, [পূর্ব্ববৎসরও ফসল ভাল হয় নাই] মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তারপর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তারপর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না; কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ [শব্দটি দ্ব্যর্থক, (১) সরফরাজ বাঙলার পূর্বতন নবাব; (২) মোড়ল] হইব। একেবারে শতকরা দশটাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গলায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

"লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপরে কে ভিক্ষা দেয়! উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোতজমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

"রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ

বসন্তের বড় প্রাচুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পালায়।"

এমন যে মন্বন্তর যার ক্ষয়ক্ষতি, ইংরেজের মতেও, পঞ্চাশ ষাট বছরেও অপূরণীয় তার অকথিত কিছু কারণ রয়েছে। আমরা এখন সে আলোচনাই করব।

ব্যাপকত্বে ও তীব্রতায় বহু শতকের মধ্যে বাঙলার এ মন্বন্তর তুলনীয় শুধু একটির সঙ্গে। সেটি ঘটেছিল বাদশা শাজাহানের আমলে, ১৬২৯/১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে, বোম্বাই-গুজরাট অঞ্চলে।

বাঙলায় তখনো কোনো প্রামাণিক আদমসুমার হয়নি। হাণ্টারের মতে তিন কোটি বাঙালী এর কবলে পড়েছিল এবং তার মধ্যে অন্তত এককোটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। 'চহার গুলজার শুজয়ের' লেখক হরিচরণ দাসের মতে বাঙলা ও বিহারে (পাটনা ও ভাগলপুরে —পূর্ণিয়া তখন বাঙলার সঙ্গে যুক্ত) অন্তত তিন কোটি সাত লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যু ঘটেছিল। কলকাতা ও আজিমাবাদে (পাটনায়) সাধারণত টাকায় চার মণ শস্য পাওয়া যেত; দুর্ভিক্ষের কালে সেখানে টাকায় চার সেরও পাওয়া যেত না। ছেলে মেয়ে বিক্রি হয়েছিল প্রত্যেকটি মাত্র চার আনা থেকে আট আনায়! অই বছরই কলকাতায় প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ফলে কত ঘরবাড়ি পুড়ে যে ছাই হল তার ইয়ত্তা নেই, বাসিন্দাও মরল অনেক।

কারো কারো মতে পাটনায় দৈনিক মানুষ মরল দেড়শ'। ভাগলপুরের লোকসংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেল।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ছড়িয়ে পড়ল বাঙলার সর্বত্র; উত্তরবঙ্গে শুধু রংপুরে হল অপেক্ষাকৃত কম আর দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে বাখরগঞ্জ ও

চট্টগ্রামে—যেখানে জমির উর্বরতা হ্রাস পেত না পলিমাটির গুণে—হয়ত স্বাভাবিক চাষবাস চলল। আর সর্বত্রই দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপ হল তীব্র, বিশেষ করে পূর্ণিয়া, মুর্শীদাবাদ, বীরভূম ও কলকাতা অঞ্চলে।

বাঙলা চিরকালই ধানের রাজা। সারা ভারতবর্ষের শস্যাগার। এ দেশের ধান চাল দেশে বিক্রি করে পাশ্চাত্য বণিকেরা বহু অর্থ সংগ্রহ করেছে। মাদ্রাজও আহার্যের জন্য চিরকালই বাঙলার ওপর নির্ভর করেছে। সেই বাঙলা দেশে এমন নিদারুণ দুর্ভিক্ষ, যার কবলে পড়ে মানুষ মানুষের মাংস খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছে; অদৃষ্টের কি চরম পরিহাস! কিন্তু একি শুধু অদৃষ্টের খেলা; মানুষের হাত কিছুই নেই? আছে। কার? ইংরেজ বণিকের!

এ সম্পর্কে আমরা শুধু ইংরেজ লেখকদের মন্তব্যই তুলে ধরছি।

বেভারেজ লিখেছেন, দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তীব্রতম হবার পূর্বে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকুরেরা দেশের সব অঞ্চল থেকে সমস্ত ধান, এমন কি বীজধানও, সংগ্রহ করল—জোর করে।

কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মন্বন্তরের গোড়ায় মুর্শীদাবাদে রংপুর থেকে চাউলের দাম ছিল তিনগুণ বেশি। তার সবটাই ইংরেজ বণিক্ করল দখল, আর, বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রামে চাষীর ঘর থেকে সব ধান চাউলই কিনে, কেড়ে নিতে লাগল। সব খাদ্যশস্যই এসে মজুদ হল কলকাতা অঞ্চলে। তারপর বাঙলার মানুষ মেরে এদেশে সর্বপ্রথম 'কালোবাজারের' সৃষ্টি করল ইংরেজরাই!

হাণ্টার স্বজাতির সমর্থনে কিছু বলতে গিয়ে বলেছেন বটে, ইংরেজের সাথে নবাবের যে চুক্তি হল ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাতে ছিল শুধু রাজস্ব আদায়ের কথা। সে কাজ তারা করছিল সযত্নে ও সুনিপুণভাবে। কিন্তু ভারতবর্ষের চিরন্তন চিন্তাধারার সাথে ছিল তার অমিল, কারণ রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে এদেশে ন্যায়াধিকরণ

(দেওয়ানী আদালত) ও জনপালনের সম্বন্ধ নিত্য ; ইংরেজ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তা বোঝেনি। কিন্তু তবুও ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে একটা সুসঙ্গত বিধির প্রবর্তন তারা করতে পারেনি।

হাণ্টার এতসব বলেছেন বটে, তবুও তাঁকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হয়েছে,—ইংরেজ তার দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ পালন করতে পারেনি। আর, লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে (অর্থাৎ ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) এই কর্তব্যের সুষ্ঠু ব্যাখ্যার পূর্বে ইংরেজের প্রধান লক্ষ্য ছিল অর্থোপার্জন আর তার উপায় ছিল রাজ্যজয় ও অধিকৃত অঞ্চল তাঁবে রাখা।

বাঙালীর প্রশস্তি গেয়ে তিনি বলেছেন, বাঙালীর স্থৈর্য কোনো-ক্রমেই নষ্ট হয় না, না বিপদে না সম্পদে। ধনী হলেও তার হর্ষধ্বনি যেমন রণিত হয় না তেমনি নির্ধন হয়ে পড়লেও তার শোকার্ত বিলাপ শোনা যায় না। এ সব ভাববিকার নিয়ন্ত্রণে তারা পরম দক্ষ। তাদের ক্ষোভ বহুস্থায়ী কিন্তু তার প্রকাশ থাকে না, আবার তাদের কৃতজ্ঞতাও বহুপুরুষব্যাপী অব্যাহত থাকে।

লাভডে বলেছেন, অনেকে দক্ষিণাপথে হায়দর আলীর সঙ্গে কোম্পানির যুদ্ধবিগ্রহের (১৭৬৭/৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) অজুহাতে মন্বন্তরে ইংরেজের ত্রুটির কথা ঢাকতে চেয়েছেন, কিন্তু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে কোম্পানি যাদের দৌলতে অংশীদারদের জন্য অর্থ উপার্জন করত, তাদের জীবন-মরণ সম্পর্কে আগ্রহ অর্থ-সংগ্রহের চেয়ে মোটেই বেশি ছিল না।

মন্বন্তর প্রতিরোধে কোম্পানির কিছু ভূমিকা ছিল কি? সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে লাভডে মন্তব্য করেছেন, কোম্পানি যেটুকু করেছে সেটুকুর সবই ছিল অনুদার, বিশৃঙ্খল ও অবিবেচনাপ্রসূত। হাণ্টার বলেছেন, এই ব্যাপক ও বহুকালস্থায়ী দুর্ভিক্ষের খাতে কোম্পানির মোট খয়রাত মাত্র চার হাজার পাউণ্ড!

এর চেয়ে সেকালেও অনেক বেশি করেছিল দেশী লোকেরা।

তারা চাঁদা তুলে অন্য অঞ্চল থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য দিল পনরো হাজার পাউণ্ড আর সাধারণ খয়রাতির জন্য আরো তিন হাজার পাউণ্ড।

পাটনায় বাদশার দেওয়ান সীতাবরী বারাণসী থেকে পাটনায় জলপথে খাদ্যশস্য আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করল।

মন্বন্তরের করুণ চিত্র টেনেবুনে লাভ নেই। ইংরেজের আমলে ভারতবর্ষে, নিদারুণ শস্যাভাব ছাড়াও, দুর্ভিক্ষ হয়েছে বাইশটি; এর মধ্যে শুধু বাঙলায় ও বাঙলা-সমেত অন্য অঞ্চলে ঘটেছে সাত বার; ১৭৭০, ১৭৮৩, ১৮৬৬, ১৮৭৩-৭৪, ১৮৯২, ১৮৯৭, ও ১৯৪৩-এ। প্রথমটি ও শেষেরটি ব্যাপকভাবে ঘটেছে বাঙলায়; প্রথমটিতে কালোবাজারের পূতিগন্ধ; শেষেরটিতে মিশেছে পোড়ামাটির গন্ধ। দু'টির মধ্যেই রয়েছে শুধু ইংরেজের নির্লজ্জ স্বার্থপরতার ছাপ। ভারতবর্ষে ইংরেজের অভিষেক হয়েছিল বাঙালীর অশ্রুধারায়, আবার তাদের বিদায়-সংগীতেও বেজেছে বাঙালীরই মর্মান্তিক অশ্রুরুদ্ধ ক্রন্দন! হায়, আপসোস করে লাভ নেই—কেউ বাঙালীর দুঃখ বোঝে না, হয়ত বাঙালী পুরোপুরি নিজেও বোঝে না!

এবার বাণিজ্যের কথা। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী কালে বাঙলায় শুরু হল ইংরেজের নির্লজ্জ, অবিবেকী বাণিজ্যিক শোষণ-পর্ব এবং তা চলল অন্তত দীর্ঘ পনরো বছর ধরে।

বাঙলা থেকে হীরা জহরত প্রায় বিনামূল্যে, হয়ত প্রায় জোর করেই কেড়ে নিয়ে, কোম্পানির চাকরেরা নিজেদের নামেই, যথাযথ রপ্তানি শুল্ক দিয়ে, দেশে পাঠাতে শুরু করল। ক্লাইব নিজেও তা বহুবার করেছে। অন্যান্য পাশ্চাত্য কোম্পানির মূল্য-বিনিময়-পত্র (bill of exchange) এদেশে সস্তাদরে কিনে দেশে পাঠাতে শুরু করল। এতে লাভ হত বছরে আনুমানিক দশ লক্ষ পাউণ্ড। বাঙলার রুপায় চীনে ইংরেজের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠল। আর বাঙলা ক্রমে হতে লাগল হতশ্রী—বাড়তে লাগল দেশ ও সমাজের দারিদ্র্য।

কোম্পানির ইংরেজ গোমস্তারা লবণ, সুপারি, ঘি, চাল, খড়, বাঁশ, মাছ, চট, আদা, চিনি, তামাক, আফিং প্রভৃতি সব জিনিসেরই খরিদ বিক্রি শুরু করল বাঙালী ব্যবসায়ীকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে। কারণ সর্বত্রই তারা জোর করে পাঁচ টাকার জিনিস কিনত এক টাকায় !

এ'কালে একবার জোর গুজব উঠেছিল যে ইংরেজ গোমস্তারা বাঙলার তাঁতিদের বুড়ো আঙুল কেটে দিয়েছিল। এ গুজবের ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণ নেই বটে, তবে এ কথা সত্য যে নানারূপ অত্যাচারের ফলে বহু তাঁতি তাদের জাত-ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছিল। লোক বেকার হতে শুরু করল, আয় কমে গেল, ইংরেজ গোমস্তারা ছোটখাটো ব্যবসা দখল করে সাধারণ লোকের রুজিরোজগার মেরে দিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মীরকাশিমকে রাজস্বের হার বাড়িয়ে দিতে হল যুদ্ধের খরচ মেটাতে। ফলে সাধারণ লোকের পক্ষে তা হয়ে উঠল ক্লেশকর।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বলে যে কথাটা রয়েছে ইতিহাসের পাতায় তা বোধহয় মূলত দেশের এই ক্রমবর্ধমান অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সাক্ষাৎ পরিণাম। এর উল্লেখ রয়েছে মন্বন্তরের সাত বছর পরে। কারো মতে এই বিদ্রোহের বা বিপ্লবের ক্ষেত্র দিনাজপুর, কারো মতে রাজসাহী, কারো মতে ময়মনসিংহ ; হয় উত্তরবঙ্গে নয় উত্তর-পূর্ববঙ্গে। আধুনিক জেলা গেজেটিয়ারে এদের সম্পর্কে যে সব তথ্য রয়েছে এর ভিত্তি কিম্বদন্তী। তা ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিকদের মতে যা প্রামাণিক তারই উল্লেখ করছি।

এরা ভোজপুরীদের গোষ্ঠীভুক্ত ; পশ্চিম বিহার ও তৎসংলগ্ন উত্তর প্রদেশের অধিবাসী। এদের পেশা ছিল ডাকাতি, রাহাজানি। এরা শৈবধর্মী ; সেকালের বাঙলায় লুটের সুবিধা দেখে এরা বাঙলার প্রায় সর্বত্র হানা দিয়েছিল। শুধু লুট নয়, গ্রামকে গ্রাম এরা পুড়িয়ে দিত আর চাষী ও জমিদার উভয়ের কাঁছ থেকেই টাকা

আদায় করত। ১৭৬৩ সনে এদের বাঙলায় প্রথম প্রাদুর্ভাব ঘটে, তারপর পরপর অনেকবার। বাঙলা লুটের জন্য তৈরি হয়ে যে ১৭৭০ সনে বারাণসীতে এদের দলের দশ হাজার লোক জমায়েত হয়েছিল তার উল্লেখ রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। 'হুন্‌জুঘু' নামে পরিচিত এদেরই একটি গোষ্ঠীর লোক থাকত অকৃতদার ; কাজেই এদের কোনো পারিবারিক জীবনও থাকত না। যে সব দেশের ভেতর দিয়ে এরা যেত তার মধ্যে সুস্থ সবল ছেলে পেলেই চুরি করত। এদের কেউ কেউ মণি মুক্তা প্রভৃতি দামী জিনিসের ব্যবসাও করত। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গাসাগরে স্নান এবং বৈদ্যনাথধাম ও শ্রীক্ষেত্র দর্শনে এদের ছিল পরম উৎসাহ।

বাঙলার অনেক ফকির ও সন্ন্যাসী ছিল পেশায় এদেরই সমগোত্রীয়। ঘোড়াঘাট চাকলার মজনুম খাঁ ফকির, মুসা শা ফকির, ভবানী পাঠক ও তার সহযোগী দেবী চৌধুরাণী ছিল স্বনামধন্য। বঙ্কিমের শুদ্ধিমন্ত্রে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী মহিমান্বিত রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

সেকালে বাঙলার অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না ; দেহাত ছিল অরক্ষিত। তবুও ওয়ারেন হেস্টিংসের তৎপরতার ফলে পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, রংপুর, রাজসাহী, বগুড়া, ঢাকা ও ময়মনসিংহের বহু অঞ্চল সন্ন্যাসীদের নির্মম তাণ্ডব থেকে রক্ষা পায়।

মীরজাফর ইংরেজের তাঁবে এসে ক্রমে ক্রমে প্রায় আশি হাজার শিক্ষিত সেনা বরখাস্ত করেন। জমিদার-ইজারাদারেরও বহু লাঠিয়ালের কর্মচ্যুতি ঘটে। এই লাঠিয়ালরাই ছিল জমিদারের জমিদারী রক্ষার ও দেশের অভ্যন্তরে শাসন শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রধান সহায়। আমরা এখনো সেই সুঠাম স্বাস্থ্যোজ্জ্বল যষ্টিযোদ্ধাদের প্রশস্তি গাই তাদেরই প্রসিদ্ধ 'রায়বেঁশে' নাচ স্মরণ করে। পুতুল নবাবদের মাসহারা কমে যায় : সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দপ্তরের কর্মচারীদের দলেও ছাঁটাই হয় ; এতগুলি লোক একসঙ্গে বেকার

হয়ে যায় ; ফলে কেউ যোগ দেয় অই নাগা সন্ন্যাসীদের দলে, কেউ দলবল গড়ে দেশে ডাকাতি, রাহাজানি শুরু করে। মোটের ওপর বাঙলার অভ্যন্তরে আইন শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে সমগ্র অঞ্চলে ব্যাপক অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এ বিপ্লবের নায়ক প্রধানত বেকার সেনাদলের লোক।

ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে সহসা কেন যে পুরনো জমিদার-ইজারাদারদের বরখাস্ত করে জমির নূতন ইজারা দিলেন তা বোঝা দুষ্কর। কেউ বলেন, এটা রাজস্ব বাড়াবার জন্য একটা পরীক্ষা মাত্র, কেউ বলেন এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে তাঁর অর্থলিপ্সা ; এটা নিছক নিজের পকেট ভারী করার একটা ফন্দি মাত্র। এর ফলে বাঙলার অভ্যন্তরে অশান্তি আরো বেড়ে গেল। পুরনো জমিদারদের অনেকেই মাসহারা পেয়ে বিদায় নিলেন, নূতন নূতন ইজারাদার বেশি টাকা কবুল করে (আর কেউ কেউ বলেন হেস্টিংসের পকেট ভারী করে) দেখা দিলেন, তাঁরা নিজেদের এলাকায় শান্তিরক্ষার দায়িত্ব থেকেও মুক্ত হলেন। এই অদল-বদলের ফলে রায়তদের কাছ থেকে আগের পাট্টা, অর্থাৎ জমি ভোগ করার অধিকার-পত্রও কেড়ে নেওয়া হল। আর চাই কি ? জমি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু হল, চাষীর ওপর অত্যাচারেরও সীমা রইল না। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল পাঁচটি বছর।

অষ্টাদশ শতকেই প্রথম কলকাতাতে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জন্য জাহাজ তৈরির ব্যবস্থা হয় এবং কলকাতায় তৈরী প্রথম জাহাজটি চালু হয় ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে। এর পুর্বে শ্রীহট্ট, চাটগাঁ ও ঢাকাতে জাহাজ তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। কলকাতায় জাহাজ তৈরির জন্য পেগু থেকে এল সেগুন কাঠ আর বিহার, অযোধ্যা ও বাঙলার উত্তর সীমান্ত অর্থাৎ তরাই থেকে এল শাল ও শিশুকাঠ। সাধারণত জাহাজের খোল, ডেক, পেছনের হাল প্রভৃতি তৈরি হত সেগুনে। উপরের ফ্রেমটি হত শাল ও শিশু কাঠ দিয়ে।

লর্ড ওয়েলেসলী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিবরণীতে লিখলেন, বাঙলার জাহাজ তৈরির কাজ এত সুষ্ঠু ও নিখুঁত যে বাঙলার বাজার থেকে বেসরকারী ইংরেজ বণিক্‌দের যত টন মালের জাহাজের প্রয়োজন হোক না কেন তা যে এদেশেই তৈরি হতে পারে তাতে কোনো সন্দেহ নেই অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে সে মাল তৈরির প্রয়োজন নেই। বাঙলার ছুতার এ নিয়ে গর্ব করতে পারে বটে।

বাঙলার চাষী আজ চিরঋণগ্রস্ত ; এ দেনার অন্ত নেই, কিন্তু আদি রয়েছে। রাজস্ব যখন কেবল শস্যের বিনিময়ে মেটানো হত, তখন এ দেনা ছিল নিতান্তই নগণ্য ও সাময়িক। চতুর্দশ শতকে, শেরসাহী আমলে, মুদ্রা নিয়ে খাজনা দেবার রীতিরও প্রচলন হল— আকবরের প্রতিভূ টোডরমল তা আরো চালু করলেন। খাজনা 'শস্যঞ্চ গৃহমাগত' ছকের আশ্রয় ছেড়ে রোপিত শস্যের ঘাড়ে পড়ল। ফলে চাষীর ঝুঁকি গেল বেড়ে—সঙ্গে সঙ্গে দেনার প্রয়োজনও। প্রতি বছর সময়মত বরুণদেবের উপর যার একান্ত নির্ভর করতে হয়, তার দেনা যে চিরন্তন হবে তাতে আশ্চর্য হবার কি ?

উত্তমর্ণ প্রথম ছিল সোনার বেনে। দ্বাদশ শতকে, বল্লালী আমলে, তাদের হতমান করার ফলে তাদের জায়গা দখল করল গুজরাটী ও রাজস্থানী। অষ্টাদশে সে বল্লালী ভুলের বিষময় ফল স্পষ্ট হল স্বনামধন্য ব্যাঙ্কার 'জগৎশেঠে'।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাধারণ তাকাবি, অর্থাৎ চাষীকে চাষের জন্য দেওয়া সাময়িক ঋণ জোগাতেন জমিদার। তাতে সুদের হার ছিল অকিঞ্চিৎকর। পরে তাঁরা অপারগ হলেন : কুসীদজীবী এল প্রথমে তার মাস প্রতি শতকরা ছ'টাকা সুদের বেসাত নিয়ে। তারপর তা ক্রমে ক্রমে বহুগুণ বেড়ে উঠল।—আইনগত কোনো বাধা ছিল না। বস্তুত এ প্রাধান্যের সঙ্গে ব্রিটিশ বিচার-ব্যবস্থা জড়িত।

প্রধানত ইংরেজ বণিক্‌দের সুবিধার জন্য অষ্টাদশেই পরপর

তিনটি ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে। 'ব্যাঙ্ক অব্ হিন্দুস্থান' চালু হয় ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে। এটি বেসরকারী—আলেকজান্দার কোম্পানি এর কর্ণধার ; এরা 'নোট'ও ছেপেছিলেন—তা চালুও হল। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠল 'জেনারেল ব্যাঙ্ক' ; তার শাখা-প্রশাখাও ছড়াল বাঙলার নানা অঞ্চলে। এরাও 'নোট' ছাপাল আর তা দিয়ে গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্যও মেটানো চলত। পরে এল 'বেঙল ব্যাঙ্ক'। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে জোর গুজব উঠল, ইংরেজ দক্ষিণাপথে টিপু সুলতানের কাছে হেরে গিয়েছে। ফলে তিনটি ব্যাঙ্কেই নয়-দশ দিন ধরে গচ্ছিত টাকা তোলার ধুম পড়ে গেল। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য এল বটে, তবু 'বেঙল ব্যাঙ্ক' হল দেউলিয়া। শেষে ক্রমে ক্রমে অন্য দু'টি ব্যাঙ্কও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। শেষ হল বাঙলার ব্যাঙ্কের প্রথম পর্বের ইতিহাস।

কিন্তু এসব ব্যাঙ্কের সাথে চাষীর সম্পর্ক ছিল না ; তারা রইল যে তিমিরে সে তিমিরেই—কুসীদজীবীদের কবলে।

রাজকার্যের জন্য আকবর যে তারিখ-ই-এলাহির প্রচলন করেন বাঙলায় তা চালু রইল ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তারপর চলেছিল মুসলমান সমাজে হিজরাব্দ, উচ্চকোটি হিন্দু সমাজে শকাব্দ আর সাধারণের মধ্যে 'পরগণাতি-অব্দ'। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী কালেই ইংরেজ ব্যবসা-বাণিজ্য ও দেওয়ানী কাজে 'গ্রেগারিয়ান' সালের প্রচলন করল। সেটা ক্রমে সর্ব রাজকার্যে ও বাণিজ্য ব্যাপারে সারা বাঙলায় গৃহীত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। মুসলমান সমাজ সামাজিক ব্যাপারে রইল হিজরাব্দ মেনে ; সর্ব সমাজেই বছর ও দিন গণনায়, দিন ও মাস গণনায়, চালু হল 'গ্রেগরিয়ান'। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজে নানা অঞ্চলে প্রচলিত হল সাল, বাঙলায় চালু হল সঙ্কর বঙ্গাব্দ কিন্তু হিন্দু সমাজ 'তিথি'র ব্যাপারে রইল পুরনো চন্দ্র-ভিত্তিক গণনা আঁকড়ে। 'গ্রেগরিয়ান' পদ্ধতিও সূর্য-ভিত্তিক তবে এখন সারা পৃথিবীতে যা চালু রয়েছে তা ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগরীর নির্দেশে

১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে কিছু অদল-বদল করা। আজ প্রায় একশ বছর যাবৎ তারও আরো অদল-বদল করার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে তবে এখনো তা করা সম্ভবপর হয়নি।

খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য হতে আয় ছাড়াও বাঙালীর আর্থিক সচ্ছলতার আর একটি প্রধান কারণ ছিল বাঙলার সুতীর কাপড়। মসলিনের কথা ছেড়ে দিলেও, নানারূপ সূক্ষ্ম কাপড়ের জন্য শুধু ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর সর্বত্র ছিল বাঙলা বিখ্যাত। বাঙলা এই কাপড় বেচে বহু অর্থ পেত। কূটবুদ্ধি ইংরেজ তখন বাঙলা শোষণের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। ম্যানচেস্টারে বাষ্পচালিত তাঁতও বসেছে: সেই কাপড়ের প্রথম চালান এল বাঙলায় ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। বাঙলায় সে কাপড় অবশ্য তখনই চলল না: তা চালাতে ইংরেজের বেশ কিছু কারসাজি করতে হল। কিন্তু বাঙলার পোড়া কপাল আরো পোড়া তা থেকেই শুরু হল। যথাকালে তা বলা যাবে।

ভারতবর্ষে নীলের চাষ যে ঠিক কোন্ শতক থেকে শুরু হয়েছিল তা বলা দুষ্কর, কিন্তু তা যে বহুকাল পূর্বে ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। সপ্তদশ শতকের শুরুতে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে সব মাল থেকে সর্বাপেক্ষা বেশী লাভ হয়েছিল তার মধ্যে নীল ছিল প্রধান। বোধহয়, আগ্রা, আহ্‌মদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সে নীল সংগৃহীত হয়েছিল; কারণ সে সব অঞ্চলের নীলের ছিল খুব সুনাম। তারপর অষ্টাদশের প্রথম পাদেই আমেরিকা-ঘেঁষা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রতিযোগিতার ফলে ভারতবর্ষে নীলের চাষ প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। তারপর অষ্টাদশের মাঝামাঝি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জ্যামেইকা নীলচাষ বন্ধ করে বেশী লাভের জন্য কফি, চিনি প্রভৃতির চাষ করতে শুরু করে; কাজেই তখন ইংরেজ আমেরিকা থেকে খরিদ করে তাদের নীলের প্রয়োজন মেটাত। এর মধ্যে শুরু হল আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রাম; কাজেই ইংরেজ আবার তাদের খাস জমিদারি বাঙলায় নীলের চাষের তোড়জোড় করতে শুরু করল:

বাঙলা কিন্তু অচিরেই নীলের চাষের জন্য বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেল। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড সর্বসমেত যে ষাট লক্ষ পাউণ্ড নীল খরিদ করে, তার মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষই ছিল বাঙলা থেকে। তার মূল্য অন্তত দু' কোটি টাকা।

বাঙলায় নীলের চাষ ছিল বেসরকারী লোকের হাতে। এজন্য ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাদের দশ লক্ষ টাকা দাদন দেয়। সৃষ্টি হল নানা কোম্পানি। তার মধ্যে বেঙল ইণ্ডিগো কোম্পানি সর্বাপেক্ষা বড়, কাজে ও অর্থের সচ্ছলতায়। এ কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার লারমুর ছিলেন পরম স্বেচ্ছাচারী নেতা। এঁদের ফ্যাক্টরি বসল কৃষ্ণনগরে, যশোহরে ও বারাসতে।

নীলকর ইংরেজদের দল ক্রমে বাঙলা ও বিহারের অভ্যন্তরে গ্রামাঞ্চলে তাদের ফ্যাক্টরি তৈরি করল, শাসকগোষ্ঠীর সহায়তায়। অকথ্য ছিল এদের অত্যাচার, শুধু চাষীর ওপরে নয়, সাধারণ গ্রামবাসীর ওপরেও। এরা জোর করে চাষীদের দাদন নিতে বাধ্য করত এবং যদিও নীলের চাষে চাষীদের লাভ হত যৎসামান্য, তবুও অত্যাচারের ভয়ে তাদের এ কাজ করতে হত। গ্রামে গ্রামে নীলকুঠিগুলি ছিল ইতর ভদ্র, সর্বশ্রেণীর নারীর পক্ষে বিভীষিকা।

তখন অঞ্চলে অঞ্চলে ইংরেজদের আইন আদালত স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু এদের বিরুদ্ধে নালিশ করে কোনো সুসার হত না। উনবিংশ শতকের প্রথম পাদের দু'টি মামলার ফলাফল উল্লেখ করা গেল; একটি ত্রিহুতের, অন্যটি পূর্ণিয়ার।

ত্রিহুতের নীলকর টার্নার নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হলেন। তাঁর তাঁবেদার একজন চাষী নীল চাষ করতে রাজী হয়নি, তিনি লাথি মেরে তাকে মেরে ফেললেন। অর্ধমৃত অবস্থায় তাকে নীলকুঠিতে রাত্রিটা আটক থাকতে হয়েছিল নীলের গাদায়। বিচারে ইংরেজ জুরি টার্নারকে বেকসুর খালাস দিল, কারণ চাষীটির নাকি মৃত্যু ঘটেছিল সাপের কামড়ে!

পূর্ণিয়ার নীলকরও এরূপ নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে মাত্র চারশ' টাকা অর্থদণ্ড ও একমাসের জেল ভোগ করলেন।

এমনি ছিল সেকালের ইংরাজের নীতি ও বিচারপদ্ধতি বা প্রহসন!

ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে বাঙলার গ্রামে গ্রামে নীলকরদের অত্যাচার মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করল। চাষীরা এর বিরুদ্ধে ছড়া তৈরি করল; মুর্শীদাবাদ জেলায় ছড়া বাঁধল;

"জমিনের শত্রু নীল,
কর্মের শত্রু ঢিল, (আলস্য)
তেমনি জাতের শত্রু পাদরী হিল।"

(পাদরী হিল তখন লোকের জাত মেরে চারদিকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছে।)

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর বিখ্যাত পুঁথি নীলদর্পণ—১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করে এই অকথ্য অত্যাচারের তথ্য সভ্যসমাজে তুলে ধরেন। বঙ্কিমচন্দ্র নীলকর ফষ্টার বাঁদরদের চিত্র এঁকেছেন তাঁর 'চন্দ্রশেখরে'।

'নীলদর্পণ' সভ্যসমাজে তোলপাড় তোলে। ইংরেজ পাদরী রেভারেণ্ড জেমস্ লং এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন বাঙলা পুঁথি প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই; এতে একটি যথাযোগ্য ভূমিকাও জুড়ে দেন।

ইংরেজ জাতের কলঙ্কবহ ও অপবাদক পুঁথির প্রচারের জন্য তাঁর বিচার হয় সে বছরই। কারণ সারা ইংরেজ সমাজ তাঁর ওপর নিদারুণ খাপ্পা হয়ে ওঠে। এই বিচার প্রহসনের ফলে পাদরী লং-এর অর্থদণ্ড হয় এক হাজার টাকা আর সাধারণ জেল কয়েদীদের সঙ্গে বাস করতে হয় তাঁকে এক মাস। বাঙালী জাতি এই মহানুভব ধর্মযাজকের কাছে চিরঋণী হয়ে রইল। নীলদর্পণে বাঙলায় ইংরেজ সমাজের যে সত্য প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখে উচ্চকোটি

সমাজে হল আলোড়ন। ফলে গভর্ণমেণ্টেরও টনক নড়ল, এদিকে ধরে বেঁধে নীলের চাষে চাষীর আয় এত কমে যেতে লাগল যে ক্রমে সে চাষ এদেশে বন্ধই হয়ে গেল।

যদিও নীলদর্পণের কাহিনী ঊনবিংশ শতকের তবুও এ লেজুড়টুকু অষ্টাদশেই জুড়ে দেওয়া হল, পৌর্বাপর্য রক্ষার জন্য। বাঙালীর কৃতজ্ঞতাবোধ খুবই প্রখর বলতে হবে, কারণ এ সব তাণ্ডব লীলা সত্ত্বেও জঙ্গল কেটে, বসতি স্থাপন করে নীলকরেরা যে সাধারণ লোকের কিছু সুখ-সুবিধার বিধান করেছিল সে কথা বলেছেন রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি।

মেদিনীপুরের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ সারা সমুদ্রতীরটা জুড়ে ছিল নিমকি বা নিমক মহল। 'ভূম' সংজ্ঞাযুক্ত অঞ্চলগুলিকে জঙ্গল মহল বলা হত। অষ্টাদশের দ্বিতীয়ার্ধে এ দু'টি অঞ্চলেই একটা বিশাল অরণ্যানী গড়ে উঠল। উড়িষ্যা ইংরেজের দখলে এল ঊনবিংশ শতকের শুরুতেই, ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে। ক্রমে সে অবণ্য পরিব্যাপ্ত হল সাবা সমুদ্রতীর জুড়ে ময়ূরভঞ্জে, বালেশ্বরে, কটকে, পুরীতে।

এই 'ভূম' অঞ্চলের বাঙালীদের সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মমত প্রভৃতি ছিল সাধারণ বাঙালী সমাজ থেকে কিছুটা ভিন্ন; তা নিয়ে হিন্দু-রাজাদেব বা মুসলমান নবাবদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। ইংরেজেরও মনে বাঙলার আদিম অধিবাসীদের জীবন-যাত্রার কোনো ধারণা ছিল না; তারা সহসা এ সবের পরিবর্তন সাধন করতে গিয়ে এদের সমাজে ও অর্থনীতিতে একটা তোলপাড়ের সৃষ্টি করে বসল। এদের ভুঁঞাদের আর নিজ নিজ অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলার দায়িত্ব রইল না, ফসলের পরিবর্তে টাকায় রাজস্ব দেবার রীতি চালু হল, কড়ির বদলে সহসা টাকা, আনা, পয়সার হিসাব এদের ওপর চাপানো হল, সর্বোপরি কোম্পানির লোকেরা লবণ, সুপারি, তামাক, নীল ও আফিঙের ব্যবসা করল একচেটিয়া। ফলে কবিকঙ্কণের 'কালকেতু' ও ধর্মমঙ্গলের 'কালু-ডোম'দের চিরাচরিত জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়ে উঠল।

ষোড়শ শতকে কবিকঙ্কণের কালেও নগর পত্তনের চিত্র দেখা যায়, অষ্টাদশ শতকে ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলেও সেই একই চিত্র মূলত দুয়ে কোনো প্রভেদ নেই। তখনো চিরাচরিত বৃত্তি অনুযায়ীই সকলে কাজ করে, জীবনযাত্রাও চলে সেই এক পথে, তাই কালু ডোম

"কুলা ডালা বুনিতে বাঁশের বান্ধে বেতি।
ধুচুনি চুপড়ি ঝুড়ি পেয়া ছাতাছাতি॥
পাত পেত বোমা বান্ধি হাঁকাইল বরা।
কুক্কুর পায়রা হাঁসে সাজিল বাজরা॥"

তারপর ডোম বলে,

"হেথা সেথা কে জানে অক্ষয় স্বর্গপদ।
যথা পাই সদাই শূকব মাংস মদ॥"

নৈতিক অবনতির চিহ্ন যে সর্বস্তরে তারও প্রমাণ রয়েছে ঘনরামের রচনায়:

"মহতের দায় মিছা দিবে বায়
দ্বিজে নাহি ধর্ম্মলেশ।
কাণে দিয়া মন্ত্র করে কত তন্ত্র
কেবল কড়ির উদ্দেশ॥"

অর্থাৎ দেশে তখন গুরুগিরির ফলাও কারবার চলছে। তারপর,

"যে যার সহিতে মজিবে পীরিতে
হাতে হাতে হবে ঘর।"

"ত্যজি নিজ পতি সতী কুলবতী
যুবতী অসতী হবে।"

এ সব অবশ্য ভবিষ্যতের আড়ালে বর্তমানেরই চিত্র।

জঙ্গল ও নিমকি মহাল মোটামুটি ছিল বিচ্ছিন্ন, কিন্তু মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দুয়ের মধ্যে একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংযোগ গড়ে উঠল।

কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা, বিশেষ করে লবণের সম্পর্কে আরো একটু বলা প্রয়োজন। ধূর্ত ক্লাইব, সম্ভবত নিজের পকেট ভর্তির জন্যই, এই সব একচেটিয়া ব্যবসার সঙ্গে কোম্পানির সাক্ষাৎ যোগাযোগ রাখল না; এর জন্য একটা ভিন্ন সমিতি গড়ে তুলল। লবণে লাভ হত স্বপ্নাতীত। এই একচেটিয়া ব্যবসা চালু হবার আগে লবণেব যে দর ছিল, বাজার দর এখন তাব অনেক বেশি হয়ে গেল।

ফলে, বাঙালীব দৈনন্দিন খরচ অত্যধিক-বেড়ে গেল, আর বাঙালী ব্যবসায়ীব দল হল বেকার। এদের মধ্যে যাদের কিছু সঙ্গতি ছিল তারা এখন জমি-সংগ্রহের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ফলে চাষীর সঙ্গে লাগল কাড়াকাড়ি ও মনোমালিন্য। সুদখোব গুজরাটী ও রাজস্থানী বাঙলায় জাকিয়ে বসল।

মোগল আমলে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির বহুলাংশই বাঙলাব সঙ্গে যুক্ত ছিল না। এ সব অঞ্চল এসে যুক্ত হল অনেক পরে।

বাঙলার এই পুবের দবজা দিয়ে ভুটিয়া তিব্বতীরা এসে মাঝে মাঝে হানা দিত; শুধু হানাই দিত না, দখলও করত। অষ্টাদশ শতকেই ভুটিয়ারা কোচবিহারের মহারাজার হাত থেকে তাঁর রাজ্য ছিনিয়ে নিল। মহারাজা ইংরেজের কাছে সাহায্য চাইলেন; তাদের সহায়তায় ভুটিয়ারা হল পরাজিত, কিন্তু তাদেরও সাহায্য দিতে এগিয়ে এল তিব্বতীরা। শেষ পর্যন্ত সন্ধি হল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে। ফলে, কোচবিহারের মহারাজা তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন কিন্তু হয়ে রইলেন ইংরেজের করদ মিত্র রাজা।

এদিকে কোচবিহার থেকে ভুটিয়ারা দূর হল বটে, কিন্তু জলপাইগুড়ির বহুলাংশই রইল তাদের হাতে। মাত্র উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে তা এল ইংরেজের তাঁবে, ভুটিয়া যুদ্ধের পরে। এখন এ অঞ্চলকেই বলা হয় পশ্চিম ডুয়ার্স।

আমরা বাঙলার চাষীদের হেস্টিংসের আমলের নিষ্ঠুর ইজারা-দারদের হাতে ফেলে এসেচি। কিন্তু তাঁর এ রীতি আর বেশিদিন

চলল না। আবার জমিদারেরা ফিরে এল ; সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের মনে এল তাঁদের সঙ্গে দশ বছরের জন্য একটা স্থায়ী রাজস্ব নিয়ে পাকা বন্দোবস্তের পরিকল্পনা। কর্ণওয়ালিস এ পরীক্ষায় বাধা দিয়ে বন্দোবস্তটিকে চিরস্থায়িরূপে রূপায়িত করতে চাইলেন। শেষ পর্যন্ত তা-ই হল এবং তা হল ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। এর ফলাফল যথাকালে বলা যাবে।

অষ্টাদশের শেষাশেষি বাঙলায় আরো দুর্বিপাক এলো। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল বন্যা এলো, শস্য নাশ হল, এবং তার পবেব দু'বছরও। শেষে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এল প্রবল ঝড়। মন্বন্তরের ফলে বাঙলা এমনি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তারপর ইংরেজদের সর্বপ্রকারে শোষণনীতির ফলে খাদ্যাভাব দেখা দিল যশোহর, নদীয়া ও মধ্য বাঙলায়। তা বেড়ে উঠল গভর্ণমেণ্টের গাফিলতিতে।

এ কালে বাঙলার স্মার্তপণ্ডিতেরা বেশ উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন। খাদ্যাভাবে নানা অনাচারের জন্য কারো জাতিপাত হবে না বলেই পাঁতি দিয়েছিলেন। শুদ্ধির জন্য যে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন তার খরচও যেমন যৎসামান্য, তার প্রতিক্রিয়াও তেমনি অনাড়ম্বর।

বাঙালী সমাজের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের অশুভ দিনের মধ্যেই, শেষে নয়, অষ্টাদশ শতক শেষ হল। এ দারিদ্র্য শুধু আর্থিক নয়, তার চেয়ে আরো মর্মান্তিক, নৈতিক। তার পরিচয় রয়েছে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দরে'। সে নৈতিক চরিত্রের অধোগতি পরবর্তী রামপ্রসাদী গানে রুদ্ধ হয়নি। সে কালের মানুষ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের অপূর্ব ধ্বন্যাত্মক কাব্যরস

"অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥"

উপেক্ষা করে বর্ধমান শহরে 'দাঁত ছোলা, মাজা দোলা হাস্য অবিরাম'।

হাঁরা মালিনী ও বিদ্যা ও সুন্দরের মিলনপথের সুড়ঙ্গ খুঁজে হয়রান হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালীর চরিত্র আরো কলুষিত হয়েছে শঠ ও অর্থলোভী ইংরেজ বণিকের নিবিড় সংস্পর্শে ও অবাধ শোষণের ফলে।

বন্দে মাতরমের কাল

(উনবিংশ শতক)

[দশ]

ইংরেজ (কোম্পানির আমল)

সিপাহী বিদ্রোহ—১৮৫৭

ইংল্যাণ্ডের মহারানী

ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা—১লা নভেম্বর, ১৮৫৮

মন্বন্তরের দাবানল থেকে বাঙালী সমাজের যে অংশটি রক্ষা পেল তা পড়ল এসে সরাসরি ঠগের খপ্পরে! দেশী ঠগ হলে হয়ত মড়ার ওপর খাঁড়া ধরত না, কিন্তু বিদেশী ঠগের না ছিল এদেশী মানুষের ওপর কোনো দরদ, না ছিল নীতিবোধ। তাই তাদের ব্যবসা বা শোষণ-কার্য চলল অবাধে। চলল তাদের রাজস্ব আদায়ের কড়াকড়ি।

মন্বন্তরে মারা পড়ল বেশি তাঁতি, নৌকার মাঝি, গাড়োয়ান বা অন্যান্য বৃত্তিধারী নিম্নকোটির মানুষ যাদের সাথে জমির কোনো সম্বন্ধ ছিল না। চাষী যে মরল না তা নয়, তবে অপেক্ষাকৃত কম। এদিকে ইংরেজদের ব্যবসারূপ শোষণ যত ব্যাপক হতে লাগল, বাঙালী ব্যবসায়ীর দল, তা ছোটই হোক আর বড়ই হোক, ততই হতে লাগল বেকার। তারা স্বভাবতই জমির দিকে ঝুঁকে পড়ল।

মোটের ওপর, মন্বন্তরের ফলে বাঙালী সমাজ-জীবন হল বিধ্বস্ত; অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের ফলে বাঙালীর সহজাত সন্তোষ ও স্বজাতি-প্রীতির স্রোতে ভাটা পড়ল। মন্বন্তরের পরে কৃষিশ্রমিক পাওয়া হল দুঃসাধ্য; ফলে স্থায়ী চাষীর দলও হতে লাগল বৃত্তিহীন। কিছু কিছু ঠিকা চাষী মিলল বটে। এদেরই বলা হত 'পৈকস্ত রায়ত'। কিন্তু মোটের ওপর চাষের হল অবনতি!

'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র ফলে বাঙালী সমাজের গ্রাম-কেন্দ্রিক অখণ্ড সমাজ-বন্ধনে ছেদ পড়ল। পূর্বে গ্রামবাসী জমিদার ছিলেন সমাজের মধ্যমণি, সর্ববৃত্তিধারীর সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক, বিশেষ করে রায়তের সঙ্গে। তিনি তাঁর অঞ্চলের শান্তি, শৃঙ্খলার জন্য দায়ী থাকতেন। তাই সকলকেই নিরাপদে রেখে যার যার বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করতেন; বিপদে, আপদে অর্থ দিয়েও সাহায্য করতেন। ছোটখাটো বিবাদ-বিসংবাদ, জাতিচ্যুতি, সামাজিক কর্তব্যচ্যুতি প্রভৃতিব বিচারও করতেন। কাজী ও মুফতির দরবারে যেত মুষ্টিমেয় লোক। কিন্তু কর্ণওয়ালিস জমিদারের কাছ থেকে বিচার ও পুলিশের ক্ষমতা কেড়ে নিলেন। জমিদার জমির মালিক হলেন বটে, কিন্তু ইংরেজ সরকারে তাদের দেয় রইল তাদেরই নির্ধারিত কর, তারই ভাগ পেতেন তিনি। সে কর নির্ধারণের জন্য কোনো বিশেষ কানুন ছিল না, কারণ তদারকির অভাবে মোগল আমলে প্রবর্তিত কানুনগোর দপ্তর তখন লুপ্ত।

পূর্ববঙ্গের তুলনায়, পশ্চিমবঙ্গের জমিদারেব ওপর কর বসল অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি, কারণ—পূর্ববঙ্গেব ওপর প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ছিল অপেক্ষাকৃত কম।

ফলে জমিদার বনে গেলেন শুধু রাজস্ব আদায়কাবী, প্রজাহিতৈষী সমাজপতির ভূমিকায় তাঁর ছেদ পড়ল।

তাই অনেক ক্ষেত্রে তিনি বণ্টন করতে লাগলেন তাঁর জমিদারি 'তালুকদার'দের মধ্যে। 'সহিহুল আখবরে'র লেখক স্বজনচাঁদ বলেন, তালুকদারশ্রেণী শুধু বাঙলা দেশেই দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা নগণ্য. হয়ত মাত্র দু'তিনটি গ্রাম নিয়ে তাঁদের রাজত্ব। সে যা-ই হোক, তালুকদারেরা জমি পেলেন জমিদারেরই কাছ থেকে; হয় সেটা দান, নয় কেনা। কর দিতেন জমিদারকেই। গ্রামের সাথে যতই জমিদারের যোগসূত্র ছিন্ন হতে লাগল, গ্রাম ও রায়তের প্রতি মমত্ব-বোধ তাঁর ততই কমে উঠল। শেষাশেষি শহরবাসের

দিকেই তিনি ঝুঁকে পড়লেন। ভাবলেন, এতে ইংরেজের সাথে দহরম-মহরম করে কিছু সুবিধাও বা হতে পারে।

এই তালুকদার বা ছোট জমিদারের সংখ্যার অন্ত ছিল না। ঐতিহাসিকদের মতে, সবচেয়ে বেশি ছিল ময়মনসিংহে (৯০০০), তারপর মেদিনীপুরে (৩০০০), চট্টগ্রামে (১৫০০), ঢাকায় (৪০০)।

মন্বন্তরে বাঙলার তাঁতিরা ধনেপ্রাণে মরেছিল। তারপর এল দেশে ম্যান্‌চেস্টারের কাপড়। জমিদার ঋণদান বন্ধ করেছিলেন; চড়াসুদে রাজস্থানী কুসীদজীবীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কি আর কাজ-কারবার চলে? যা-ও চলত তা-ও প্রায় একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল আরো একটি কারণে। উনবিংশ শতকের শুরু থেকেই জমিদারেরা নিজ নিজ এলাকায় আর পণ্য যাতায়াতের জন্য শুল্ক নিতে পারতেন না; সেজন্য বসেছিল সরকারী চৌকি। সে সব চৌকিতে ইংল্যাণ্ডে-তৈরী কাপড়ের জন্য শুল্ক দিতে হত মাত্র শতকরা দু'টাকা আট আনা আর দেশী কাপড়ের জন্য সতের টাকা আট আনা। কারো বিশ্বাস হয়? কিন্তু কথাটা সত্য। ফল যা হবার তা-ই হল—বাঙলার তাঁতশিল্প উৎসন্নে গেল।

শুধু তাঁতশিল্পই নয়, উনবিংশ শতকের প্রথমপাদেই বাঙলার সবগুলি শিল্পই নষ্ট হয়ে গেল। নূতন শিল্প আর গড়বে কে? এদিকে জনসংখ্যা বেড়ে চলল, কিন্তু সকলেই তখন কৃষিনির্ভর। কৃষিজীবী চিরঋণগ্রস্ত, কাজেই বাঙালী সমাজ ক্রমশ দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হয়ে উঠল। সরকার বিদেশী, শোষণকারী; এদেশের লোক বাঁচল কি অর্ধমৃত হয়ে রইল তাতে তাদের কি যায় আসে? দারিদ্র্যের সাথে অদৃষ্টবাদের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক; বাঙালী হয়ে উঠল তাই পুরোপুরি অদৃষ্টবাদী।

ইংরেজদের কাজকর্ম বাঙলায় পুরোপুরি শুরু হতেই চালু হল গ্রেগরিয়ান পঞ্জী অর্থাৎ ইংরেজী সন, মাস ও দিন। এটি সূর্য-ভিত্তিক: ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগরী এটি ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে সংশোধন করে

দেন। সারা ক্যাথলিক জগৎ এটি মেনে নেয় সঙ্গে সঙ্গেই—ক্রমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এর রাজ্য। গ্রেগরিয়ান পঞ্জীর যে আরো সংশোধন প্রয়োজন তা স্বীকৃত হয়েছে প্রায় একশ' বছর আগে, কিন্তু এ সম্পর্কে কাজ কিছু হয়নি।

ইংরেজ কোম্পানির অসামরিক কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে 'কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম' প্রতিষ্ঠিত হল। পাদরি উইলিয়ম কেরী হলেন সে কলেজের প্রাচ্যভাষা বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ। এ কলেজে পাঠের জন্য বাঙলা অক্ষরে প্রথম ছাপা হল রামরাম বসুর মৌলিক গদ্যের বই 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। কর্মচারীদের শিক্ষা শুরু হল বটে, কিন্তু তখনি ফার্সী ছেড়ে আদালতে ইংরেজী ধরা গেল না—সে পরিবর্তন হল পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর পরে। সেকালে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের সঙ্গে ইংরেজদের দহরম-মহরম ছিল বেশি, কারণ ইংরেজ যখন বাঙলার তহশীলদার তখন হিন্দুরাই বেশি কাজ করত রাজস্ববিভাগে আর ব্যবসায়ীও বেশি ছিল হিন্দু। এরা প্রধানত ইংরেজি শিখে রাজস্ববিভাগে ভাল ভাল কাজের আশায় ঢুকল এসে কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়মে।

পায়ের নিচে থেকে যে কখন মাটি সরে গেছে তা বাঙলার মুসলমানেরা বুঝতেই পারল না—অর্থাৎ তাদের রাজত্বই যে চলে গেল সে জ্ঞান তাদের হল না! তারা তখনো কাজী, মুফতি, ভকীল প্রভৃতি হবার জন্য মাদ্রাসার কোণেই বসে রইল, কারণ বাঙলার শাসনকার্য বা সুবেদারী ইংরেজের রাজস্ব ঠিকাদারির কালে ছিল তাদেরই হাতে।

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে, রাজস্ব আদায়ের আইন-কানুনের হল পরিবর্তন, আর সে আইন-কানুন রচনা করল ইংরেজ। তাই ইংরেজ 'কালেক্টার' হল জমিসংক্রান্ত বিচারের কর্তা আর তার সহযোগী হল হিন্দু। মুসলমানের ছিল সুবেদারী, তাই কাজী, মুফতির কাজ ছিল তাদের একচেটিয়া। কিন্তু পট যে ক্রমশ পরিবর্তন হচ্ছে সে চিন্তা তাদের এলই না।

যাকে আমরা সাধারণত বাঙলার 'রেনেশাঁস' বা বাঙলার নব-অভ্যুদয় বলে বর্ণনা করি, তার শুরু হয় অষ্টাদশের শেষ ধাপে এবং প্রথম পর্ব শেষ হয় উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে। এই প্রথম পর্বের নায়ক ছিলেন তিন জন . স্যর উইলিয়ম জোন্স, রাজা রামমোহন রায় ও পাদরি উইলিয়াম কেরী। এঁরা তিনজনই ভারতীয় চিন্তাধারা ও ঐতিহ্যের কাঠামোর মধ্যেই এই নব-অভ্যুদয়ের সৃষ্টি ও পুষ্টি করতে চেয়েছিলেন। বাঙলার চিন্তাবীর ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে এই ইংরেজ গোষ্ঠীর ছিল একান্ত সহযোগ। স্যর উইলিয়ম জোন্স ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগের পথপ্রদর্শক, রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩০) চিন্তাধারা মূলত সামাজিক ও ধর্মভিত্তিক আর শিক্ষাব্রতী পাদরি উইলিয়ম কেরীর (১৭৬১-১৮৩৪) লক্ষ্য বাঙলা গদ্যের উৎকর্ষ-সাধন ও তাকে সৌন্দর্য-মণ্ডিত করা।

কিন্তু এ প্রচেষ্টায় বাদ সাধলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলকাতার সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য লর্ড মেকলে (১৭৬৮-১৮৩৮)। তাঁর মতে, এ পথে অর্থব্যয় ও প্রচেষ্টা ছিল যুক্তিহীন। ভারতীয়দের যদি সত্যি উন্নতি করতে হয় তবে তার প্রশস্ত পথ হচ্ছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পাশ্চাত্যমুখী করা, কারণ ইউরোপের যে-কোনো একটি ভালো লাইব্রেরীর একটি মাত্র শেলফে যে মূল্যবান্ তথ্য ও জ্ঞান সঞ্চিত রয়েছে তা সমগ্র ভারতীয় ও আরবী সাহিত্যে নেই। লর্ড বেন্টিঙ্ক (১৮২৮-১৮৩৫) থেকে শুরু করে সকল ইংরেজ শাসকই তাই ভারতীয় কাঠামোর পরিবর্তে এদেশে পাশ্চাত্য-দৃষ্টিভঙ্গিকে কায়েম করতে অর্থব্যয় করতে লাগলেন ; পটপরিবর্তন হল বেন্টিঙ্কের আমল থেকে।

বাঙলার যারা নয়া মুসলমান তারা উনবিংশ শতকের শুরু পর্যন্ত শুধু একটা ইসলামী উত্তরীয় গায়ে জড়িয়ে ছিল। শিক্ষিত মুসলমান ও সাধারণ মুসলমানের জীবনযাত্রার মধ্যে ছিল বিরাট পার্থক্য। প্রথম দল মানত শুধু শরিয়ত বা ইসলামী-ধর্মশাস্ত্র। আর দ্বিতীয়

দল মানত তাদের পূর্বতন সংস্কার—হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানী মতের জগাখিচুড়ি। নানা পীরের 'থানে' তারা শিরনি দিত, ওলাবিবি, শীতলা তো মানতই, এমনকি লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা ও দুর্গাপূজাও করত! 'নিরঞ্জন' লাভ বা 'মহাসুখে'র অনুভব ছিল অনেকের লক্ষ্য।

বাঙালী মুসলমানদের এই সব মূল ইসলাম-বিরোধী কার্য-কলাপের দিকে মৌলবী (বিদ্বান্ ব্যক্তি) ও মৌলানাদের (মুসলমান পণ্ডিতের উপাধি) দৃষ্টি পড়ল আরব থেকে 'ওয়াহাবী' ভাবধারার আগমনের কালে। এদের ক্রমাগত-প্রচেষ্টায় সাধারণ বাঙালী সমাজের এই অংশে ঘটল একটা বিরাট পরিবর্তন।

তাই এই নূতন মতবাদের কথাটা একটু স্পষ্ট করে নেওয়া যাক।

এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা অব্দ-অল-ওয়াহাবের ছেলে মহম্মদের জন্ম হয়েছিল মধ্য আরবে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে। এর এক হাতে ছিল তলোয়ার, অন্য হাতে তাঁর মতবাদের খসড়া। সদলে তিনি মধ্য আরবের দু'-একটি ছোট ছোট রাষ্ট্র দখল করে, প্রথম সে সব দেশেই তাঁর মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। কোনো এক সময়ে তাঁর অনুবর্তীর দল মক্কাও দখল করে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে, পারস্য উপসাগরে শুরু করে দস্যুতা।

আরবের ইতিহাস ও ধর্ম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ Zwemer-এর মতে এই মতবাদের মূলতত্ত্ব হল মোটামুটি এই :

(ক) ইসলামকে কোরানের যথাযথ নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত করা। এরা সুন্নী, শিয়া প্রভৃতি কোনো গোষ্ঠীকেই ঠিক শরিয়ত-মানা মুসলমান বলে মনে করত না; এরা ছিল 'জাহিরি'দের মত কোরানের আক্ষরিক অনুবর্তী।

(খ) এরা মৃতের দরগা ইত্যাদি মানত না ; সেখানে যাওয়া, ধূপ-দীপ দেওয়াকে ঘৃণা করত। মুসলমানের পক্ষে তামাক খাওয়া ছিল এদের কাছে নিন্দনীয় আর অশোভন ছিল অঙ্গাভরণ হিসাবে সিল্ক, মণিমুক্তা, সোনা বা রুপার ব্যবহার।

রায়বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ এ মতবাদকে আরব থেকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন। তাঁর দলেরই প্রচারের ফলে এ মতের প্রসার ঘটে এদেশে। ইনিই শিখদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং অত্যল্প কালের জন্য পেশোয়ারও দখল করেন, কিন্তু যুদ্ধে তিনি হত হন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। এ জেহাদে বাঙলার অনেক মুসলমান যুবক, এমনকি কিছু কিছু কৃষকও, কিছু না বুঝে, শুধু ধর্মের জিগির শুনে এসে, অকালে ও অযথা প্রাণ দেয়। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ও পরেও এরা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ প্রচার করে; এর ফলে ইংরেজেরা মুসলমানকে বিষনজরে দেখতে শুরু করে।

বেগতিক বুঝে এরা তাবৎ মুসলমান সমাজে শুধু শুদ্ধিমন্ত্র প্রচার করতে থাকে—সে মন্ত্র মোটামুটি শিয়ামতবাদ-ঘেঁষা। বাঙালী ওয়াহাবী নেতা ছিল তিতু মিঞা বা তিতুমীর; এঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। কিংবদন্তি, এর বাড়ি ছিল রাণাঘাট বা গোবরডাঙ্গার কাছে।

কিন্তু বাঙলার সাধারণ মুসলমানদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এরা আর সশস্ত্র জেহাদে নামেনি, তবে তিতুমীর কিছু দৌরাত্ম্য করেছিল বটে। কিন্তু প্রধানতঃ এদেরই ক্রমাগত প্রচেষ্টায় উনবিংশ শতকের শেষধাপে বাঙালী সাধারণ মুসলমানেরও আচার, আচরণ যায় বদলিয়ে। সেকাল থেকেই শুরু হয় বাঙালী সমাজে হিন্দু মুসলমানের কিছু কিছু প্রভেদ। সে প্রভেদ মূলগত নয়, মাত্র আচারগত।

পূর্ব শতকে বাঙলায় জাহাজ তৈরি সম্পর্কে ওয়েলেসলির ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মন্তব্যের কথা বলা হয়েছে। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পর্যটক সলভিনস্ বাঙালী ছুতারের সে-প্রশংসা আরো স্পষ্ট করে লিখেছেন—বহুপূর্ব কাল থেকেই ভারতীয়েরা জাহাজ তৈরির কাজে ছিল পরম দক্ষ। এখনও হিন্দুরা এ ব্যাপারে ইউরোপকে জাহাজের এত নূতন নূতন নমুনা দেখিয়েছে যে সে-সবেরই ভিত্তিতে নৌ-তৈরিতে নিপুণ ইংরেজ তাদের জলযানগুলির প্রভূত উন্নতিসাধন করেছে।

ভারতীয়দের জাহাজে ঘটেছে সৌন্দর্যের সাথে প্রয়োজনের অপূর্ব সমন্বয় ; কারুশিল্প ও ধৈর্যের বিচিত্র বিকাশ।

চীন যে চায়ের জনক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চীন-এর প্রবাদে চায়ের উল্লেখ খ্রী: পূঃ ২৭৩৭ সন থেকে। সেটা গল্প মাত্র, কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ৩৫০ সনে হয়ত তার প্রথম আবির্ভাব। ভেনিসের লেখক র‍্যামাসেউ (Ramusio) চীনের চায়ের প্রথম উল্লেখ করেন পাশ্চাত্য সাহিত্যে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উইকহাম সপ্তদশের শুরুতেই এর প্রথম উল্লেখ করেন ইংল্যাণ্ডে। তখন সেখানে পানীয় হিসাবে 'কফি' সর্বত্র সমাদৃত। কিন্তু হু' শতকের মধ্যেই চীনের চা যে শুধু ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র, কি দরিদ্রের কুটিরে কি ধনীর প্রাসাদে, কফির আসন বেদখল করে দিল তা-ই নয়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরও ব্যবসার একটি প্রধান পণ্যরূপে গণ্য হল। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চিন্তা হল, চা উৎপাদনের ব্যবস্থা তাদের জমিদারির মধ্যেই করা যায় কিনা, যাতে চীনের ওপর আর নির্ভর করতে হবে না।

উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে মেজর রবার্ট ব্রুশ ও তাঁর ভারতীয় সহকারী মণিরাম দেওয়ান আসামের উত্তর ভাগে খাঁটি ভারতীয় চায়ের সন্ধান দিয়েছিলেন। সেই রিপোর্টটি সম্বল করে বেন্টিঙ্কের আমলে ভারতবর্ষে চা উৎপাদনের জন্য একটি সমিতি গঠিত হল—ফলে হু'লাখ টাকা মূলধন নিয়ে 'আসাম কোম্পানি' শুরু করল চায়ের উৎপাদন। এই আসামের চা ইংল্যাণ্ডে প্রথম এল ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। চা এসেই তার পাকা আসন পেতে বসল। ক্রমে চায়ের বাগানে ভরে উঠল আসামের ব্রহ্মপুত্রের হুধার—ডুয়ার্স, কাছাড়, দার্জিলিং ও শ্রীহট্ট।

এই বেন্টিঙ্কের আমলেই অন্ধ সংস্কারজাত প্রথা সতীদাহের শবদাহ হয়, ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের সতের নম্বর রেগুলেশনে। এরো আগে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেশনে সহমরণ ও অনুমরণ

উভয়ই নিষিদ্ধ হয়েছিল বটে কিন্তু সংস্কারের নিগূঢ় পাশে অমুসলমান বাঙালী সমাজের কি উচ্চকোটি কি নিম্নকোটি, সর্বত্র ছিল এর রাজগি। ধর্মের জিগিরের উচ্চ কোলাহলে একে চরম দণ্ড দেওয়া সম্ভবপর হয়নি। তা সম্ভবপর হল রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সহায়তায়, যদিও গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেবের মত প্রতাপশালী মানুষও ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধবাদী।

বাঙলাদেশে সতীদাহের বিস্তৃতি ও বিন্যাসের একটা ছবি পাওয়া যাবে নিম্নে উদ্ধৃত পরিসংখ্যানে।

(১৮১৫-১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ)

জেলা	বছরে গড়পড়তা
বর্ধমান	৭০
হুগলী	৮২
যশোহর	২০
মেদিনীপুর	১২
নদীয়া	৬২
কলকাতার আশপাশ	৪২
চব্বিশ পরগনা	২১
বাখরগঞ্জ	৫
চট্টগ্রাম	৪
ঢাকা শহর	১৫
ময়মনসিংহ	১ (তিন চার বছরে)
শ্রীহট্ট	১ (দু' বছরে)
ত্রিপুরা	১৫
বীরভূম	৪
দিনাজপুর	১
মুর্শিদাবাদ শহর	৪
রংপুর	৮

জেলা	বছরে গড়পড়তা
রাজসাহী	১ (প্রতি তিন বছরে)
মালদহ	১

সতীদাহ বন্ধ হবার পরে, অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান কবি ডিরোজিও বেন্টিঙ্কের প্রশস্তি গেয়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

প্রধানতঃ দৃঢ় চরিত্রের আদর্শ, শিক্ষাব্রতী ও সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ) চেষ্টার ফলে এই উনবিংশ শতক থেকেই হিন্দু-আইনে বিধবাবিবাহের আর কোনো বাধা রইল না বটে, কিন্তু তা যে খুব ফলপ্রসূ হল তা বলা চলে না। এর কারণ দুটি, একটি বহুযুগের সামাজিক সংস্কারের বাধা, অন্যটি, উচ্চকোটি বাঙালী সমাজে পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের আধিক্য।

এর পূর্বেও অবশ্য মনুসংহিতার বিধিমতে পঞ্চবিধ কারণে স্ত্রীলোকের পত্যন্তর গ্রহণ অনুমোদিত ছিল, কিন্তু সে অনুমোদন নানা কারণে সামাজিক ব্যবস্থাক্ষেত্রে 'পুস্তকস্থ বিদ্যার' মত শুধু তর্কের খোরাক জোগাত।

কিন্তু হিন্দু নারীর মন পত্যন্তর গ্রহণ অপেক্ষা সহমরণ, অনুমরণের দিকেই ঝুঁকে বসেছিল, বহুকাল পূর্ব থেকেই। মধ্যপ্রদেশে ষষ্ঠ শতকের শুরুতে (৫০৯-৫১১) তৈরি একটি স্তম্ভে তার চিহ্ন এখনো বর্তমান।

উনবিংশ শতকেও সে বাধা অতিক্রম করা গেল না। সে যুগের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ) ব্যঙ্গ কবিতায় উচ্চকোটি সমাজের একাংশের মনের প্রতিচ্ছায়া স্পষ্টতর হল। গুপ্তকবির ভাষায়,

"সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।
ছুঁড়ির কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তরে॥
শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শাঁখা॥"

মেকলেব নির্দেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শিক্ষা বিস্তাবে প্রাচ্য-বিদ্যার জন্য অর্থ বিনিয়োগ না করে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রচলনেই সমস্ত অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় কবতে লাগল। প্রথম স্থাপিত হল ফোর্ট উইলিযম কলেজ, এর পবে এল হিন্দু কলেজ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই হিন্দু কলেজই পরবর্তী কালে (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) প্রখ্যাত প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তবিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব সৃষ্টি হল এর ঠিক পঞ্চাশ বছব পবে—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে।

বাঙালী মধ্যবিত্তেব জন্মলগ্ন এর দু-তিন শতক পুর্বে, কিন্তু এর পূর্ণ পবিণতি ঘটল এই শতকে। প্রধানতঃ বাজস্ব বিভাগে ভাল কাজেব লোভেই অবশ্য মধ্যবিত্তেব দল প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে, পবে হিন্দু কলেজে, ভর্তি হল, কিন্তু পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যবিত্ত সমাজেব চিন্তাশীল মানুষকে স্বাদেশিকতার পথ থেকে বিচ্যুত তো কবতেই পারল না ববং সে পথে অগ্রসর হতে সাহায্য কবল। যারা তরলমতি বেসামাল হল শুধু তারাই। ইংরেজী শিক্ষা বাঙালী সমাজে যে দু'টি নূতন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিল তার একটি ঐতিহাসিক, অন্যটি বৈজ্ঞানিক। ফলে চিন্তাশীল, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে নূতনরূপে প্রতিভাত হল অধ্যাত্মচেতনা আর সমাজ-সংহতির পরম প্রয়োজনীয়তা। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বাঙালীর সঙ্গে উনবিংশ শতকেব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীব একটা মূলগত প্রভেদ এসে গেল—সে প্রভেদ নৈতিক চিন্তায় ও চরিত্রে।

এই নব-অভ্যুদয়ের পুরোভাগে ছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ)। রামমোহনের নূতন উপনিষদ্ ব্যাখ্যা, ও ঈশ্বরচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে হিন্দুশাস্ত্রের চর্চা, দুইয়েরই লক্ষ্য ছিল সামাজিক পুনর্মূল্যায়ন। কিন্তু সে সবই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল উচ্চকোটি সমাজে এবং যে নবচেতনাটুকু উদ্বুদ্ধ হল তা হল শুধু শহরভিত্তিক। নিম্নকোটি সমাজ এ চিন্তাধারার এতটুকু স্পর্শও পেল না। রামমোহনের চিন্তাধারায় প্রবল আলোড়ন

দিয়ে গেল ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) কাহিনী। এঁদের কেউ-ই দেশের অতীতকে অস্বীকার বা অশ্রদ্ধা করেন নি ; অতীতের কাঠামোর মধ্যেই এই নবচেতনার উদ্বোধন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। দেশের অতীতকে বর্জন করে, পাশ্চাত্যের ধাঁচে যে সামাজিক বিপ্লব বা পরিবর্তন সম্ভবপর নয় তা কেউ-ই বিস্মৃত হননি। কাজেই মেকলের স্বপ্ন সফল হল না। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ধারার প্রবল স্রোত দেশে এল বটে, কিন্তু তা বইল দেশী খাতেই। কুল ছাপিয়ে দিয়ে তা দেশের কোনো স্থায়ী হানি করতে পারল না।

কিন্তু বাঙালী সমাজের একাংশ, যেটি গোঁড়া মৌলবী ও ওয়াহাবীদের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, সেটি ইংরেজী শিক্ষার দিক্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার ফার্সী নিয়েই মেতে রইল। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি এই বিরাগের মূলে ছিল ইংরেজ-বিদ্বেষ। কেন ? তা বলা যাবে সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাখ্যায়।

উনবিংশ শতকের এই নবচেতনার উদ্বোধন যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যমণি বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ)। এঁর পরিণত বয়সের পরম কীর্তি 'আনন্দমঠ' মানুষকে স্বর্গদ্বারে পৌঁছিয়ে দিল। এটি যে শ্রেণীর রচনা তা 'নয়ন্তি স্বর্গম্' ; এটি সে শ্রেণীর নয় যা 'নয়ন্তি স্বপ্নম্'।

এই 'আনন্দমঠে'র মূলমন্ত্র 'বন্দে মাতরম্'ই উনবিংশ শতকের ইষ্টমন্ত্র। এ শতকে বাঙালী মনীষীরা যা কিছু করেছেন সবই এই 'বন্দে মাতরম্'কেই কেন্দ্র করে। বাঙালী সমাজ তাদের হারানো মাকে খুঁজে পেয়েছে এই মন্ত্রেরই উদ্বোধনে। 'বন্দে মাতরম্'-এর মধ্যে বাঙালী বুঝেছে তার মাতৃভূমির স্বরূপ আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাসিত হয়েছে অখণ্ড ভারতের রূপ। বুঝেছে, "মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি ?"

শুধু 'সন্তান'ই এ মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বঙ্কিমের অনবদ্য ভাষায় 'সন্তান গোষ্ঠী' বলছে, "আমরা অন্য মা মানি না—

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-সমীরণ-শীতলা, শস্যশ্যামলা—" মা।

প্রকৃত বৈষ্ণবীশক্তির উদ্বোধন ছাড়া এ মাতৃপূজা অসম্ভব।* যে বৈষ্ণবীশক্তির উদ্বোধন ছিল মহাপ্রভুর কাম্য তারই মূর্ত রূপ দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের ভাষায় "দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে, ক্রমে দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিতহৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভ-স্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী, পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্তিমান্ রাগ-রাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্তি—লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্যান্বিতা।"

এই বিষ্ণুর কোলে যে মূর্তি তিনিই সন্তানদের 'মা'।

সন্তানের লড়াই অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে—মার পূজাই তাদের ধর্ম, তাদের জীবনের লক্ষ্য। সে অবিচার, অত্যাচার রোধের জন্য প্রয়োজন বৈষ্ণবীশক্তির আবাহন। যে অসহ্য অত্যাচার ও অবিচার চলেছিল দেশের অভ্যন্তরে, যার পরিণতি হল সারা বাঙলার মন্বন্তরে, তার প্রতিরোধের জন্য সশস্ত্র বৈষ্ণবীশক্তির আরাধনাকে কে অস্বীকার করে? বলা বাহুল্য, 'আনন্দমঠ' এই মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে নয়।

এই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রকে বাঙালী যেদিন থেকে ভুলেছে বা হতমান করেছে সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে তার দুর্দিন—সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে তার অধোগতি। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের যে শক্তি

তা নেই 'জয় হিন্দ' 'জয় বাঙলা' বা 'জনগণমন'-এর মধ্যে যদি 'বন্দে মাতরম্'কে অগ্নিস্বরূপ ধরা যায়, তবে এসব তার স্ফুলিঙ্গ মাত্র।

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী সমাজের একাংশের কাছে অপাংক্তেয়। কারণ তাঁর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলা হয়, তিনি পরধর্মবিদ্বেষী ও মূর্তিপূজক। বলা বাহুল্য, একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, তিনি, শুধু ঐতিহাসিক সত্যকে মেনে নিয়ে, অবিচার, অপাংক্তেয় অত্যাচারের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়িয়েছেন—তার লক্ষ্য এ দু'টির দমন—সে অত্যাচারীর ধর্মমত যাই-ই হোক না কেন। মানবতার বিরোধী যা কিছু তার বিরুদ্ধে চলে সন্তানদের সংগ্রাম। বঙ্কিমের মত উদার ও শিক্ষিত মনের কোণেও পরধর্মবিদ্বেষ থাকতে পারে না। দ্বিতীয়, প্রত্যেকটি হিন্দুই তো আপাতদৃষ্টিতে মূর্তিপূজক। মূর্তি একটি প্রতীকমাত্র, ধ্যান-ধারণার সহায়ক। কিন্তু প্রত্যেকটি হিন্দুই জানে যে 'একো হি রুদ্রঃ'—ঈশ্বর অদ্বিতীয়। কিন্তু এই অব্যক্ত, অচিন্তনীয় সত্তার ধারণা কি সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভবপর? 'জয় হিন্দ' 'জয় বাঙলা' বলতে সঙ্গে সঙ্গে দেশের মূর্তি কি মানসচক্ষে ভেসে ওঠে না? আধার-নিরপেক্ষ আত্মার কল্পনা কি এতই সহজ?

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ইংরেজ বাঙলার জমি মেপে যে হিসাব-নিকাশ করেছিল তা ছিল মোটামুটি নিখুঁত। এর ফলে দেখা গেল মোট জমির প্রায় এক-চতুর্থাংশই নিষ্কর। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা মুসলমানদের। ক্রমে ক্রমে, আইন করে, তার ওপর যথাযোগ্য কর বসানো হল। তখন জেলায় জেলায় ইংরেজ 'কালেক্টর' বসেছে, তার সহায়তা করছে কিছুসংখ্যক ইংরেজী-জানা হিন্দু কর্মচারী। মুসলমানী পাইক বরকন্দাজের স্থান নিয়েছে পেয়াদা। একেতো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কিছু কিছু জমিদারি, তালুকদারি মুসলমানের হাত থেকে হিন্দুর হাতে এসেছিল, তারপর নিষ্কর জমিতে কর বসানোর ফলে মুসলমানের বৃত্তিভোগ কমে গেল।

তাই কারো কারো মতে, বাঙালী সমাজের একাংশের বাড়ল ইংরেজ-বিদ্বেষ ও অন্য অংশের প্রতি অসূয়া।

প্রাচীন যাত্রা থেকে বাঙলা নাটকের উদ্ভব হয়েছে বলে যে ব্যাপক ধারণা তা সত্য নয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রথম নাট্যশালা স্থাপন করেন; সেখানে ইংরেজি নাটকই অভিনীত হত। বাঙলা নাটকের মধ্যে প্রথম অভিনীত হল মধুসূদনের নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে), তারপর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে)। দুই-ই হল জনপ্রিয়: ক্রমে ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে বাঙলা নাটকের চাহিদা বাড়ল।

ভারতবর্ষে তথা বাঙলাদেশে দিয়াশলাই-এর প্রচলন হল উনবিংশ শতকের শেষ ধাপে ও বিংশ শতকের প্রথমে। বহুপূর্ব থেকে ছিল চকমকি পাথর—যা ঠোকাঠুকি করলে আগুন জ্বলে উঠত। তারপর এল ডগায় গন্ধক-মাখানো পাটখড়ি। ঘরে ঘরে জ্বলত তুষের আগুন; তার মধ্যে সে পাটখড়ির ডগা ধরলেই আগুন জ্বলে উঠত।

ঘরে ঘরে আলো জ্বলত রেড়ির তেলের। পিলসুজের ওপর সলতে দেওয়া প্রদীপ; ধনীর বাড়িতে পিতলের তৈরি—সাধারণ লোকের ঘরে মাটির। হাওয়ার দাপে তা নিবে যেত বলে তৈরি হল চারদিকে কাঁচ-বসানো টিনের লণ্ঠন, ধনীদের জন্য। কেরোসিন তেল বাঙলায় এল উনবিংশের শেষাশেষি—প্রথম জ্বলত টিনে তৈরি সলতে দেওয়া তেলের কুপাতে। বিংশ শতকে এল আধুনিক লণ্ঠন। ধনীরা ঝাড়লণ্ঠন কিনতেন সাধারণত ওলন্দাজদের থেকে; তাতে জ্বালানো হত মোমের বাতি—সে মোম মৌচাকের, খনিজ নয়।

হিন্দু সমাজে কৌলিন্য প্রথা আর তারই সহযোগী বহুবিবাহ উনবিংশ শতকেও পুরোপুরি অব্যাহত ছিল। বহুবিবাহের প্রতিবিধানের জন্য কোনও আইন প্রবর্তন করা যায় কিনা তা বিবেচনার জন্য ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে একটি

সমিতি গঠিত হয়। এ সমিতি যে বিবরণী পেশ করে তাতে দেখা যায় (ক) মনুর বিধানে কৌলিন্যের কোনো উল্লেখ নেই (খ) বল্লাল সেনের পূর্বে হিন্দুসমাজে কৌলিন্যপ্রথার সৃষ্টি হয়নি।

কিন্তু এ দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে কৌলিন্যপ্রথার সৃষ্টি করেন দ্বাদশ শতকের বল্লাল সেন। এ সম্পর্কে আমাদের যে মতামত তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

আমরা কৌলিন্যপ্রথার বিরুদ্ধে বহু মন্তব্য শুনেছি। এবার ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত লেখক বার্নার্ড শ'র মুখ থেকে এটির সুখ্যাতিও শোনা যাক।

বার্নার্ড শ' লিখেছেন, সাধারণতঃ কুলীনদের ছিল দেহসৌষ্ঠব। কৌলিন্যপ্রথার গুণে এদের প্রজনন শক্তি একটি মাত্র স্ত্রীলোকের মধ্যে নিঃশেষিত হতে না দিয়ে যে প্রথা তা বহু সুগঠিত স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রসারিত করে তাদের অকারণ বন্ধ্যতা ঘুচিয়েছিল, তা হয়ত সামাজিক দিক্ থেকে ন্যায়সঙ্গত।

ঊনবিংশ শতকে আইনত বহুবিবাহ প্রতিরোধ করার চেষ্টা হয়নি ; যেটুকু দমন হয়েছে তা ঘটেছে সামাজিক প্রচেষ্টায় ও শিক্ষা প্রসারের ফলে।

সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছে পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশ' বছর পরে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। অনেক এ বিদ্রোহকে ইংরেজের বিরুদ্ধে জাতীয় বিদ্রোহ বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু এ মতের দৃঢ় সমর্থন ইতিহাসে নেই। মূলত এটি ভারতীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়, যদিও ঝাঁসী, আগ্রা, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র, এমন কি বিহারের কোথাও কোথাও এর রূপ ছিল জাতীয় বিদ্রোহের মত। তবে বিদ্রোহীরা প্রগতিপন্থী ছিল না।

ভারতীয় সিপাহীদের তীব্র অসন্তোষ এই বিদ্রোহের ভিত্তি ; কেন ঘটেছিল সে অসন্তোষ তা স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। সে অসন্তোষের

প্রজ্বলিত বহ্নি নির্গত হল প্রথম মঙ্গল পাণ্ডের রাইফেল থেকে ব্যারাকপুরে।

বাঙলা এ বিদ্রোহের আঁতুড়ঘর হলেও সাধারণ বাঙালী সমাজের কোন দৃঢ় সমর্থন এর শক্তি জোগায় নি। শুধু তার একাংশের অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিদ্রোহ মৃদু কম্পন এনেছিল। সাধারণভাবে সমাজের উভয় অংশেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি জন্মেছিল বটে, তবে তা সামগ্রিক নয় আর যে সব কারণে অসন্তোষ জন্মেছিল তার বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ইংরেজদের সমর্থনে, দাঁড়িয়েছিল অনেক গণ্যমান্য বাঙালী। তাই এ অসন্তোষের তীব্রতা ছিল কম। যে সব কারণে এ সামাজিক অসন্তোষ জন্মেছিল, তার একটি মোটামুটি তালিকা তৈরি করা যাক। প্রথমত, গঙ্গায় শিশুসন্তান বিসর্জন আইনত দণ্ডনীয় হল ১৭৯৫ ও ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধ হল সতীদাহ। তারপর এল হিন্দুর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে একটি পরম বাধার অবলুপ্তি : পূর্বে হিন্দু পরধর্ম গ্রহণ করলে শাস্ত্রমতে তার সম্পত্তি হারাত। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের আইনের বলে সে বাধা আর রইল না। তারপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চকোটি হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ আইন অনুমোদিত হল। ফলে, কুসংস্কারের দাস এক শ্রেণীর গোঁড়া হিন্দুর মধ্যে 'ধর্ম গেল' 'ধর্ম গেল' রব উঠল।

হার্ডিঞ্জের (১৮৪৪-১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) প্রকল্প রূপ পরিগ্রহ করল ডালহৌসীর (১৮৪৮-১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) আমলে। বসল রেলপথ, শুরু হল টেলিগ্রাফে খবরাখবর পাঠানো, প্রচলিত হল বসন্তের টিকা, শীতলাদেবীর ক্ষমতা পেল হ্রাস। এগুলির অনেকটাই সাধারণ জনের কাছে জাদুবিদ্যার রকমফের বলে মনে হল।

সুশ্রুত-সংহিতার কথা আর কে মনে রেখেছে? কাজেই মেডিক্যাল স্কুলে শবব্যবচ্ছেদ ছেদকের পক্ষে যেমন বিবেচিত হল অশুচিকর, মৃতের পক্ষে তেমনি হল পারলৌকিক সদগতির প্রতিবন্ধক।

স্ত্রীশিক্ষার জন্য খ্রীষ্টান পাদরিদের প্রচেষ্টাকে জনসাধারণ আমাদের অন্তঃপুরের খিড়কি দরজা দিয়ে খ্রীষ্টধর্মের পথ প্রশস্ত করা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারত না। আর তার কারণও ছিল। খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের জন্য এমন উগ্র প্রচেষ্টা আর কখনও হয়নি। সিপাহী বিদ্রোহের আগেই ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র নানা ধরনের গির্জা ও মিশন স্থাপিত হয়েছিল, বাইবেলও ভারতীয় নানাভাষায় অনূদিত হয়ে বিনামূল্যে বিতরিত হতে শুরু হয়েছিল—পাদরিরা পথের মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে ধর্মপ্রচার করত। এমনকি, কোম্পানির উচ্চপদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীরাও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে সক্রিয় সাহায্যের জন্য জোর-জবরদস্তির পথ গ্রহণেও দ্বিধা করত না। এর ওপর ভালো ভালো চাকুরির লোভ তো ছিলই। সবারই ইচ্ছা ছিল দেশটাকে রাতারাতি খ্রীষ্টধর্মী করে তোলা।

এসব মিলে সাধারণের মনে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে একটা সামাজিক ক্ষোভের সৃষ্টি তো হয়েছিলই, তার ওপর বিশেষ করে বাঙলার চাষী ও গ্রামবাসীদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। তা যে ছিল না তার সাক্ষ্য রয়েছে সেকালের পাদরিদের বিবরণে। দেশে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানির অন্ত ছিল না। পুলিশ তা দেখেও দেখত না। জমিদার করত শুধু রাজস্ব আদায়, প্রজার সুখদুঃখের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ ছিল না। ইংরেজ কালেক্টর কিছু বুঝতেন না, তাঁর নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা তাঁকে যা বোঝাত তা ছাড়া। বাঙলার চাষী রইল চিরদুর্দশাগ্রস্ত।

এই তো গেল বাঙালী সমাজের একাংশের হাল। অন্য অংশ, বিশেষ করে ওয়াহাবী প্রচারের ফলে, হয়ে উঠেছিল ইংরেজ ও শিখ বিদ্বেষী! ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রসর বলে অন্য অংশের প্রতি অসূয়াও বেড়ে গিয়েছিল। দু'দলের চাষীদের মধ্যে তখনও বজায় ছিল নিবিড় সৌহার্দ্য কারণ উভয়ই ছিল সমান নিপীড়িত, সমদুঃস্থ। কিন্তু যারা চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত তারা ক্রমশ বুঝতে শুরু করল যে

সর্বপ্রকার ক্ষমতা মুসলমানের হাত থেকে ইংরেজের হাতে চলে যাচ্ছে আর ইংরেজের দক্ষিণহস্ত হয়ে উঠেছে হিন্দু। ফলে, তাদের রুজি-রোজগারে ভাটা পড়তে শুরু করেছে। তাই তাদের প্রত্যক্ষ বিষদৃষ্টি ইংরেজের উপর পড়লেও, পরোক্ষ বিষদৃষ্টি পড়ল হিন্দুর উপর। দুয়ের মধ্যে উনবিংশ শতকের শেষাশেষি গড়ে উঠতে লাগল একটা অদৃশ্য প্রাচীর। এই প্রাচীরের আংশিক ভিত্তি যে সিপাহী বিদ্রোহ তাতে সন্দেহ নেই। কারণ বাঙলায় হিন্দুদের কাছে সিপাহী বিদ্রোহের সমর্থনে কোনো সাড়া মেলেনি।

আগেই বলা হয়েছে, বাঙলার উনবিংশ শতকের নব-অভ্যুদয়ের যে প্রথম কাঠামো তৈরি হয়েছিল তা পুরোপুরি ভারতীয়। তারপর এল মেকলের নির্দেশ। পরবর্তী কালে কাঠামোর খোলনলচে বদলাবার ধুম পড়ে গেল। রাতারাতি দেশটার সমস্ত বাসিন্দাকে খ্রীষ্টান করে ও ইংরেজি শিক্ষা দিয়ে মোটামুটি সভ্য-ভব্য করে তুলবার একটা উগ্র প্রচেষ্টা দেখা দিল। ফলও ফলল। তরুণ বাঙালী শিক্ষার্থীরা ছিল নিজেদের শিক্ষা, দীক্ষা, দর্শন ও ঐতিহ্য সম্পর্কে নিতান্তই অজ্ঞ। বাইরের খ্রীষ্টান প্রচারকদের কথা তো ছেড়েই দেওয়া গেল, হিন্দু কলেজে ডিরোজিও প্রভৃতি শিক্ষকের (১৮২৬-১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ) প্রচারের ফলে এই তরুণ বাঙালী শিক্ষার্থীরা ভারতীয় তথা হিন্দু সমাজের প্রতি পরম অশ্রদ্ধাশীল হয়ে চরম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে দাঁড়াল।

সমাজের এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে দূর করে পাদরিদের অবাধ খ্রীষ্টধর্মের দীক্ষাদান প্রতিরোধ করার জন্য দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের সৃষ্টি। মূলত ব্রাহ্মধর্ম সেকালের হিন্দুর অন্ধসংস্কারমুক্তির প্রয়াস মাত্র, মূল লক্ষ্য হিন্দুর আত্মবিস্মৃতির ফলে খ্রীষ্টধর্মের দিকে ঝুঁকে-পড়া রোধ করা। ব্রাহ্মধর্ম তাই পরিকল্পিত হয় সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষার অস্ত্র হিসাবে ; কাজেই সে-ধর্ম—এই সামাজিক সংগ্রামের ইতিহাস। সামাজিক স্বাস্থ্য ক্রমশ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে

ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। হয়ত পরবর্তী কালে তা প্রায় অবলুপ্তই হয়ে যাবে।

দলাদলি করে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। দেবেন্দ্রনাথের 'আদি ব্রাহ্মসমাজ', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' ও কেশবচন্দ্রের (জন্ম ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) 'নববিধান: তিনটিরই মূল লক্ষ্য একই, শুধু প্রকারে প্রভেদ। পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টধর্মের বাহবা পেয়ে মত্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে আত্মস্থ করেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ (জন্ম ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ)। এঁরা সবাই বাঙালীর অধ্যাত্মজীবন গঠনে সাহায্য করেছেন, বিশেষ করে শিক্ষিত যুবকদের প্রাচ্যের প্রতি অজ্ঞতাবশত অবজ্ঞা ও পাশ্চাত্যের প্রতি মোহজাত আসক্তি থেকে।

এ পর্যন্ত যাঁরা মেকলে প্রবর্তিত এই পাশ্চাত্যকরণ পদ্ধতিকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরা কেউ তাঁদের মূক প্রচেষ্টাকে যথাযোগ্য ভাষা দিতে পারেন নি। তা করতে পেরেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অমৃতবর্ষী ও সৃষ্টিধর্মী লেখনীতে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে দেখলেন, ইংরেজি শিক্ষিত যুবকেরা, পাশ্চাত্যদর্শনের ব্যাপক চর্চার ফলে, অধিবিদ্যার দিক্ থেকে মুখ ফিরিয়ে যুক্তিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তাঁর নিজেরও তরুণ বয়সে তা-ই হয়েছিল। কাজেই অধ্যাত্মবাদের স্তুতি গেয়ে আর তাদের উজ্জীবিত করা চলবে না। কাজেই যে পাঞ্চজন্য তিনি বাজালেন তার সুর অভিনব—সে সুর স্পষ্ট করে এদেশে কখনো শোনা যায়নি। সে সুরে স্বাধীনতা-সংগ্রামের আহ্বান, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' মন্ত্রে বোধনের ডাক, দেশমাতৃকার পূজার মন্ত্র। এ মন্ত্রের সাধনে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন চরিত্রগঠন—সন্তানধর্মের প্রকৃত রূপ। অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান! মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল 'আনন্দমঠ'; তাই অনেকে একে মুসলমানরাজ্যের ধ্বংস ও হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতীক বলে ধরে

অযথা ব্যথিত হয়েছেন। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র যে সর্বদেশ ও সর্বসমাজের মুক্তিমন্ত্র তা একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট হবে। এ মন্ত্র যদি সাম্প্রদায়িকই হত, তবে পরবর্তী কালে শত শত তরুণ বাঙালী ইংরেজের বিরুদ্ধে অহিংস ও সশস্ত্র সংগ্রামে এই মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়ে প্রাণ দিতে পারত না।

'আনন্দমঠ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালী তরুণ সমাজের চিন্তাধারার মোড় ফিরে গেল। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণকে মনে হল দাসত্ব; দেশপ্রেমের বন্যায় সমাজের অনেক কলুষ ধৌত হয়ে বাঙালী তরুণ একটা নূতন জীবনের সন্ধান পেল।

ক্রমে সিপাহীদের বিদ্রোহ দমন হল বটে, দেশও শান্ত হল, কিন্তু দেশের লোকের মনে কোম্পানির শাসনব্যবস্থা যে ধর্ম নিরপেক্ষ ও উদারনীতিভিত্তিক এ ধারণা গড়ে উঠল না। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তা বুঝতে পেরে ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ শাসন চালু করল। যদিও ১৮১৩ ও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের 'চার্টার অ্যাক্টে'র ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকৃত সমগ্র অঞ্চলের উপরই ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের দখলীস্বত্ব কায়েম হয়েছিল, তবু স্পষ্ট ভাষায় তা জনসাধারণের কাছে পেশ করার একান্ত প্রয়োজন ছিল। ফলে, ইংল্যাণ্ডেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁর প্রসিদ্ধ ঘোষণা প্রচার করলেন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর।

এই ঘোষণায় তিনটি মূল বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হল। প্রথম, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট দেশী রাজরাজড়ার সঙ্গে কোম্পানি যে সব সন্ধি করেছে তার সমস্ত শর্ত অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলবে। দ্বিতীয়, শাসনযন্ত্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং সরকারী চাকুরিতে ধর্মের অজুহাতে কেউ কোন বিশেষ সুবিধা পাবে না। তৃতীয়, উত্তরাধিকারিশূন্য রাজন্যবর্গের রাজ্য আর বাজেয়াপ্ত করা হবে না; তাঁরা দত্তক উত্তরাধিকারী গ্রহণ করতে পারবেন তাঁদের ইচ্ছামত।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার ফলে সর্বসাধারণের মনে যে একটা পরম আস্থা ফিরে এল তাতে সন্দেহ নেই। সামাজিক

ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার বাঙালী সমাজকে আশ্বস্ত করল।

এ সম্পর্কে 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে মন্তব্য করা হয়েছিল তার উল্লেখ করা হচ্ছে।

"শ্রীশ্রীমতি বিশ্বমাতা রাজ্যেশ্বরীর রাজ্যোৎসব উপলক্ষে ১লা নবেম্বর সোমবার বৈকালে এবং যামিনীযোগে এতন্মহানগরে মহামহা মহোৎসব অপেক্ষা মহাব্যাপার ঘটিয়াছিল, যৎকালে গভর্ণমেণ্ট হৌসে শ্রীশ্রীমতি জননীর ঘোষণাপত্র পঠিত হয় তৎকালে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় মানবশ্রেণীর সমারোহ হইয়াছিল।

... ...

ভিখারী ও ভিখারিণী পর্যান্ত দুইটা প্রদীপের আলো জ্বালাইয়াছিল, 'দুগ্ধপোষ্য শিশু ও কুলবধূরাও' মহারাজ্ঞীর মঙ্গলমানসে মঙ্গলাচরণ পূর্বক দীপ জ্বালিয়াছে, সকলেই জয় প্রার্থনা করিয়াছে ও করিতেছে।

... ...

যে প্রদীপের হাজার দুইটাকা ছিল, তাহা ১০।১২।১৫ পরে ২০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল।"

উনবিংশ শতকের চতুর্থপাদে যে দু'টি নূতন জিনিসের আমদানিতে মধ্যবিত্ত ও উচ্চকোটি বাঙালী সমাজের জীবনযাত্রায় বিরাট পরিবর্তন সাধিত হল তার প্রথমটি কয়লা, দ্বিতীয়টি কেরোসিন তেল। এদেরই সমগোত্রীয় আর একটি নূতন জিনিস এল বিংশ শতকের প্রথমপাদে। সেটি ঢেউ-খেলানো টিনে-কলাই করা লোহার পাত। ফলে বাঙলায় গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে ঘটল অভূতপূর্ব পরিবর্তন।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলায়ই প্রথম কয়লার প্রচলন ঘটল; বস্তুত এটি যন্ত্রযুগের পথে ভারতবর্ষের প্রথম পদক্ষেপ। সে যাত্রার নায়ক বেঙ্গল কোল কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ ঠাকুর। বেঙ্গল

কোল কোম্পানির কাজ শুরু হয়েছিল রানীগঞ্জ অঞ্চলে। তখনো বাঙলায় রেলপথ বসেনি, তাই মাল চলাচল করত জলযানে। পরে রেলপথ বসলে ইঞ্জিনের খোরাক প্রথম জোগাত বেঙ্গল কোল কোম্পানিই।

কয়লা ব্যবহারে কিন্তু বাঙালী সমাজের দ্বিধা ছিল বহুদিন। গ্রামে তো দূরের কথা, কলকাতার সমাজেও রসুইঘরের এ পরিবর্তন সহজে সাধিত হয়নি। বাঙলার চিরন্তন জ্বালানি হল সহজলভ্য কাঠ ও ঘুঁটে : এদের হঠাতে কয়লা হিমসিম খেয়ে গেল। কয়লার আগুনের আঁচ পাচকের চোখের ও দেহের পক্ষে ক্ষতিকর আর সে আগুনে রান্না-করা খাদ্য স্বাস্থ্যের প্রতিবন্ধক—এ ধারণা বহুলোকের মধ্যে ছিল বদ্ধমূল ; এর ওপরে ছিল ধোঁয়ার জ্বালা ও দামের বহর। কাজেই প্রথমে বেঙ্গল কোল কোম্পানিকে নানারূপে প্রচারকার্য চালাতে হল। এ কয়লার যুগে আজকে তা হয়ত অনেকেরই বিশ্বাস হবে না।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় বার্মা যুদ্ধের পরে বার্মা ইংরেজের অধিকারে এল আর যুক্ত হল ভারতবর্ষের সঙ্গে। এরই অব্যবহিত পরে স্কটল্যাণ্ডে পত্তন হল বার্মা অয়েল কোম্পানির। বার্মার খনিজ তেলের খোঁজ ও তা নিয়ে কারবার হল এদের লক্ষ্য। বার্মা অয়েল কোম্পানির পত্তনের আগেও হাতে-খোঁড়া তেলের কুয়া থেকে কিছু কিছু তেল উঠত বটে, কিন্তু তা ভারতবর্ষে আসত না।

কয়লার সহোদর কেরোসিন। সহোদরের মত কেরোসিনকে কিন্তু ঝড়ঝাপটার মধ্য দিয়ে জীবন-যাত্রা শুরু করতে হয়নি। কেরোসিন বাঙলায় পেল সাদর অভ্যর্থনা—প্রথম থেকেই এর চাহিদা বেড়ে যেতে লাগল। পরিস্রুত কেরোসিনে উচ্চকোটি ও মধ্যবিত্তের ঘর আলোকিত হল। অপরিস্রুত লাল তেল ঠাঁই পেল গরিবের ঘরে ঘরে, কারণ তা জ্বলে ধীরে.তাই তাতে খরচা অপেক্ষাকৃত কম। ডিগবয়ের আসাম অয়েল কোম্পানি এই বার্মা অয়েল কোম্পানিরই

সহযোগী। এ অঞ্চলে তেলের খোঁজ প্রথম আনে রেলের ইঞ্জিনিয়ররা ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। অবশ্য সে কোম্পানির পত্তন হয় বহু পরে—বিংশ শতকের প্রথম পাদে।

প্রথম শহরে, পরে গ্রামে, গৃহনির্মাণে যুগান্তর আনল ঢেউ-দোলানো টিন। বাঙলায় সুরকি ইঁটে গাঁথা বাড়ির সংখ্যা বেশি ছিল না, এমনকি কলকাতা শহরেও। শণ, বাঁশ ও কাঠের ঘরে আগুন লাগা ছিল অত্যন্ত সহজ ব্যাপার এবং প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে অগ্নিকাণ্ডের ফলে সর্বত্র বহু বাড়িঘর পুড়ে গৃহস্থ সর্বস্বান্ত হত। কলকাতা শহরও বহ্নিযজ্ঞের আহুতি জুগিয়েছিল অষ্টাদশ শতকে। তাই, যখন ঢেউ-দোলানো টিনের প্রচলন হল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তা জনপ্রিয় হল উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মধ্যে : ঘরের চালে, দোচালায় বা চৌচালায়, 'শণে'র পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে শুরু হল 'টিন'।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাঙালী সমাজের সঙ্গে ইংরেজের সংযোগ ঘটল। সে সংযোগ বাড়তে লাগল কলকাতার ক্রমবর্ধমান ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে। কলকাতার পরিধি ও প্রাধান্য যত বাড়তে লাগল, ততই কমতে লাগল বাঙলার অন্য দুটি ব্যবসাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ; এ দু'টি ব্যবসাকেন্দ্রের প্রথমটি ঢাকা আর দ্বিতীয়টি মুর্শিদাবাদ। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগরের বিদ্যার্জন ক্ষেত্রের অবক্ষয়।

শেষে উনবিংশের প্রথম থেকেই কলকাতা হয়ে উঠল সারা বাঙলার মধ্যমণি, বাঙালী সমাজের প্রতিনিধি ও আদর্শ। ব্যবসার মধুলোভে এখানে এসে জুটতে লাগল নানারকমের অলি। এল মাছ-ওয়ালা, দুধ-ওয়ালা, ধোপা, নাপিত, কামার, স্বর্ণকার, পিতল ও তামার কারিগর, সুগন্ধি ও মসলা বিক্রেতা, ফুল-ওয়ালা। এল ছুতার, কামার আরো কত রকমের ব্যবসায়ী। কলকাতার এই হরেক রকমের ভিড়ে তারা সামাজিক বিভেদের পাশ থেকে মুক্ত হয়ে একটা পাঁচ-মিশালী নূতন সমাজ গঠন করল। এ সমাজে

বহুমান্য অতিথি হিসাবে ঠাঁই পেল ইংরেজ। তা বলে যে এ ভিড়ের মধ্যে অন্য কোনো পাশ্চাত্য জাতি ছিল না তা নয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই প্রতিনিধি ছিল বাঙলার কলকাতায়; ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী, আমেরিকা, সুইডেন, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এমনকি চীনেরও।

বহুমান্য অতিথি হলেও, ইংরেজেরা বাঙালীকে হেয় চক্ষেই দেখত। প্রথম প্রথম উচ্চশ্রেণীর ইংরেজের সঙ্গে কলকাতার বর্ধিষ্ণু ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী পরিবারের দহরম-মহরম ছিল বটে; তাদের বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজা-পার্বণেও তারা নিমন্ত্রিত হয়ে যথারীতি সামাজিকতা রক্ষা করত। কিন্তু ক্রমশ তারা বাঙালীর সামাজিক গণ্ডির বাইরে চলে যেতে লাগল। শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে অদৃশ্য দেওয়াল থাকে তা প্রথম সংযোগের কুয়াশা ভেদ করে স্পষ্ট হতে লাগল। প্রথম পর্বে ইংরেজেরা তাদের দেশে মান্যগণ্য বাঙালীদের যে সম্মান প্রদর্শন করত তা ক্রমে ধাপে ধাপে নেমে গেল।

এর কারণও ছিল। কলকাতার এই মিশ্র বাঙালী সমাজ সম্পর্কে ঊনবিংশের প্রথম ধাপে হেস্টিংস, ঐতিহাসিক মিল, মেকলে প্রভৃতি সবাই অতি কদর্য মন্তব্য করে গিয়েছেন। এঁদের সবারই মতে বাঙ্গালী ভীরু, সভ্যতাবর্জিত, কপট, অসত্যবাদী, দুর্বল এমনকি পাশ্চাত্যের সর্বাপেক্ষা হেয় জাতিরও অধম অর্থাৎ সর্বদোষসমন্বিত! ক্বচিৎ পাদরি হেবারের মত দু'-একজন মাত্র এঁদের সঙ্গে একমত হননি।

কলকাতার পাঁচমিশালী বাঙালী সমাজের বাইরে যে বৃহত্তম বাঙালী সমাজ গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতাকে আশ্রয় করে বর্তমান ছিল তাদের অস্তিত্ব এদের কাছে তত স্পষ্ট ছিল না। তাই এঁদের মন্তব্য সর্বজনমান্য নয়; সর্বদিক্ বিচার করে রাজা রামমোহন যে মন্তব্য করেছেন তা-ই মোটামুটি সত্য বলে ধরা যায়। তিনি বলেন,

মুষ্টিমেয় শহরবাসী বাঙালী সম্পর্কে এ মন্তব্যগুলি আংশিক সত্য বটে, কিন্তু চাষী ও অন্যান্য গ্রামবাসী যারা শহরের ছোঁয়াচ ও আইন-আদালতের সংস্পর্শ থেকে দূরে রয়েছে তারা যে কোনো সভ্য দেশের লোকের মতই সং, সংযত ও নীতিবাদী। বস্তুত শহরবাসী বাঙালী দু'টি কারণের জন্য মুসলমান আমলের চরম অত্যাচার সহ্য করেও তাদের দাসত্ব করেছে; এই কারণের প্রথমটি তাদের শারীরিক দুর্বলতা, দ্বিতীয়টি কোনো অন্যায় প্রতিরোধের সাহস ও উৎসাহের অভাব।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের মুখেও সেই একই কথা। তিনি বলেছেন, বাঙালীর সততার অভাব, চরিত্রের শিথিলতা, পরাধীনতায় অসহায় বোধ সবই তার ধর্মের অধোগতি ও শিক্ষাহীনতার পরিণতি। এসব দোষই কিন্তু বহু বছরের পরাধীনতার ফল। মুসলমান সুলতানেরা এদেশে কোন্ আদর্শ প্রচার করেছেন? যা করেছেন তা হল জঙ্গীশাহীদের অশিক্ষা ও কুশিক্ষাজাত অসংযম ও চরিত্রহীনতার আদর্শ।

রূঢ় হলেও কথাটা সত্য।

বাঙালী সমাজের এই চরম অধোগতির প্রধান নিদর্শন রয়েছে সেকালে তাদের স্ত্রীলোকের সামাজিক অবমাননায়। এই কালে অ্যাডাম বাঙলা ও বিহারের শিক্ষা সম্পর্কে যে বিবরণী পেশ করেন তাতে দেখা যায়, স্ত্রীশিক্ষার তখন নামগন্ধও ছিল না। প্রতিটি ঘরেই স্ত্রীলোক ছিল ভারবাহী গৃহপালিত পশুর মত—আজ্ঞাবহ দাসী। বাঙালী সমাজের এই হীনতম চিত্র বিস্তৃত করে দেখাবার প্রয়োজন নেই। বাঙালী সমাজের এই দীন ও অবনত পরিণতির দিকে প্রথম অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন কবি শ্রীমধুসূদন।

আদমশুমারের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য না থাকলেও, ঐতিহাসিকদের মতে উনবিংশের শুরুতে বাঙালী সমাজের মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান। এই অংশটুকু বৃহত্তর অংশ থেকে ক্রমে বিচ্যুত হতে শুরু

করেছিল, নানা আন্দোলনের ফলে। অ্যাডামের বিবরণীতে তখনো কিন্তু দেখা যায় যে বাঙলা ও বিহারে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই শিক্ষাদান হত বাঙলা ভাষায়ই, যদিও মুসলমান সাধারণত কথ্য ভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানী ও উর্দু দুই-ই গ্রহণ করেছিল।

বাঙালী সমাজের সর্বব্যাপারে ইংরেজের সহজ অনুপ্রবেশের কারণ—সেদিন ইংরেজকে কোনো বাঙালীই, বিদেশী ভাবলেও, একটা ভিন্ন জগতের অধিবাসী ও ভিন্ন সংস্কৃতির ধারক হিসাবে গণ্য করত না। অখণ্ড ভারতবর্ষের চিন্তা বাঙালীর মনের কোণেও ছিল না, এমনকি অখণ্ড বাঙলাও তার কাছে স্পষ্ট ছিল না। যে হিসাবে ইংরেজ বিদেশী, সে হিসাবে তার কাছে মারাঠী, রাজপুত ও শিখও ছিল বিদেশী। অনেক ক্ষেত্রে নিকটতম বিদেশী অপেক্ষা সুদূরের বিদেশী ছিল অধিকতর আপনজন। যেমন মারাঠী অপেক্ষা ইংরেজ ছিল অধিকতর প্রীতিভাজন; বর্গীর সাজে মারাঠী বাঙালীর উপর যে অকথ্য অত্যাচার করেছিল তা বাঙালীর মানসপটে বহুদিন ছিল মুদ্রিত ও উজ্জ্বল।

কলকাতা প্রথম থেকেই গড়ে উঠতে লাগল সার্বজাতিক অঞ্চলের রূপ নিয়ে। সেখানে ঠাঁই ছিল সর্বজগতের মানুষের। এর ফলে কলকাতার বাঙালী সমাজ মনের যে স্বাভাবিক প্রসারতা লাভ করল তার পরিচয় আজও পাওয়া যাবে। বাঙলাদেশে এখনো ভারতবর্ষের সকল দেশের লোকেরই স্থান রয়েছে; বাঙলার অর্থ বা সামর্থ্য কেবল বাঙালীর নিজস্ব সম্পত্তি একথা বাঙালীর মনে ঠাঁই পায় না। এ উদারতা তার সহজধর্ম অথচ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মানুষের পক্ষে এই একাত্মবোধ বহুসাধনালভ্য।

কিন্তু এর একটা অশুভ দিকও রয়েছে। এই সার্বজাতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই বাঙালীর স্বদেশবাসীর প্রতি মমতা ও আত্মীয়তাবোধ সম্যক বেড়ে ওঠেনি। একজন পাঞ্জাবী বা মাদ্রাজী তার স্বপ্রদেশবাসী মানুষের যত প্রিয় এবং তার হিত যতটা তার কাম্য বাঙালীর

কাছে অন্য বাঙালীর প্রীতি ও হিত ততটা কাম্য নয়। এর অবশ্যম্ভাবী ফল শিথিল সমাজ শক্তি যার অভিব্যক্তি আজ দেশের সর্বত্র।

কলকাতার গণ্ডির মধ্যে ঊনবিংশ শতকে যে পাঁচমিশালী বাঙালী সমাজ গড়ে উঠেছিল, তার স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে'। এ পুঁথির প্রথম প্রকাশ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। 'আবদর রহমান গুল-মহামদের লেড়খা ও আমপক্ (সম্মানিত) গোলাম হোসেনের পোতা' ঠকচাচা, ঠকচাচী, বাবুরাম বাবু, ব্লাকিয়র সাহেব, বাঞ্ছারাম বাবু—সবাই সেকালের সমাজের জীবন্ত চিত্র। পুঁথিখানা থেকে ঠকচাচা ও ঠকচাচীর কিছু পরিচয় দেওয়া যাক।

"ঠকচাচার বাড়ীটি শহরের প্রান্তভাগে ছিল—দুই পার্শ্বে পানা পুষ্করিণী, সম্মুখে একটি পিরের আস্তানা। বাটীর ভিতরে ধানের গোলা, উঠানে হাঁস, মুর্গি দিবারাত্রি চরিয়া বেড়াইত।… …কর্মকাজ শেষ হইলে গোসল ও খানা খাইয়া বিবির নিকট বসিয়া বিদ্রির গুড়গুড়িতে ভড়র ভড়র করিয়া তামাক টানিতেন। সেই সময়ে তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষের সকল দুঃখসুখের কথা হইত। ঠকচাচী পাড়ার মেয়ে মহলে বড় মান্যা ছিলেন—তাহাদিগের সংস্কার ছিল যে তিনি তন্ত্রমন্ত্র, গুণ করণ, বশীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, তুকতাক, জাদু ভেল্কি ও নানা প্রকার দৈব বিদ্যা ভাল জানেন, এই কারণে নানা রকম স্ত্রীলোক আসিয়া সর্বদাই ফুস ফাস করিত।"

বাবুরাম বাবু ঘরে সতীলক্ষ্মী স্ত্রী থাকতেও বুড়া বয়সে আবার বিয়ে করতে চলেছেন। বাধা দিচ্ছেন বাঞ্ছারাম বাবু। বাবুরাম বাবু বলেন "আমি এমন বুড় কি? তোমার চেয়ে আমি অনেক ছোট, তবে যদি বল আমার চুল পেকেছে ও দাঁত পড়েছে—তা অনেকের অল্প বয়সেও হইয়া থাকে। ……দেখ একটা ছেলে বয়ে গিয়েছে আর একটা ছেলে পাগল হয়েছে—একটি মেয়ে গত আর একটি প্রায় বিধবা। যদি এ পক্ষে দুই একটি সন্তান হয় তো বংশটি রক্ষে

হবে। আর বড় অনুরোধে পড়িয়াছি—আমি বে না করলে কনের বাপের জাত যায়—তাহাদিগের আর ঘর নাই।"

বংশরক্ষা, কুলরক্ষার অজুহাত ছাড়াও ছিল প্রচুর প্রর্থের প্রলোভন। এ সবই সেকালের প্রকৃত সমাজচিত্র। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'তেও এ যুগেরই নানা সমাজচিত্র রয়েছে।

বলা বাহুল্য, এ সব চিত্র ও নক্সা বৃহত্তর কলকাতার পাঁচমিশালী সমাজ-জীবনের। এই সমাজের বাইরে যে বৃহত্তম গ্রামকেন্দ্রিক বাঙালী সমাজ বর্ত্তমান ছিল তার পরিচয় এতে নেই।

ঊনবিংশ শতকে বাঙালীর যে নব-অভ্যুদয় ঘটেছিল তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন, "এ অভ্যুদয় ব্যাপকতায়, গভীরতায়, এবং বৈপ্লবিকতায় কন্স্টান্টিনোপলের পতনের পরবর্তী ইউরোপের রেনেসাস বা নবজাগরণকেও অতিক্রম করেছে। ··এ অভ্যুদয় সাহিত্যে, ভাষার সংস্কারে, সমাজের পুনর্গঠনে, রাজনৈতিক আন্দোলনে, ধর্মসংস্কারে এমনকি জীবনযাত্রা ও আচার ব্যবহারের পরিবর্তনে প্রতিফলিত হয়েছে এবং এর প্রভাব বাংলার গণ্ডি পার হয়ে ঘুর্ণিজাত ছোট ছোট ঢেউ-এর মত সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে।"

কথাটা সত্য বটে, কিন্তু তবে বাঙলায়ও যেমন কলকাতার পাঁচমিশালী সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অংশটুকুই মাত্র এ নব-অভ্যুদয়ের ধারক ও বাহক, অন্যত্রও এর প্রভাব ও প্রতিপত্তি দৃঢ় হয়েছিল শুধু শিক্ষিত জনগণের মধ্যে। বৃহত্তর কলকাতার গণ্ডি ভেদ করে বিস্তৃত বাঙালী সমাজের মধ্যে এ-অভ্যুদয় ছড়িয়ে পড়তে পারেনি; তার ফলে এ-আলোড়ন যে স্বল্পায়ু হবে তাতে সন্দেহ ছিল না। বৃহত্তর বাঙালী সমাজের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়, তখন এই নৈতিক জাগরণ ও স্বাধীনতার চেতনাকে, বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে তাদের অচ্ছেদ্য রক্তের সম্পর্ক বিস্মৃত হয়ে, 'হিন্দু আন্দোলন' বলে এর প্রতি বিমুখ হয়ে বসে রইল। বাকি অংশটুকুও

শিক্ষার অভাবে এর প্রকৃত স্বরূপ বুঝে উঠতে পারল না। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাঙলা মায়ের অপরূপ চিত্র মানসপটে অঙ্কিত করে, বঙ্কিমচন্দ্র সপ্তকোটি বাঙালীকে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে সন্তানধর্মে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু খণ্ডিত সমাজের ক্ষীণকণ্ঠে সে মন্ত্র মেঘমন্দ্রে উচ্চারিত হল না। ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না তাই বীজ বপনের অব্যবহিত পরেই আশানুরূপ অঙ্কুর উদ্গত হল না।

ক্ষেত্র যে প্রস্তুত ছিল না তা বুঝলেন বঙ্কিমের উত্তরসাধকের দল ; বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ আর রঙ্গলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সব কবি-ই। এঁরা সবাই ছিলেন সন্তানধর্ম ও বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে মাতৃ-বোধন যজ্ঞের হোতা। এঁদের প্রেরণা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজকে প্রবল নাড়া দিল বটে, কিন্তু সে সমাজ তো বৃহত্তর বাঙালী সমাজের ক্ষুদ্র একাংশ মাত্র। সে বৃহত্তর সমাজ রইল যে তিমিরে সে তিমিরেই, শিক্ষার প্রসারের অভাবে। কাজেই উনবিংশের নব অভ্যুদয়ের জন্মবীজে, ষোড়শ শতকের ক্ষণিক জাগরণের মত, তার নিশ্চিত স্বল্পায়ু নিহিত ছিল। কিন্তু একদিন না একদিন ক্ষেত্র প্রস্তুত হবেই ; সেদিন এই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রেই বোধন হবে বাঙলা মায়ের —ভারতমাতার। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রেই সার্থক হবে উনবিংশের নব-অভ্যুদয়। সেই দিনটির প্রতীক্ষায় বাঙালী বসে থাকবে।

বন্দে মাতরম্।

॥ প্রমাণপঞ্জী ॥

[এক]

১। বাংলা দেশের ইতিহাস : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ২। History of Bengal Vol I : Dacca University ৩। India Through Chinese Eyes : S. N. Sen ৪। History of Kanauj : R. S. Tripathi ৫। বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৬। বৃহৎ বঙ্গ : দীনেশ চন্দ্র সেন ৭। Decline of Buddhism in India : R. C. Mitra ৮। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : শ্রীসুকুমার সেন ৯। History of India as Told by its Own Historians : Sir Henry M. Elliot & Prof. J. Dowson ১০। Census Report : India & B. S. Guha's Pamphlet ১১। Dravidian Elements in Indian Culture : G. Slater.

[দুই]

১। Decline of Buddhism in India : R. C. Mitra ২। ঠাকুরদাদার ঝুলি, ঠাকুরমার ঝুলি (প্রথম সংস্করণ) : দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (সঙ্কলক) ৩। ময়নামতীর গান : বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য (সঙ্কলক) ৪। রামচরিত : সন্ধ্যাকর নন্দী ৫। বৌদ্ধ গান ও দোঁহা : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৬। ডাক ও খনার বচন ৭। Indian Shipping : Radha Kumud Mukherjee ৮। সদুক্তি কর্ণামৃত গ্রন্থ : শ্রীধর দাস ৯। History of India as Told by its Own Historians : Sir Henry M. Elliot & Prof. J. Dowson. ১০। বেণের মেয়ে : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১১। Tantras : C. H. Chakravarti ১২। A History of Indian Philosophy (vol II) : S. N. Dasgupta ১৩। Alberuni's India : Edward C. Sachu.

[তিন]

১। বাংলা দেশের ইতিহাস : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ২। History of Bengal (Vol I) : Dacca University ৩। পদ্ধতি (ছান্দোগ

কর্মানুষ্ঠান) : ভবদেব ভট্ট ৪। দায়ভাগ : জীমূতবাহন ৫। The Hindu Code : Sir H. S. Gour ৬। An Introduction to Buddhist Esoterism : B. Bhattacharjee ৭। রাগ ও রূপ : স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ৮। কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ : শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৯। Calendar Reform Committee Report, 1952 : (Dr. Meghnad Saha).

[চার]

১। A History of Turkey : M. P. Price ২। Changish Can : P. Francois. ৩। History of India as Told by its Own Historians (Vol 1) : Sir Henry M. Elliot & Prof. J. Dowson ৪। Social History of the Muslims in Bengal : Dr. A. Karim ৫। History of Bengal vol II (D. U.) ৬। শূন্যপুরাণ ও ধর্মপূজা বিধান ৭। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ ৮। Life and Conditions of the people of Hindustan : Dr. K M. Ashrof.

[পাঁচ]

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : বসন্তরঞ্জন রায় ২। প্রাকৃত-পৈঙ্গলম্ : চন্দ্রমোহন ঘোষ ৩। পিঙ্গলছন্দঃ সূত্রং (হলায়ুধের টীকা সহ) : সীতানাথ ভট্টাচার্য ৪। Social History of the Muslims in Bengal : Dr. A Karim ৫। Outlines of Islamic Culture : A. M. A. Shushtery ৬। Ibn Battuta : Mehdi Hossein ৭। Glimpses into the History of Bengal (14th & 15th Century) : N. B. Roy ৮। J. R. A. S. 1895 ৯। কালিকা পুরাণ।

[ছয়]

১। বাংলাদেশের ইতিহাস : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ২। চৈতন্য মঙ্গল : জয়ানন্দ ৩। History of India as Told by its Own Historians vol IV : Sir Henry M. Elliot and Prof. J. Dowson ৪। পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল : বিজয় গুপ্ত ৫। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণখণ্ড) : নগেন্দ্রনাথ বসু ৬। History of Bengal : Edited by Sir Jadunath Sarkar.

[সাত]

১। Materials for the Study of Navya Nyaya Logic: D. N. N. Ingallo (Harvard University) ২। Shershah: K. R. Qanungo ৩। History of India as Told by its Own Historians Vols IV & VI ৪। শ্রীচৈতন্যভাগবৎ (শ্রীচৈতন্য লীলার আদিগ্রন্থ): বৃন্দাবন দাস ঠাকুর: সম্পাদক—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ৫। কবিকঙ্কণ চণ্ডী: মুকুন্দরাম ৬। Bengal in the 16th Century: J. N. Dasgupta.

[আট]

১। Indian Shipping: Radha Kumud Mukherjee ২। Ain-i-Akbari (Jarrathis translation): annotated by Sir Jadunath Sarkar ৩। History of India as Told by its Own Historians Vol VI ৪। India at the Death of Akbar: Moreland ৫। Promotion of Learning in India (During Mohammedan rule by Mohammedans): N. N. Law ৬। Bengal under Akbar and Jahangir: T. K. Raichaudhuri.

[নয়]

১। Survey of India's Social life and Economic condition in the 18th Century: Kali Kinkar Datta ২। বাংলার অর্থনৈতিক জীবন (১৭৫৭-১৭৯৩): নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ৩। History and Economics of Indian Famines: A. Loveday (1914) ৪। A Summary of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal—Govt. of Bengal (1757-1916): M. N. Chakravarti ৫। Annals of Rural Bengal: W. W. Hunter ৬। Economic Annals of Bengal: J. C. Sinha ৭। History of India as Told by its Own Historians Vol VIII ৮। Early History of Bengal: F. J. Monahan ৯। Dawn of New India: B. N. Banerjee.

[ঋণ]

১। British Orientalism and Bengal Renaissance: David Kopf ২। Mohammedanism: D. S. Margoliouth ৩। Encyclopedia Britannica (1968) ৪। The Sepoy Mutiny 1857: H. P. Chattopadhyaya ৫। আনন্দমঠ: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (প্রথম প্রকাশ, ১৮৮২) ৬। Glimpses of Bengal in the 19th Century: R. C. Mazumdar ৭। History of Bengal (Dacca University) Vol II.

॥ শব্দসূচী ॥

অ

আ

ই

ঈ

উ

এ

ও

ক